www.amrajaraboipori.wordpress.com

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by
Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

প্রথমে আমার কয়েকটি প্রিয় লাইন দিয়ে শুরু করি।যে কথাগুলো লিখছেন স্যার জাফর ইকবাল।

“"বই কী অপূর্ব একটা জিনিস, সাদা কাগজে আঁকিবুঁকি দেওয়া কিছু অক্ষর, কিছু শব্দ, কিছু বাক্য—আমার চোখ দিয়ে আমি সেগুলো দেখি আর আমার মস্তিষ্কের ভেতর ম্যাজিক হতে শুরু করে। বইয়ের লেখাগুলো আমার কল্পনার জগৎটা খুলে দেয়। যে মানুষের কল্পনাশক্তি যত বেশি, একটা বই তার জন্য তত চমৎকার একটা বিষয়। শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীতেই টেলিভিশন, কম্পিউটার, স্মার্টফোন বইকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি মনে করি, মানবসভ্যতার জন্য এটা হচ্ছে সত্যিকারের একটা হুমকি। যদি দেখা যায়, সত্যি সত্যি মানুষ বই পড়া বন্ধ করে টেলিভিশন দেখে বিনোদনের সব কাজ সেরে নিচ্ছে, তাহলে মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায়, মানুষের প্রজন্ম তখন হবে অসম্পূর্ণ একটা প্রজন্ম! টেলিভিশনের রেডিমেড ফাস্টফুড বিনোদনে যদি অভ্যস্ত হয়ে যাই, তাহলে আমরা কি সত্যিকারের মননশীল কাজ কখনো করতে পারব? সে জন্য আমি সুযোগ পেলেই সবাইকে বই পড়ার কথা বলি। কেউ যদি বলে খুব আনন্দ হচ্ছে, তাহলে আমি বলি, একটা ভালো বই পড়ে আনন্দটা আরও বাড়িয়ে নাও। কেউ যদি বলে মনটা ভালো নেই, তাকেও আমি বলি, বই পড়ো, তাহলে মনটা ভালো হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে ঘুম আসছে না, আমি তাকে বলি, বই পড়ো, ঘুম চলে আসবে। কেউ যদি বলে শুধু ঘুম পায়, তাকেও আমি বলি, বই পড়ো, তাহলে ঘুম চলে যাবে। কেউ যদি বলে শরীরটা ভালো লাগছে, আমি বলি, চমৎকার, এটা হচ্ছে বই পড়ার সময়। কেউ যদি বলে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে, আমি বলি, বই পড়ো, শরীর ঠিক হয়ে যাবে! আমি কৌতুক করে বলি না, আমি গভীর বিশ্বাস থেকে বলি। ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের বইমেলা হয়। এটা কী চমৎকার একটা ব্যাপার। যারা বই পড়ে না, তারাও এই মেলায় চলে আসে। বই নেড়েচেড়ে দেখে। মাঝেমধ্যে কেনে। বাসায় নিয়ে সাজিয়ে রাখে। আমার খুব ইচ্ছে, আমাদের তরুণ প্রজন্ম বই পড়ুক। একটা বই পড়ার আগে তারা যে মানুষ থাকে, একটা ভালো বই পড়ার পর তারা আর সেই মানুষটি থাকে না। তারা অন্য একজন মানুষ হয়ে যায়! নিজেকে ভালো মানুষে পাল্টে দেওয়ার এত সহজ সুযোগটি তারা কেন ছেড়ে দেবে ?”

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এবার কিছু ভূমিকা

বই পড়ার সেই কাল

বই পড়তে আমার কখনো খারাপ লাগে না।প্রচন্ড বেশি মিস করি স্কুল লাইফের দুপুরে ঘুমানো সময় যখন ঘুম ঘুম চোখ নিয়ে বই পড়তাম কিংবা রাতে তাড়াতাড়ি করে পড়া শেষ করতাম কখন প্রিয় গল্পের বইটা পড়ে শেষ করব।পড়া শেষ করে তাড়াতাড়ি করে বসে পড়তাম গল্পের বই নিয়ে।আস্তে আস্তে যত বড় হতে থাকলাম দেখলাম আমার বই পড়ার আগ্রহ আরও বাড়ছে।কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমানে বই নেই আমার কাছে।বন্ধুদের কাছ থেকে বই ধার করে এনে পড়তাম।এক সময় দেখলাম বন্ধু মহলে যারা আছে তাদের সবার কাছে থাকা বই আমার পড়া শেষ।কি করব??নতুন বই কিনতে হবে??টাকা পাব কোথায় এত?? বইয়ের যা দাম...............টিফিনের টাকা জমিয়ে বই কেনা শুরু।কিন্তু এত দাম দিয়ে বই কিনে আর পারছিলাম না।একটা নতুন বইয়ের জন্য আমার সা রা মাস অপেক্ষা করতে হত।তখন সন্ধান পাই মিরপুর দশ নম্বরের পুরানো লাইব্রেরী বইয়ের দোকানগুলো।সেখানে কম দামে পুরানো বই পাওয়া যায়।আমি যেন আকাশের চাঁদ পেলাম।আগে যে টাকা দিয়ে একটা বই কিনতে পারতাম এখন সেই টাকা দিয়ে দুই থেকে তিনটা বই কিনতে পারছি।“আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাস”

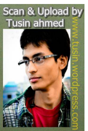

বই পড়ার এই কাল

এখন আর টাকা জমিয়ে বই কেনা হয় না।ইন্টারনেট ডাউনলোড করে বই পড়ি।কিন্তু ইন্টারনেটের অনেক বই নেই।পুরানো দিনের কালেশন গুলো নেই।যেমন:আমার অনেক প্রিয় একজন লেখক নিমাই ভট্রাচার্যের কোন বই ইন্টারনেট পেলাম না।পরে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র থেকে বইটা এনে পড়া শেষ করলাম।বইটা শেষ করার পর মনে হল আচ্ছা বইটা যদি আমি স্ক্যান করে আপলোড করে দিতে পারতাম তাহলে সবার জন্য উপকার হত।সবাই পড়তে পারত।যাদের বই কিনার সামর্থ নেই কিংবা এই পুরানো বইগুলো এখন লাব্রেরীতে পাওয়া যায় না।কিন্তু বই আমি কেমন করে স্ক্যান করব।আমার তো স্ক্যানার নেই।আর বর্তমানে স্ক্যানার কিনার সামর্থ নেই।তখন মোবাইলটাকেই নিলাম স্ক্যান করার জন্য।প্রতিটি পৃষ্ঠা ছবি তুলে পরে পিডিএফ আকারে করে একটা পিডিএফ বানালাম।দেখলাম এই পিডিএফটি বানাতে আমার সময় লেগেছে চার ঘন্টার মত।আর পিডিএফ এর সাইজ অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে।একটা বইয়ের সাইজ ১২০ মেগা হয়ে যাচ্ছে। পরে একটু সার্চ করে আমার এন্ড্রয়েড ফোনের জন্য চমৎকার একটা অ্যাপস পেলাম।শুরু হল বই স্ক্যান করে পিডিএফ বানানো।এখন থেকে যে বই আমি পড়ব তা স্ক্যান করে দেওয়ার চেষ্টা করব।এই বইটি সম্পূর্ন মোবাইল দিয়ে স্ক্যান করা।“

বই নিয়ে চমৎকার একটা গ্রুপ তৈরী করছিলাম কয়েক বছর আগে।গ্রুপে বই নিয়ে আলোচনা করা হয়।যারা বই পড়তে ভালবাসের তারা গ্রুপে জয়েন করুন।নিজের পড়া বইগুলো সম্পকে শেয়ার করুন।বই নিয়ে আলোচনা করুন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

“আমারা যারা বই পড়ি”

facebook.com/groups/amrajaraboipori

ফেইসবুক পেইজ আর ব্লগ

http://amrajaraboipori.wordpress.com/

বি:দ্র:ইবুকটির কপিরাইট ফ্রী।আপনি চাইলে এই বইটি আপনার ওয়েভসাইটে ব্যাবহার করতে পারবেন।কিন্তু একটা বিশেষ অনুরোধ দয়া করে আমাদের গ্রুপের নাম এবং আমাদের ব্লগটির লিংক উল্লেখ করে দিয়েন।আর বইটি ভাল লাগলে অবশ্যই গ্রুপ গিয়ে একটি মন্তব্য করার অনুরোধ রইল।আপনাদের মন্তব্য পেলেই পরবতীতে আরও বেশি বই স্ক্যান করে ইবুক তৈরী উৎসাহ পাব।

তুসিন আহমেদ

www.tusin.wordpress.com

facebook.com/tusin.ahmed

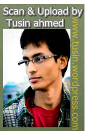

www.amrajaraboipori.wordpress.com

রাজশাহী কলেজে শিক্ষকপদে তিনি যোগ দেন ১৯৬২ সালের পহেলা এপ্রিল; আর ১৯৯২ সালে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক পদটি যেদিন ছেড়ে দেন—সেদিনও ছিল পহেলা এপ্রিল, এপ্রিল ফুলের দিন। দুই বোকা-দিবসের মধ্যবর্তী তিরিশটি বছর শিক্ষকতাকেই জীবনের মহত্তম ব্রত হিসেবে জেনে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন অধ্যাপনায়—যার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন স্কুল ও কলেজ-জীবনের তাঁর ক'জন শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় শিক্ষক, আর তাঁর অধ্যক্ষ পিতার কাছ থেকে। 'নিষ্ফলা মাঠের কৃষক' আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের অধ্যাপনা-জীবনেরই স্মৃতিচারণ; এ স্মৃতিচারণার একটি দিক জুড়ে আছে তাঁর স্কুল আর কলেজ-জীবনের শিক্ষকদের কথা। আরো আছে মুনীর চৌধুরী থেকে শুরু করে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পর্যন্ত বেশ ক'জন বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক সম্পর্কে তাঁর নির্মোহ মূল্যায়ন—যে মূল্যায়ন শ্রদ্ধা সমালোচনার দ্বন্দ্বে দীর্ণ।

জীবনের তিরিশটি বছর অধ্যাপনায় কাটানোর পর সেই ফেলে-আসা দিনগুলির দিকে তাকিয়েছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, দুর্যোগে ধ্বস্ত ক্ষেতের দিকে যেমন করে অশ্রুসজল চোখ আর বুকভরা হাহাকার নিয়ে তাকায় একজন কৃষক। সম্পূর্ণভাবে ধসে-পড়া শিক্ষাঙ্গনের অবক্ষয়গ্রস্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাঙ্গন, এর ব্যবস্থাপনা আর মূল্যবোধের দিকে তাকিয়ে নিজেকে তাঁর মনে হয় নিষ্ফলা মাঠেরই কৃষক। তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা, তীব্র পর্যবেক্ষণশক্তি ও প্রজ্ঞা মিশিয়ে তিনি অনুসন্ধান করেন এই সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের স্বরূপ ও কারণ।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সহৃদয় রসস্নিগ্ধ সংবেদী কুশলী বর্ণনা এই গ্রন্থটিকে দিয়েছে বহুতলসম্পন্ন বিভা। এই গ্রন্থ একই সঙ্গে স্মৃতিচারণ আর উপন্যাস। বর্ণনার মুনশিয়ানায় চরিত্রগুলো জীবন্ত ও বৈশিষ্ট্যময়। আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রজ্ঞা, একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষকের মতোই জাতির সামনে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন আমাদের শিক্ষাঙ্গনের মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার ছবি, নীরব কিন্তু ভয়াবহতম এই জাতীয় দুর্যোগটির দিকে তিনি ফেরাতে চেয়েছেন জাতির মনোযোগ।

এই গ্রন্থ তাই আমাদের সময়ের সবচেয়ে মূল্যবান অন্যতম গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৯২৮
আব/সি

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ২৪৯৪৬৩

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড
৫১/৫২ বনগ্রাম লেন, ঢাকা ১১০০

দাম
একশত ষাট টাকা মাত্র

ISBN 984 410 140 9.

NISHFALA MATHER KRISHAK : (A Reminiscence) By Abdullah Abu Sayed. Published By Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed By Quyyum Chowdhury. Price : Taka One Hundred Sixty Only.

উ ৎ স র্গ

খুব ছেলেবেলায় হারানো
মা
করিমউন্নিসা বেগম
মৃত্যু-পূর্ব দিনগুলোয় সন্তানদের ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তায়
যাঁর উৎকণ্ঠিত মুখ এখনো চোখের সামনে ভাসে

www.amrajaraboipori.wordpress.com

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by
Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ভূমিকা

একসময়, জীবনের প্রথম দিনগুলোয়, স্বপ্নতাড়িতের মতোন এসে যোগ দিয়েছিলাম শিক্ষকতায়। প্রতিটা শিরা-ধমনীকে সেদিন আক্রান্ত করে রেখেছিল এক উদ্ধাররহিত স্বপ্ন—সমৃদ্ধ মানুষ গড়ে তোলায় অংশ নেবার স্বপ্ন—সেইসব মানুষ যারা একদিন একটা সমৃদ্ধ জাতির উত্থান ঘটাবে। আমার সেই স্বপ্ন সফল হয় নি। গত চার দশকে, গোটা জাতির অবক্ষয়ের হাত ধরে, আমাদের শিক্ষাঙ্গন ধীরে ধীরে এমন এক নির্বীজ মৃত্যুর শিকারে পরিণত হয়ে পড়েছিল যে সম্পন্ন বা মহৎ কোনো কিছুর জন্মই সেখানে কার্যত অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। এই বিশাল পতনের মুখে কোনো একক ব্যক্তির আলাদাভাবে কিছু করার ছিল না। আমার পক্ষেও তা সম্ভব হয় নি। আমার এই বই আমাদের শিক্ষাঙ্গনের নীরক্ত মাঠে অবসিত হবার সেই গল্প।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

গত চার দশকে আমাদের শিক্ষাঙ্গন কী করে ক্রমে ক্রমে এই নিঃসাড় বন্ধ্যাত্বের শিকার হল, কী করে নানা দিক থেকে তার সবুজ ভাঁড়ার মৃত্যুর পদপাতে উষর হয়ে এল, এই বইয়ে তার কাহিনী তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। আমাদের শিক্ষাঙ্গন এই যুগে কতটা বিশৃঙ্খল আর অরাজক হয়ে পড়েছিল এই বই তারই একটা অবিন্যস্ত ও প্রাথমিক দলিল।

শিক্ষাঙ্গনের এই নিঃস্বতা সবকিছুর মতো আমার শিক্ষকতার স্বপ্নকে প্রায় পুরোপুরিই অর্থহীন করে দিয়েছিল। এই ক্ষেত্রের নিষ্পত্রতার পাশাপাশি আমার ব্যর্থ জীবনের দীর্ঘশ্বাস এই বইয়ে কমবেশি অনুরণিত হয়েছে। বইটি এ-যুগের শিক্ষা-ব্যাপারে আগ্রহী পাঠকদের কৌতূহলকে সামান্যতম মেটাতে পারলেও শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

১৮.০২.৯৯

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সূচনা

১

মাত্র দিন–সাতেকের সিদ্ধান্তে তিরিশ বছরের শিক্ষকতা জীবন থেকে বিদায় নিলাম। সরাসরি—প্রাক–অবসর ছুটি না নিয়ে—নিজেকে দ্বিতীয় চিন্তার অবসর না দিয়ে। আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধরন চিরকালই এমনি। আমি সিদ্ধান্ত নিই ঝোঁকের মাথায়, হঠাৎ, খানিকটা বুদ্ধিহীন ও অপরিণতভাবে; এবং নেওয়ার পর, দুর্বলভাবে নেওয়া সেই সিদ্ধান্তটিকে সফল করে তোলার জন্যে যাবতীয় শক্তি একখানে করে কাজ করে যেতে থাকি। এতে লাভ হয় একটা। কিছুদিন পরপরই একটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নতুন জীবনের ভেতর আমি বেঁচে থাকার সুযোগ পাই। হয়ত এজন্যে আজীবন আমি এক চিরনতুন এবং চির–পরিবর্তমান পৃথিবীর বাসিন্দা। ভেবে–চিন্তে, হিসাব–কিতাব করে সিদ্ধান্ত নিলে এমনটা হতে পারত না। নিজেকে নিরাপদ করার তাগিদে বুঝেশুনে ঠাণ্ডা মাথায় আমি হয়ত আমার গতানুগতিক জীবনটাকেই ফিরে ফিরে খুঁজে নিতাম।

তিরিশ বছর আগে, ১৯৬২ সালের পয়লা এপ্রিলে আমি অধ্যাপনায় এসেছিলাম। তিরিশ বছর পর গুণে গুণে এই পয়লা এপ্রিলেই বিদায় নিয়েছি। পয়লা এপ্রিলকে কেন্দ্র করে এই আসা আর যাওয়া একেবারে অর্থহীন কারণে হয় নি। পয়লা এপ্রিল আমার চাকরিতে যোগ দেবার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। ওটা বলে নিলে ঐ তারিখে বিদায় নেবার কারণটাও স্পষ্ট হবে। ১৯৬২ সালের সরকারি আদেশমতে আমার রাজশাহী কলেজে যোগ দেবার কথা ছিল ২৫ মার্চে। চাকরিতে যোগ দেবার জন্যে আমি রাজশাহী গিয়ে পৌঁছেছিলামও ২৪ মার্চে। কিন্তু যোগ দিয়েছিলাম সাতদিন পর। মাঝখানে দিন–সাতেকের একটা ছোট্ট ছেলেমানুষি বিরতি। কিন্তু যত ছেলেমানুষিই হোক, বিরতিটা সে–সময়ের বাস্তবতার নিরিখে যে একেবারে সঙ্গতিহীন ছিল এ–কথা বলা যাবে না।

এ–দেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান সে–সময় থেকে মাত্র পনের বছর আগের ঘটনা। দুশো বছরের ব্রিটিশ আমলের রেশ তখনও সবখানেই বেশ সপ্রাণ। তখনো পয়লা এপ্রিলে বেশ ঘটা করেই উদযাপিত হত 'এপ্রিল ফুল' উৎসব।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সবাই সবার অসতর্কতার সুযোগে সবাইকে ঠকাতে আর বোকা বানাতে চেষ্টা করত সেদিন। বোকা হওয়া মানুষটাকে ঘিরে হাসির হররা উঠত। এই নির্দোষ মশকরাই ছিল এই উৎসবের প্রাণ। ধরা যাক স্কুলে কেউ একজন অন্য একজনের অজান্তে আঠা দিয়ে একটুকরো কাগজ তার পিঠে সেঁটে দিয়ে কেটে পড়েছে। কাগজটাতে লেখা—'গাধা'। আর ঐ লেখা পিঠে নিয়ে সে স্কুলে ঘোরাফেরা করছে। যতই ঘুরছে ততই তাকে নিয়ে চারপাশে হাসির হররা উঠছে। একসময় হয়তো সারাটা স্কুলই হেসে চলছে তাকে নিয়ে। কিন্তু যে বেচারা ঐ কৌতুকরসের উৎস, নিজে সে জানতে পারছে না কেন চারপাশের সবার ভেতর এই জমজমাট আনন্দোৎসবের হুল্লোড়। একসময় কোনো বন্ধুর সহৃদয়তায় যখন ব্যাপারটা তার কাছে ধরা পড়ল কিংবা যে ওটা সেঁটে দিয়েছিল সে নিজেই ত্রাণকর্তার ভূমিকায় উদিত হয়ে সেটা খুলে তার চোখের সামনে তুলে ধরল তখন তার করুণ অপ্রস্তুত অবস্থাটা সবার কাছে সর্বোচ্চ উপভোগের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। কিংবা ধরা যাক ভোর পাঁচটার দিকে শ্রদ্ধেয় সহকারী হেডমাস্টার সাহেবকে সুখনিদ্রা থেকে জাগিয়ে একজন একান্ত বাধ্যগত ছাত্র হন্তদন্তভাবে খবর দিয়ে গেল যে রাত দুটোর সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন, অবস্থা মারাত্মক—বলেই যেমন দ্রুত পায়ে এসেছিল তেমনিভাবে আর এক শিক্ষকের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল তাঁকে খবরটা পৌঁছে দেবার জন্যে। সহকারী হেডমাস্টার মহোদয় তড়িঘড়ি ছুটলেন হেডমাস্টারের বাড়ির দিকে। গিয়ে দেখলেন তাঁরই মতো দুঃসংবাদ পাওয়া আরো জনাদশেক শিক্ষকের মাঝখানে বসে হেডমাস্টার মহোদয় মুখ-উজ্জ্বল-করা হাসি নিয়ে ধূমপান করে চলেছেন। তিনি পৌঁছতেই সবাই সমস্বরে যেভাবে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাতে বাইরে বাইরে তিনি সে হাসিতে যোগ দিলেও ভেতরে ভেতরে যে একেবারে জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ হয়ে রইলেন তা নয়।

বলাবাহুল্য পয়লা এপ্রিলের অঘটন সৃষ্টিকারী ঐসব খুদে দুর্বৃত্তদের জন্য কোনো শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না। ধরেই নেয়া হত এটা অসতর্ক মানুষদের প্রাপ্য শাস্তি। তাদের স্মৃতিশক্তি বা মন যদি এতটাই দুর্বল হয় তবে দুর্বৃত্তদের অযথাই দোষ দেওয়া কেন! তারা তো আর তাদের কাজ ফেলে বসে থাকতে পারে না!

প্রতিটা এপ্রিল ফুল ভরা থাকত এমনি হরেক মুখরোচক সংবাদে। এপ্রিল ফুল বলত : সারাবছর না পারলেও বছরের অন্তত একটা দিনে সামাজিক ভণ্ডামির গম্ভীর মুখোশটা খুলে রাখ না কিছুক্ষণের জন্য, নিজের ভারিক্কি চালটা ছেড়ে হালকা হয়ে একটু জিরিয়ে নাও না, বোকা হয়ে নিজের অসহায় চেহারাটা দেখে হেসে নাও না একটুখানি। সারা বছরের দম-আটকানো আবহাওয়া থেকে ছুটি নিয়ে নির্মল নির্জলা ফূর্তির জগতে একটু হলেও বেঁচে নাও না একবেলার জন্যে।

এপ্রিল ফুল সারাবছরের গুমোট আবহাওয়াকে দমকা বাতাসে উড়িতে দিত। আমাদের জীবনের অনেক রকম ফূর্তির সঙ্গে এই এপ্রিল ফুল উৎসবও আজ বিদায় নিয়েছে আমাদের জীবন থেকে।

এপ্রিল ফুল মানে সহজে এই গুরুভার জীবনটাকে মেনে নিতে পারার মনোভঙ্গি। পয়লা এপ্রিল চাকরিতে যোগ দিয়ে শিক্ষকতাকে নয়, শিক্ষকতার পেশাকে আমি এমনি ভারভাবনাহীন চটুল মেজাজে নিতে চেয়েছিলাম প্রথম দিন থেকেই। তাই ২৪শে মার্চ রাজশাহী পৌঁছোলেও সাতদিন একটানা হোটেলে কাটিয়ে পয়লা এপ্রিল যোগ দিয়েছিলাম শিক্ষকতায়।

সে-কালের সরকারি কলেজের নিয়ম ছিল যে নিয়োগপত্র পাবার পর চাকরিতে যে যত আগে যোগ দেবে চাকরিতে তিনি তার জ্যেষ্ঠতা পাবেন অন্যদের চেয়ে তত বেশি। ভালোভাবে জেনেশুনেই আমি দেরি করে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলাম। এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তিও আমাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করেছে আজীবন। আমার সহকর্মীরা আমার সঙ্গে চাকরির নিয়োগপত্র পেয়েও চাকরিতে সারাজীবন আমার ওপরে থেকেছেন। প্রতিদিন আমার সমবয়সীদের আমার চেয়ে জ্যেষ্ঠ বা নিজেকে তাদের চেয়ে তরুণ হিসেবে দেখে দেখে আমার চাকরিজীবনের দিনগুলো মোটামুটি ভালোই কেটেছে।

অধ্যাপনার 'পেশা'কে আমার অধিকাংশ সহকর্মীর মতো গুরুত্ব দিয়ে আমি নিই নি। ছাত্রদের উচ্চ সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষায় পাস করানোর বা তাদের বৈষয়িক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করানোর জন্যে জীবন উৎসর্গ করাকে মানবজন্মের একমাত্র মহিমা মনে করাকে হাস্যকরই মনে হয়েছে আমার কাছে।

আমি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলাম। সাহিত্যের স্বপ্ন ও সৌন্দর্য আজীবন আমার চেতনা-জগতে যে হীরের দীপ্তি ছড়িয়েছে আমি সেই আলোকোজ্জ্বলতাকে ছাত্রদের ভেতরে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। তাদেরকে সেই আনন্দে উজ্জীবিত করে তুলতে চেয়েছি। পরীক্ষায় ছাত্রদের বেশি নম্বর পাওয়াবার জন্যে পরিশ্রম করে জীবন নিঃশেষ করাকে আমার কাছে জীবনের অপচয় বলে মনে হয়েছে। জীবন কত দীপান্বিত ও জ্যোতির্ময় তা একজন ছাত্র দেখতে পারে একটিমাত্র পথে: তার জীবনের শিক্ষকদের ভেতর দিয়ে। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন কিংবা চারপাশের বড় বা সাধারণ মানুষ—কেউই এ-ব্যাপারে শিক্ষকের সমকক্ষ হতে পারেন না। জীবনের সামনে দীর্ঘদিন অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থেকে শিক্ষক ছাত্রদেরকে জীবনের মহিমান্বিত রূপটি চিনিয়ে যেতে থাকেন।

আমি ছাত্রদের সামনে জীবনের সেই কান্তিমান পৃথিবীর ছবি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। আমার ধারণা অনেক ছাত্রছাত্রী এতে অনুপ্রাণিত হয়েছে। তাদের অনুপ্রাণিত চিত্তের ঐসব উজ্জ্বল বর্তিকাই আমার কাছ থেকে তাদের উত্তরাধিকার।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

নোট বা সাজেশন দিয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে পাঠ্যপুস্তক আর মুখস্থসর্বস্ব সংকীর্ণ কুঠুরির ক্লিষ্ট অধিবাসী করে তোলার চেষ্টাকে আমি সবসময় জ্ঞানবিরোধী ও অনৈতিক মনে করেছি। এইখানে আমার অবস্থান ছিল গতানুগতিক শিক্ষকতা থেকে আলাদা জায়গায়—শিক্ষকতার লক্ষ্য যেখানে কেবল দক্ষ মানুষ তৈরি করা, তা থেকে দূরে। কেবল দক্ষ নয়—আমার শ্রমে চেষ্টায় সম্পন্ন-মানুষ গড়ে উঠুক—সেই চেষ্টা আমি করেছি।

আগেই বলেছি অধ্যাপনার 'পেশা'কে আমি হালকাভাবে গ্রহণ করেছিলাম। সারাজীবন পদোন্নতি এড়িয়ে নিজের ছোট একান্ত জগতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছি। পেশা যাতে আমাকে তার মোহের ভিতর টেনে নিতে না পারে সে-ব্যাপারে আমি সবসময় সচেতন ছিলাম। সারাজীবন আমি একান্তভাবে আমার নিজের জীবন যাপন করতে চেয়েছি—আমার নিজের ইচ্ছার, স্বপ্নের, মননের এবং আনন্দের জীবন। আমি জানতাম একবার পেশার মোহে চলে গেলে ঐ জীবন চিরদিনের মতো আমার কাছ থেকে হারিয়ে যাবে। পেশা আমার প্রভু হয়ে যাবে। তার শর্তে এবং নির্দেশে আমার জীবন চালিত হবে—সব হারিয়ে আমি নিঃস্ব হয়ে যাব। পেশাকে আমি আমার প্রভু হতে দিই নি। পেশায় থাকার সময়েও নয়, ছেড়ে দেবার মুহূর্তেও নয়। আমি শিক্ষকতায় এসেছিলাম নিজের ইচ্ছায়, শিক্ষকতা থেকে বিদায়ও নিয়েছি নিজের সিদ্ধান্তে—যে মুহূর্ত থেকে শিক্ষকতাকে অর্থহীন মনে হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে। ইচ্ছা করলে সরকারি নিয়ম অনুসারেই হয়ত আরো অনেক বছর এই পেশায় নিজেকে জড়িত রাখতে পারতাম। কিন্তু চোখের সামনে শিক্ষাঙ্গনের যে অধঃপতন প্রত্যক্ষ করছিলাম, প্রতিবাদহীনভাবে দিনের পর দিন তার ইন্ধন জুগিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কিন্তু এই ব্যাপারটাই আমার শিক্ষকতা থেকে চলে আসার একমাত্র কারণ নয়। একটা সময় এসেছিল যখন চারপাশের পরিবেশ এতটাই বৈরী হয়ে উঠেছিল যে হতাশার সঙ্গে মনে হয়েছিল শিক্ষক হিসেবে সত্যিসত্যি হয়ত আমার দেবার কিছু নেই। এই ব্যাপারটাই আমার হৃদয় ভেঙে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল এর চেয়ে ঢের ভালো শিক্ষার জন্য অন্যভাবে সময় দেয়া, অন্য পথে কিছু করা—দেশের ভেতর উচ্চায়ত মানুষ গড়ে তোলার ব্যাপারটাকে অন্যভাবে সহায়তা করা। ভেতরে ভেতরে ভেঙে গিয়ে মনে হয়েছিল : যাদের বড় মানুষ করে গড়ে তুলব বলে একদিন সব ছেড়ে শিক্ষকতার জগতে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তারা নিজেরাই তো আজ এর বিরুদ্ধে। সারা দেশ এর বিরুদ্ধে। কেউ তো আজ আর সত্যিকার মানুষ হতে চাচ্ছে না। বড় স্বপ্ন, বড় মূল্যবোধসম্পন্ন হৃদয়বান আর সমৃদ্ধ মানুষ ! সবাই তো বৈষয়িক ভবিষ্যৎ আর চাকরির হীন কুঠুরিতে নিজেকে সীমিত করে ফেলতে চাইছে। আমি, আমার মতো গুটিকয় মানুষ তো এ-সমাজে আজ নিঃসঙ্গ, অবাঞ্ছিত, বিরক্তিকর। একা একা আমি এই বৈরী জগতের

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বিরুদ্ধে কী করতে পারব? কতটুকু পারব? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিজের ভেতরেই আজ পুরোপুরি ক্ষয়ে গেছে, শিক্ষার পুনরুজ্জীবনের কথা যদি ভাবতেই হয় তবে এর বাইরে গিয়েই তা ভাবতে হবে, এখানে থেকে নয়।

কেন একদিন, আমার জীবনের অনুভূতিময় সূচনালগ্নে এভাবে সব মোহ ছেড়ে শিক্ষকতার দিকে ছুটে গিয়েছিলাম এবং কেন একসময় সবকিছু নিষ্ফল দেখে তা থেকে চলে গিয়েছিলাম, সেই গল্পই এই লেখার পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোয় আমি বলব।

২

আমি প্রথম শিক্ষকতায় যোগদান করি মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজে, ১৯৬১ সালে, বাইশ বছর বয়সে। নির্ধারিত পড়াশোনা শেষ করে সঠিক বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হতে পারতাম আমরা সে-সময়। ফলে বিভিন্ন পেশায় চলে যেতে পারতাম সঠিক বয়সেই। আমাদের সময়ে সেশনজট ব্যাপারটা অজানা ছিল। পরীক্ষা হত সঠিক সময়ে। আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষার বারো পেপার পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমরা পরপর ছয়দিনে, প্রতিদিন দু-পেপার করে। মাঝখানে একদিনের সাপ্তাহিক ছুটি। এখন এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। এখন ছ'টা বিষয়ের বারো পেপার পরীক্ষা নিতে কম করে মাসখানেক সময় লেগে যায়, না হলে ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে পরীক্ষার তাবৎ উদ্যোগ ভণ্ডুল হয়ে পড়ে।

সরকারি কলেজে ঢোকার আগের কয়েক মাসে যে-দুটি কলেজে আমি শিক্ষকতা করেছিলাম, মুন্সীগঞ্জ কলেজ তার প্রথম। এম.এ. পরীক্ষা দেবার পরপরই আমি ঐ কলেজে যোগ দিই। আমি জানতাম আমার পরীক্ষার পরপরই, সেপ্টেম্বর মাসের দিকে, ঐ কলেজে মাস-চারেকের জন্যে বাংলা সাহিত্যের একজন খণ্ডকালীন প্রভাষক নেবার বার্ষিক রেওয়াজ আছে। কিছুকালের জন্য এ-রকম একটা ছোটখাটো কাজে হাত মকশ করে নেয়া মন্দ নয় ভেবে ঐ চাকরিতে আমি উৎসাহী হয়ে উঠি।

কিন্তু এ-ব্যাপারে প্রধান বাধা হয়ে দেখা দেন স্বয়ং আমার আব্বা, আযীমউদ্দীন আহমদ, তখনকার মুন্সীগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ। শিক্ষাবিদ ও নাট্যকার হিসেবে তিনি সে-কালে দেশের সুধীমহলে সুপরিচিত ছিলেন। আমি ঐ কলেজে যোগ দিলে তাঁর জন্যে তা প্রশাসনিক অস্বস্তির কারণ হবে মনে করে তিনি ঐ কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীতে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে অনিচ্ছুক ছিলেন। উপায় না দেখে তাঁর মতামতকে একরকম পাশ কাটিয়েই আমার চাকরির আবেদন করতে হল।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কলেজ গভর্নিং বডির সচিব হিসেবে আব্বাই ঐ দরখাস্তের প্রক্রিয়াকরণ করলেন। গভর্নিং বডির সামনে আমার সাক্ষাৎকারও হল আশাব্যঞ্জক। আমার পরীক্ষার ফলাফলও অন্য প্রার্থীদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। কাজেই আব্বার মতকে প্রায় অগ্রাহ্য করেই গভর্নিং বডির সদস্যেরা সর্বসম্মতভাবে কলেজের খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে আমাকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। গভর্নিং বডির সচিব হিসেবে আব্বাই আমাকে নিয়োগপত্র পাঠালেন। ইংরেজিতে লেখা চিঠিটায় সেকালের আনুষ্ঠানিক চিঠির গৎ অনুসরণ করে আমাকে আব্বার সম্বোধন করতে হল স্যার বলে এবং তাঁর নিজের নামের ওপরে লিখতে হল আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য (Your most obedient servant.)। ঢাকার ঠিকানায় নিয়োগপত্র পাবার পর আমি আমার 'একান্ত অনুগত ভৃত্য' দর্শন মানসে মুন্সীগঞ্জের বাসার উদ্দেশে রওনা হলাম।

সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্তটি জমে উঠল কলেজে আমার যোগদানের প্রথম দিনে। প্রথম ক্লাসে ছাত্রদের সঙ্গে নতুন শিক্ষকদের পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব অধ্যক্ষই পালন করতেন। এটাই ছিল ঐতিহ্য। আমার ব্যাপারেও আব্বাকে তাই করতে হল। রুটিনমাফিক আব্বার পেছনে পেছনে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর একটি শাখায় গিয়ে হাজির হলাম। ছাত্রদের উদ্দেশে তাঁর সংক্ষিপ্ত ইংরেজি ভাষণে আব্বা আমার একটা ছোটখাটো পরিচয় তুলে ধরে সব-শেষে বললেন, 'যেহেতু ওর শরীরে শিক্ষকের রক্ত আছে আমার মনে হয় ভালো শিক্ষকই ও হবে।'

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমার ধারণা ছিল, আমার নিয়োগের দ্বন্দ্বে পরাজয়ের ফলে উনি ভেতরে ভেতরে কিছুটা তেতে আছেন। হয়ত তাঁর সেদিনের বক্তব্যে সেই ক্রোধের কিছু প্রতিফলন ঘটবে। কিন্তু ঘটনা হল ঠিক উল্টো। বক্তৃতার সময় আব্বার গলা কিছুটা ধরেই এল। মনে হল তাঁর উত্তরসূরীর আসনে নিজ হাতে আমাকে বসিয়ে যেতে পেরে তিনি যেন ভেতরে ভেতরে গর্বিত এবং পরিতৃপ্ত। আব্বা মুখ ফুটে কখনো বলেন নি, কিন্তু আমার ধারণা এই ইচ্ছা তাঁর ভেতরে অনেক দিন ধরেই চলে আসছিল। প্রায় সব পিতাই চায় তার স্বপ্নের মশালটাকে নিজের সন্তানের হাতে তুলে দিয়ে যেতে, কিন্তু সুযোগ হয় অল্প মানুষেরই। সব বাবার মতো আব্বাও নিশ্চয়ই চাইতেন তাঁর সন্তানদের মধ্যে এক বা দুজন তাঁর সাহিত্য ও শিক্ষকতার আদর্শকে উত্তরাধিকারসূত্রে বহন করুক। আব্বা জানতেন না কী অনমনীয়ভাবে আমি ছেলেবেলা থেকে তাঁর এই ইচ্ছার অনুকূলে আমার সিদ্ধান্তটি নিয়ে রেখেছিলাম। কেন ঐ অস্ফুট শৈশবে শিক্ষকতার স্বপ্ন আমাকে নিঃশব্দ হাতছানিতে ডেকে নিয়েছিল আজ তার ব্যাখ্যা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হয়ত মানুষের রক্তপ্রকৃতি এমনটাই। অবধারিত নিয়মে পায়ে পায়ে মানুষ তার নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে এমনি অব্যাহতিহীনভাবে হেঁটে যায়। আমার ধারণা শিক্ষকতা আমার রক্তপ্রকৃতি, আমার জীবনের প্রধান প্রবণতা। তাই

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এভাবে অমোঘ বিধিলিপির মতো আমি ঐ রাস্তায় চলে গিয়েছিলাম।

আর কিছু নয়, ধন নয় মান নয়—খ্যাতি বৈভব গৌরব কিছুই নয়, একজন নাম-পরিচয়হীন শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের মাঝখানে জীবন কাটিয়ে দেবার এই সিদ্ধান্তটি যেসব কারণে ঐ ছেলেবেলাতেই নিতে পেরেছিলাম, আব্বার ব্যক্তিত্বের প্রভাব তার একটি। এই প্রভাবটাই ছিল সবচেয়ে বড়। শিক্ষক হবার কোনো প্ররোচনা তিনি আমাকে সরাসরি কখনো দেন নি। হয়ত সাহসও করেন নি। এই বৈষয়িক ও রজতসর্বস্ব পৃথিবীতে ঐ উপেক্ষিত পেশার জন্যে প্ররোচনার ব্যাপারটি আজীবন তিনি কেবল নিজের জন্যেই তুলে রেখেছিলেন।

শিক্ষক হিসেবে আব্বা ছিলেন খ্যাতিমান। ১৯৫০ সালে আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, আব্বা তখন পাবনা এডোয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কথা উঠলে এমন সশ্রদ্ধ উদ্বেলতায় উপচে পড়ত যে মনে হত মানুষ নয়, কোনো দেবতা-টেবতা নিয়ে যেন তারা কথা বলছে। একজন ভালো শিক্ষক ছাত্রদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা-ভালোবাসার যে কী দুর্লভ বেদিতে অধিষ্ঠিত থাকেন আব্বাকে দেখে তা আমি টের পেতাম। একজন মানুষের এর চেয়ে বড় আর কী চাওয়ার থাকতে পারে এই পৃথিবীতে। ছাত্রদের জীবনে আব্বার ঐ দেবদুর্লভ প্রতিষ্ঠা দেখে সে-সময় থেকেই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এই পৃথিবীতে যদি কিছু হতেই হয় তবে তা হবে শিক্ষক হওয়া, আব্বার মতোন শিক্ষক—মানবীয় সাফল্যের সর্বোচ্চ শীর্ষ, জীবনের মহোত্তম মহিমা—যার চেয়ে শ্রেয় বা মহান কোনোকিছু এই পৃথিবীতে নেই, থাকা সম্ভব নয়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অনেক শিক্ষককে প্রায়ই একালের শিক্ষকদের দুর্দশা নিয়ে আক্ষেপ করতে শুনি আজকাল। তাঁদের বক্তব্য মোটামুটি একটাই—একালের শিক্ষকদের আগের মতোন তেমন সম্মান নেই। কথাটাকে আমার আদৌ সত্য বলে মনে হয় না। একজন সম্মানজনক শিক্ষক সম্মান পান না এমন ক'টা উদাহরণ আমরা আশেপাশে দেখাতে পারব। যদি কোনো শিক্ষক সম্মান না পান তবে কি ধরে নিতে হবে না যে ঐ অসম্মানের অনেকখানি যোগ্যতা তার নিজের ভিতরেও তিনি ধারণ করেন? পরীক্ষার হলে ছাত্রদের নকল সরবরাহের দায়ে যে-শিক্ষক পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বহিষ্কৃত, যে-অধ্যক্ষ শিক্ষকদের সঙ্গে যোগসাজশে কলেজের অর্থ আত্মসাতে জড়িত, যে-উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দলীয় রাজনীতির ভাগাড় করে তুলছেন, যে রজতলিপ্সু শিক্ষক ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে কেবল আর্থিক লেনদেনের পর্যায়ে নামিয়ে আনছেন বা যে-শিক্ষক এমনিতেই মেধাহীন, মূঢ় এবং অকর্ষিত তাঁর সম্মানের ব্যবস্থা কে দিতে পারবে? শুধু শিক্ষক বলেই কি তাঁকে সম্মান করতে হবে? সংসারে শ্রদ্ধা কি এতই শস্তা? শিক্ষকতায় না এসে অন্য কোথাও গেলেই কি তিনি ঐ সম্মান পেতেন? এমন কোনো সভ্যসমাজের কথা কি কল্পনা করা যায় যেখানে

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

'যোগ্য শিক্ষক' তাঁর প্রাপ্য সম্মান পান না? কোথায় মানুষের হৃদয় উচ্চতর যোগ্যতার সামনে নতজানু নয়? যদি সত্যিসত্যি এমনটা ঘটে তবে বুঝতে হবে তা শিক্ষাঙ্গনের সংকট নয়, সভ্যতার সংকট। ব্যাপকতর পটভূমিতেই তা বিবেচ্য। কিন্তু আমাদের মূল্যবোধের ঐতিহ্য তো দরিদ্র-শিক্ষককে শ্রদ্ধা দেখানোর ব্যাপারে আজও পুরোপুরি নিস্পৃহ নয়।

৩

কিছুটা বাড়ির বড়ছেলে বলে, কিছুটা আমার চেহারায় এবং প্রকৃতিতে আমার প্রয়াত মায়ের বিস্মৃত বিধুর ছোঁয়া ছিল বলে আব্বা আমাকে সবসময়েই একটু বেশিরকম স্নেহ করতেন। সাহিত্যের কল্পনা-রঙিন পৃথিবীতে তাঁর মতো উন্মুখ হয়েই যেন বেঁচে থাকি, হয়ত তিনি তাই চেয়েছিলেন। আমি বুঝতাম আমার মন যাতে সাহিত্যের সজীব আনন্দে সাড়া দিতে শেখে সেজন্য সাহিত্যের সবচেয়ে রঙদার জিনিসগুলো আমার চোখের সামনে নাড়াচাড়া করে আমাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করতেন তিনি। পনের-ষোল বছর বয়সের দিকে যখন আমার মন সাহিত্যের ভুবনে একে একে পাপড়ি মেলতে শুরু করল তখন তিনি হয়ত এক-ধরনের আত্মতৃপ্তিই বোধ করেছিলেন। বর্ষীয়ান কর্মঠ শিল্পোদ্যোক্তা যখন দেখেন অনিশ্চিত বেপরোয়া যৌবন এবং পড়াশুনা উৎরে তার একমাত্র সন্তান তাঁর অনেক স্বেদ আর রক্তে নির্মিত প্রতিষ্ঠানের হাল ধরতে এগিয়ে এসেছে তখন তিনি যে-ধরনের প্রাপ্তিতে শিউরে ওঠেন, আমার সাহিত্যাগ্রহে আব্বার অনুভূতি ছিল অনেকটা তেমনি। সে অনুভূতি অনেকটা এ-রকম : 'এসে গেছে সেই ঈপ্সিত উত্তরসূরি, তারই ঘরে জন্ম নিয়ে তার মশাল তুলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।'

ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হতেই শেক্সপিয়ার-সমগ্র তুলে দিলেন তিনি আমার হাতে। নিজের ছাত্রজীবনে ক্লাস নাইন থেকে টেনে ওঠার সময় ফার্স্ট হয়ে বইটা পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি।

'নে পড়, তিন মাসের মধ্যে শেষ করা চাই।'

'শেক্সপিয়ারের লেখা তো কঠিন, ভালো করে বুঝতে পারব না তো'—আমি বললাম।

'সব বোঝার দরকার নেই। বড় লেখকদের শ্রেষ্ঠ জায়গাগুলো সুন্দর হয়, সোজা হয়। ওটুকু পড়লেই চলবে। ঐ জিনিশগুলো দিয়েই তো তাঁরা পৃথিবীটাকে স্পর্শ করেন, নাড়া দেন। লেখকদের এই জায়গাগুলো, যেমন সার্বজনীন তেমনি সোজা। পড়ে যা। যেটুকু বুঝিস সেটুকুই পড়। ওতেই হবে।'

একদিন উৎসাহের আতিশয্যে সন্ধ্যায় বসে সমস্ত রাত পার করে একটানা পাগলের মতো ইংরেজি ছন্দ ও অলঙ্কারশাস্ত্র বুঝিয়ে গেলেন আমাকে। কী কী গুণে কবিতা সজীব, শক্তিমন্ত আর লাবণ্যমধুর হয়ে ওঠে তার জীবনোজ্জ্বল বর্ণনা। তাঁর বক্তব্যের সবকিছু পুরোপুরি না বুঝলেও টের পেয়ে চললাম একের পর এক ইংরেজি কবিতার উদাত্ত আবৃত্তির ভেতর দিয়ে বিষয়টার শক্তি ও সৌন্দর্য সারারাত ধরে উত্তাল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো আমার চেতনার ওপর দিয়ে আছড়ে চলে যাচ্ছে। যখন সেই উন্মাদ আবেগ স্থিত হয়ে এল, আব্বা ধীরে ধীরে শমে এসে শান্ত হলেন তখন চারপাশে সকালের কাঁচা রোদ পৃথিবী ছাপিয়ে উপচে পড়ছে। এমনি নিশিতে-পাওয়া প্রকৃতি ছিল আব্বার।

আজ বুঝতে পারি মাধ্যমিক পর্যায়ে সাহিত্য-পাওয়া মদির দিনগুলোর ভেতর যখন আমি মাতাল হয়ে বাঁচছিলাম, আব্বার জন্য তখন কতটা তৃপ্তির সময়। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর সাহিত্য প্রতিযোগিতায় আমার সাফল্য আব্বাকে আশান্বিত করছিল। আব্বার এই খুশির ব্যাপারটা টের পেতাম পরোক্ষভাবে। একটা গল্প বললে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। আমি তখন সম্মান শ্রেণীর তৃতীয় বর্ষে উঠেছি। সপ্তাহান্তে প্রায় নিয়মিত বেড়াতে যাওয়া হত মুন্সীগঞ্জে। মুন্সীগঞ্জ কলেজের সেমিনারে একটা ইংরেজি প্রবন্ধ পড়েছিলেন আব্বা এই সময়। নাম টিয়ারস অব জেবুন্নেসা (জেবুন্নেসার অশ্রু)। সেমিনারের অন্যতম আলোচক ছিলাম আমি। আমার বক্তৃতা বোধহয় মুন্সীগঞ্জ শহরের পক্ষে সে-সময় একটু বেশিরকমই ভালো হয়ে পড়েছিল। উপস্থিত শ্রোতারা বিপুলভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন। শুনেছি দিনকয়েক পর এক ভদ্রলোক আব্বার কাছে ঐ বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার সময় আব্বার চোখে নাকি পানি এসে গিয়েছিল। লাভ হয়েছিল অভাবিত এবং হাতে-নাতে। আমার মাসিক হাতখরচের টাকা পদোন্নতি পেয়ে একলাফে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল।

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমার স্কুল-জীবনের শিক্ষকেরা

১

আব্বা ছাড়া যে-সব মানুষের নিবিড় ও শ্রদ্ধেয় মুখ আমাকে শিক্ষকতার পথে ডাক দিয়েছিল ছেলেবেলার শরদিন্দু বাবু তাঁদের একজন। শরদিন্দু বাবুর স্নেহের গভীর স্পর্শের ভেতর দিয়ে আমি প্রথম মানুষের ভালোবাসাকে চিনতে শিখেছিলাম। আমার বয়স তখন পাঁচ-ছ' বছর। সবে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছি। টাঙ্গাইল থেকে মাইল-চারেক দূরে করটিয়ায় থাকতাম আমরা। শাদা ধুতিপাঞ্জাবি-পরা প্রৌঢ় বয়সের শরদিন্দু বাবু ধীর-পায়ে হেঁটে আমাকে পড়াতে আসতেন অনেক দূর থেকে— টাঙ্গাইল বা তার কাছাকাছি কোনো গ্রাম থেকে— তাঁর খালি পা মেঠো রাস্তার শুকনো ধূলায় শাদা হয়ে থাকত। স্যারের কথা মনে হলে আজও আমার চোখের সামনে দেখতে পাই তেঁতুল, শিমুল আর আমগাছে ছাওয়া কোনো একটা আশ্চর্য রাস্তা হেঁটে আমাদের বাড়ির দিকে সেই একলা মানুষটি একা-একা যেন কেবলই আসছেন, কেবলি এগিয়ে আসছেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আম পাকার সময় এসে গেছে—চারপাশে আট-দশটা আমগাছ—এরই একটা গাছের নিচে মাদুরের উপর বসে স্যারের কাছে বৈকালিক পড়াশোনা করি। সামান্য একটু বাতাস উঠলেই একটা-দুটো পাকা আম ধুপধাপ করে এ-ধারে ও-ধারে পড়ে আর হঠাৎ খুশিতে বইপত্র ফেলে, অন্য কেউ সে-সব গায়েব করার আগেই ছুটে গিয়ে সেটা হাতিয়ে নিই। এই ছোটাছুটির ফাঁক দিয়ে শরদিন্দু স্যারের পড়ানোর সময়টা বুঝতে-না-বুঝতেই শেষ হয়ে যায়।

কী সে অপার্থিব সুখ এ-ভাবে আম কুড়োনোয়! প্রতিটা আমকে মনে হয় আলীবাবার হঠাৎ-পাওয়া-সম্পদের মতো। গ্রামে-মানুষ-হওয়া ছেলেমেয়ে মাত্রেই এই খুশির সঙ্গে পরিচিত। আশ্চর্য প্রাপ্তিতে এই খুশি মনটাকে চকিত পুলকে ভরিয়ে রাখে। আমার ধারণা ছিল এই আম-কুড়োনোর ব্যাপারটা আমার একলা কৈশোরের আলাদা ঘটনা। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে টের পেয়েছি আম-কুড়োবার এই ফুর্তি বাংলাদেশের প্রায় সব যুগের সব শিশুরই সর্বজনীন সম্পত্তি। কবিতায় আছে :

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

'ঝড়ের দিনে মামার দেশে আম কুড়োতে সুখ
পাকা জামের মধুর রসে রঙিন করি মুখ।'

জসীমউদ্‌দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'-বইটাতেও আম কুড়াবার খুশির কথা রয়েছে। পেছন থেকে সুজনের হঠাৎ ডাক শুনে দুলির মন যখন আচমকা খুশিতে ভরে যায় তখন :

'কুড়ায়ে পাইল পাকা আমটিরে দুলির এমনি লাগে।'

দিনের পর দিন এই একই কারণে পড়াশোনা ফাঁকি দিচ্ছি দেখে শরদিন্দু স্যার আমাকে পড়ানোর অভিনব কৌশল বের করলেন। পরদিন আম কুড়োনোর জন্য যেই ছুট দিতে যাব অমনি তিনি পাঞ্জাবির দুই পকেট থেকে মুঠোয় করে বড় বড় দুটো ডাঁশা ফল বের করে সামনে ধরলেন,

' বল তো আমার হাতের মুঠোয় কী?

www.amrajaraboipori.wordpress.com

মুঠোর ভেতরের ফলগুলো এতবড় যে আঙুলের ফাঁক দিয়ে পুরোপুরিই দেখা যাচ্ছিল। চেঁচিয়ে বললাম, 'পেয়ারা!' আমাদের চারপাশে আমগাছ ছিল বিস্তর। রোজ রোজ আম পেয়ে এর আকর্ষণেও ভাটার টান লেগে গিয়েছিল। কিন্তু পেয়ারা! সে তো স্বর্গের দুর্লভ ফল। আমাদের বাড়িতে তো নেইই, আশেপাশের কারও বাড়িতে পর্যন্ত না। দুই হাতে দুই স্বর্গ নিয়ে স্যার অভাবিত দেবতা হয়ে আমার সামনে রহস্যময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আম ছেড়ে পেয়ারার জন্য এবার কাকুতি মিনতি শুরু হয়ে গেল। গলায় রহস্য আর কৌতুক মিশিয়ে স্যার বললেন, 'পড়া শেষ কর, দেব।' সুবোধ ছেলের মতো আমি পড়তে বসে গেলাম।

এমনি রোজ রোজ নতুন ভেট দিয়ে স্যার আমাকে পড়ার জগতের ভেতর খুশি করে রাখলেন। কবে কী ভেট আসবে এই নিয়ে সারাটা দিন কল্পনায় উত্তেজনায় রঙিন হয়ে থাকত। ভেটগুলো যে অনন্যসাধারণ কিছু ছিল তা নয় কিন্তু আমার প্রতিটা দিনকে তা এক দুর্লভ আসন্নতার দিকে উন্মুখ করে রাখত। পড়ার আনন্দ শেষ হলে, স্যার পরিতৃপ্ত হলে, খুলে যাবে সেই স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গ। স্বপ্ন ধরা দেবে হাতে। এমনি করে কখন যে একসময় পড়ার আনন্দ আর উপঢৌকনের আনন্দ এক হয়ে গিয়েছিল টের পাই নি। এক সময় অনুভব করেছিলাম স্যারের আদরের ভেতর বেঁচে বেঁচে আমি কখন একসময় যেন পড়াশোনাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

একজন সফল শিক্ষকের দুটো বড় গুণ ছিল স্যারের মধ্যে। প্রানির মতো, নিশ্বাসের মতো এগুলো তাঁর প্রকৃতির ভেতর খেলা করত : প্রীতি আর

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

Scan & Upload by Tusin ahmed

www.amrajaraboipori.wordpress.com

প্রিয়তা। প্রীতি মানে ভালোবাসা যা শিক্ষকের হৃদয় থেকে ছাত্রের দিকে অবারিত ধারায় বয়ে যায়। এটা যেতেই হবে। না হলে ছাত্রের হৃদয়-জগতে তিনি সজীবভাবে গৃহীত হবেন না, ছাত্রের হৃদয় জেগে উঠবে না, ছাত্রের কাছে তিনি আচরণীয় বা অনুসরণীয় হয়ে উঠবেন না। আর প্রিয়তা মানে ছাত্রের কাছে শিক্ষককে প্রিয়, ঈপ্সিত বা আনন্দময় হয়ে উঠতেই হবে তা তাঁর পেয়ারা বা রসগোল্লা বা পড়ানোর অনবদ্য লাবণ্য যা দিয়েই হোক।

বছর-পঁচিশেক পরে একবার করটিয়ায় গিয়েছিলাম কলেজের বাংলা বিভাগের আমন্ত্রণে। সেখানে পৌঁছেই শৈশবের শরদিন্দু স্যারকে খুঁজে বেড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু সুদূর গ্রামের অচেনা রাস্তা দিয়ে তিন-চার মাইল হেঁটে-আসা নগ্নপদ সেই শিক্ষকের কোনো খবরই দিতে পারে নি কেউ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর এই পৃথিবীতে কে-ই বা তাঁকে আর ততদিন মনে রেখেছে। হয়ত এর অনেক আগেই, আমার জীবনের সেই আদিমতম শিক্ষকটি, জগতের সেই অদরকারি তুচ্ছ লোকটি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

২

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ঠিক একইভাবে পরপর দু-বছর পাবনায় গিয়ে খোঁজ করেছিলাম আমার স্কুলজীবনের আরেক শিক্ষক অমর পালকে। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তাঁর কাছে পড়েছিলাম আমি। অমরবাবু ছিলেন আমাদের স্কুলের—রাধানগর মজুমদার একাডেমির—শিক্ষক। ছোট নদী ইছামতীর ধারে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের গা-ঘেঁষা এই স্কুল ঐ গ্রামেরই জমিদারদের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত। আমার আব্বা তখন পাবনা কলেজে। কলেজের দক্ষিণপূর্ব কোণে ইছামতীর ধারে স্কুলের প্রায় একই রেখায় আমাদের বাসা। আশ্চর্য নদী এই ইছামতী। খরস্রোতা পদ্মার উচ্ছল ধারা থেকে বেরিয়ে-আসা এক সুশ্রী উচ্ছল তন্বী—শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে গিয়ে দু-ধারের গ্রামবাংলার রহস্যময় সবুজ পৃথিবীর ভেতর একসময় উদ্দেশ্যহীনভাবে হারিয়ে গেছে। হেমন্ত থেকে চৈত্র—এই সময়টার মধ্যে তার অবস্থা হয়ে উঠত বেতের মতো শীর্ণ, নিঃসঙ্গ আর আর্ত। মাঝে মাঝে তারই ভেতর ঘন কচুরিপানার ছোট ছোট দম-আটকানো বদ্ধ ডোবা। কিন্তু জ্যৈষ্ঠের শেষে বা আষাঢ়ের প্রথমদিকের কোনো এক দিনে ঘটত এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। হঠাৎ কোত্থেকে নতুন ক্লেদাক্ত পানির হিংস্র উচ্ছ্রিত স্রোত দুই পাশের বিস্তীর্ণ এলাকা ভাসিয়ে দিগ্বিজয়ীর মতো ছুটে আসত আমাদের বাসার দোরগোড়া অব্দি। নোংরা পানির সেই উচ্ছল আবিলতাকে আমরা আমাদের দুর্বার তারুণ্যের উন্মাদনা দিয়ে সুতীব্রভাবে অভিনন্দন জানাতাম। এই হিংস্র

Scan & Upload by Tusin ahmed

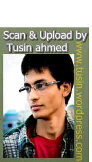

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কদর্য পানিতে ঝাঁপিয়ে লাফিয়ে, দুই হাতে কুটি কুটি ছিঁড়ে তাকে আমরা আমাদের বন্য কৈশোরের বন্ধু করে নিতাম।

অমরবাবু ছিলেন ঐ ইছামতীরই মতো—তবে তা বর্ষার নয়—বছরের বাকি সময়টুকুর ইছামতী। নদীর দুই ধারের দারুচিনি জামরুল আর কাঞ্চনের অপরাভূত শোভার মতো ছিলেন তিনি। স্নেহ আর প্রীতি ছাড়া ছাত্রদের কিছুই দিতে জানতেন না। আমাদের সব দোষ ও লজ্জাকে দুই হাতের আদরে ঢেকে অপর্যাপ্ত প্রীতিতে কেবলই আপ্লুত করে যেতেন তিনি। সেই স্নেহের ধারা আমার শৈশব থেকে যৌবন পেরিয়ে আজও আমাকে যেন স্নিগ্ধ করে চলেছে।

বেত—যা ছিল সে-সময়কার অধিকাংশ শিক্ষকের ব্যতিক্রমহীন দোসর—তাঁর হাতে কখনও দেখি নি। তাঁর মুখে বকুনি ছিল না, কপালে ভ্রূকুটি না, কোনো দোষের জন্যে শাস্তি না। ক্লাসে পড়া পারলে শান্ত উজ্জ্বল খুশিতে তিনি আমাদের অভিনন্দন জানাতেন, না পারলেও প্রশান্ত আনন্দে—আমাদের সম্মানবোধকে এতটুকু আহত না করে— এমনভাবে কথা বলতেন যেন প্রশ্নটার উত্তর আমাদের জানাই আছে, কোনো হঠাৎ বিস্মৃতি বা এমনি তুচ্ছ কোনো কারণে এ-মুহূর্তে মনে করে বলতে পারছি না। উজ্জ্বল সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী প্রিয়দর্শন অমরবাবুর দেবদুর্লভ জ্যোতির্ময় মুখাবয়ব আমি এই মুহূর্তেও আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কৈশোরের উপেক্ষিত দিনগুলোয় তাঁর কাছে সম্মান আর নিরাপত্তার একটা মমতাস্নিগ্ধ আশ্রয় পেয়েছিলাম আমরা। সেই সম্মানের মর্যাদা রাখার জন্য আমরা আরও ভালো করে পড়াশোনা করতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছি। পৃথিবীর সবকিছুকে সরল পবিত্র এবং নিষ্পাপ ভাবতে পারার, বিশ্বাস করতে পারার এক দুর্লভ ও সহজ শক্তি ছিল তাঁর ভেতরে। আমাদের সব অযোগ্যতা অমনোযোগিতা এমনকি হঠাকারিতাকেও তিনি ভালোবাসার স্নিগ্ধ আদর দিয়ে দেখতে পারতেন। এতটাই ছিল তাঁর হৃদয়ানুভূতির সহজাত শক্তি। তাঁর এই অবোধ দুর্লভ অসাধারণ শক্তি তাঁর সামনে আমাদের ছোট করে দিত। সেই পরাজয়ের অনুভূতি থেকে আজও আমি বেরোতে পারি নি।

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তাঁর এই আবাল্যের ঋণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর চেষ্টা করেছিলাম। সফল হই নি। কোনো একটা কাজে পাবনা গিয়েছিলাম একদিনের জন্যে। তিনি বেঁচে আছেন কিনা তাও জানা ছিল না। ঘন জঙ্গলে ঢাকা যে মেঠো সরু রাস্তা ধরে তিনি দূর গ্রামের ভেতর থেকে সাইকেলে করে আসতেন সেই পথ ধরে স্যারের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। রাস্তার দু-পাশের অনেকদূর পর্যন্ত পাবনা শহরের ক্রমপ্রসারমাণ দালানকোঠার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হল—আমাদের ছেলেবেলায় এসব কিছুই সেখানে ছিল না। একসময় সেই হারানো রাস্তাটাকে খুঁজে পাওয়া গেল। সনাতন গাছপালা-ঢাকা সবুজ পল্লিগ্রামের ভেতর বেলফুলের মতো ফুটে থাকা তাঁর ছোট্ট শাদা বাড়িটা খুঁজে বের করতেও দেরি হল

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

না। একটা পরিপাটি গোছের মন্দিরের পাশে স্যারের একতলা সুদৃশ্য বাড়িটা দেখতেই স্মৃতিময় ছেলেবেলা চোখের সামনে এসে দাঁড়াল।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কিন্তু দুঃখের বিষয় স্যারকে সেখানে পাওয়া গেল না। বয়স আশির উপরে হলেও শুনে আশ্বস্ত হলাম যে ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে এখনও ঐ বাড়িতে তিনি বাস করছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষার নামে যিনি হৃদয় বা আবেগের ওপর অনর্থক অত্যাচার করেন নি, গোসলের আগে আজীবন আধঘন্টা ধরে কাঠুরিয়ার নিষ্ঠায় কাঠ চিরেছেন, সময় ধরে চলেছেন ; দীর্ঘ আর সুস্থ জীবন তাঁর পাবারই কথা। বাড়ির গন্ধরাজ, কামিনী, স্থলপদ্ম, নাগেশ্বর আর বেলফুলের পরিপাটি ঝাড় যেন আমাদের ছেলেবেলায় দেখা সেই সুরুচিময় মানুষটিকেই মনে পড়িয়ে দিল। আমাদের কড়ানাড়ার শব্দে বাড়ির ভেতর থেকে ফুটফুটে চেহারার একটি কিশোরী এসে খবর জানাল স্যার সপ্তাহখানেক আগে বগুড়া গেছেন আত্মীয়বাড়িতে, মাসখানেক পরে ফিরবেন। মেয়েটার চেহারাতেও স্যারের অল্পবয়সের সেই স্নিগ্ধ দীপ্তি। হয়তবা পরিবারের সর্বশেষ প্রজন্মের কেউ। হতাশা নিয়ে ফিরে আসতে হল। আমার সঙ্গী হয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন তার কেউ স্যারকে চিনতেন না। একজন অখ্যাত শিক্ষককে নিয়ে আমার এই উৎসাহ তাঁদের কাছে হয়ত একটু অর্থহীনই ঠেকছিল।

পরের বছর আবারও পাবনা যেতে হল। আবারও স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু এবারও তাঁকে পেলাম না। দিন-পনের আগে স্যার ভারতে চলে গেছেন। না, আর ফিরবেন না, চিরদিনের জন্যই চলে গেছেন তিনি। বার্ধক্যের নিঃসঙ্গ দিনগুলো ভারতে ছেলেদের সঙ্গে কাটানো স্বস্তিকর ও নিরাপদ মনে হওয়ায় তিনি চিরবিদায় নিয়ে গেছেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৩

রাধানগর স্কুলে আমাদের আরেকজন শিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম ঘটিরামবাবু। ঘটিরাম শব্দটার মানে তখন জানতাম না, বড় হয়ে অভিধানে দেখেছি। এর মানে 'অপদার্থ' বা ঐ জাতের কিছু। যদি তাই হয় তবে কী করে তা একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোকের নাম হতে পেরেছিল, আর হলেও কী করেই বা তা তিনি অম্লানবদনে সারাজীবন বয়ে বেড়িয়েছেন, কেউ তাঁকে ঐ নামে ডাকলে নির্বিকার সানন্দে সাড়া দিয়েছেন, ব্যাপারটা ভাবতে এখনও অবাক লাগে। গুরুজনদের কেউ তাঁর ঐ নাম রেখেছিলেন, এমন মনে হয় না। হয়ত ছেলেবেলায় কোনো দুরপনেয় নির্বুদ্ধিতার মাশুল হিসেবে কারো উপস্থিত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ে, ঐ নামটি চিরকালের জন্যে তার জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। ঘটিরামবাবু ছিলেন জমিদারবাড়ির ছেলে। সে-কালে জমিদার পরিবারের অপদার্থ ছেলেদের অনেক সময় মাস্টারির

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

মহৎ পেশায় পাঠিয়ে শিক্ষক নামের সম্মানজনক আড়ালে জন্মগত অযোগ্যতাকে পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলত। ঘটিরামবাবু হয়ত ছিলেন জমিদারবাড়ির ঐ বলিদেরই একজন।

যা হোক এমনি এক-আধটা দুঃখজনক উপকাহিনী বাদ দিলে, ঘটিরামবাবু মোটামুটি মানুষ ভালো ছিলেন। পড়াতেনও চলনসই। এমন আহামরি কিছু তিনি নন যাতে এতদিন পরে তাঁর কথা আলাদাভাবে মনে থাকবে। তাঁর চেহারা, কথাবার্তার ঢং সবই আজ স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। পুরোই অবয়বহীন হয়ে গেছেন তিনি আমার জীবন থেকে। কিন্তু একদিন ঘটেছিল এক আশ্চর্য ঘটনা! ক্লাসে পড়াতে পড়াতে হঠাৎ করেই তিনি জেগে উঠেছিলেন। জেগে নয়, পুরোদস্তুর জ্বলে উঠেছিলেন তিনি। কী একটা কথার সূত্রে হঠাৎ স্বামী বিবেকানন্দের কথা উঠতেই তিনি জ্বলে উঠলেন। শুরু হল এক রোমাঞ্চকর দপদপে বিরতিহীন কল্পকথা। কী করে নরেন্দ্র নামের অবিশ্বাসী কলেজি তরুণ রামকৃষ্ণকে ব্যঙ্গ করার অভিসন্ধি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে উল্টো চিরদিনের জন্যে তাঁর শিষ্য হয়ে পড়ে রইলেন; তারপর সেই আর্ত ঈশ্বরপিপাসু যুবকের অস্বস্ত ভারত ভ্রমণ, তাঁর আত্মিক অগ্রযাত্রা, হিন্দুধর্মের মহত্ত্বকে শিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা, এমনি সব উদ্বেলিত গল্প। কী করে কত দুঃখ-কষ্টের পথ ধরে, কেবল একটা টিকিট আর পথখরচ সম্বল করে সুদূর আমেরিকার পথে পা বাড়ালেন তিনি, সেখানে প্রতিকূল পরিপার্শ্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নানান জনের সহযোগিতার ভেতর দিয়ে উপস্থিত হলেন বিশ্বধর্ম সম্মেলনে; কীভাবে সেই সভার আয়োজকদের সজোর আপত্তির মুখে, শুধুমাত্র সভাপতির অনুমতিতে কয়েক মিনিটের অনির্ধারিত বক্তৃতার সুযোগ পেলেন; তারপর তাঁর জ্যোতির্ময় দেহকান্তি, বলদৃপ্ত ওজস্বী ভাষণ, সর্বমানবের সর্বজীবের জন্যে ভালোবাসা—সবকিছু দিয়ে কী করে সবাইকে সম্মোহিত করে ফেললেন এবং সবশেষে শ্রোতাদের মুহুর্মুহু উদ্দীপনার মুখে ধর্মীয় ভালোবাসার জ্বলন্ত আহ্বান ছড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের মুগ্ধ বিস্মিত হতবাক করে বিশ্বজয় করলেন—সেই চমকপ্রদ সত্যভুলে মেশানো কাহিনী।

'তো বুঝলি', স্যার বলতে লাগলেন, 'বক্তৃতার অনুমতি তো পেলেন কিন্তু কী বলবেন কিছুই মাথায় আসছে না বিবেকানন্দের। কী করে জয় করবেন সবার মন! কী বলে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের সামনে হিন্দুধর্মের মহত্ত্বকে তুলে ধরবেন!

হঠাৎ তাঁর মনে হল স্বয়ং মা-কালী যেন পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথার ওপর ডান হাত প্রসারিত করে আছেন। যেন তিনি বলছেন, ভয় কী রে? বল্ না। দেখছিস না আমি তোর পেছনে দাঁড়িয়ে আছি। বিবেকানন্দের চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল। তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন। সে তো আর তার কথা নয়, সে তো

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

বাণী ! এ যে স্বয়ং মা–কালী বলছেন তার ভেতর দিয়ে।'

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ঘটিরামবাবু আর তার সেই ক্লাস কবে হারিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। আমাদের জীবনের কত উদ্যোগী ঘোষণা অর্থহীন হয়ে গেছে এই পঁয়তাল্লিশ বছরে। তাঁর বক্তব্যের কতটুকু সত্য, কতখানি মিথ্যা তার সবকিছুই আজ বিচার–বিতর্কের বাইরে। কিন্তু, সেদিন সেই ক্লাসের স্তব্ধ বিস্মিত ছাত্রদের সামনে একজন মানুষের সংগ্রাম আর অগ্রযাত্রার যে–শক্তিমন্ত জ্বলজ্বলে কাহিনী তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তার অশ্বক্ষুরধ্বনি আমার ভেতর আজও প্রথম দিনটির মতোই মুখর হয়ে রয়েছে।

ঘটিরামবাবুর চেহারা অবয়ব কোনোকিছুই আজ আর মনে নেই। কিন্তু সেদিনের সেই জেগে–ওঠা মুহূর্ত, তাঁর সেই উদ্বুদ্ধ কণ্ঠস্বর, হাতের উদ্দীপ্ত আবেগসন্ত্রস্ত ওঠানামা, সজীব জ্বলজ্বলে চাউনি ছেঁড়া–ছেঁড়াভাবে আজও স্মৃতির পটে বেঁচে আছে। পরীক্ষার নোট মুখস্থ করিয়ে অনেক শিক্ষকই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনকে নিষ্কণ্টক ও নিরাপদ করে দিতে পারেন, আজ এদেশে এমন উপকারী ছাত্রবন্ধুর অভাব নেই। নিশ্চয়ই সুবিবেচক অভিভাবকদের প্রিয় ও অভিনন্দন–ধন্য তাঁরা। কিন্তু যে–শিক্ষক এমনি প্রজ্জ্বলন্ত হৃদয়ের উত্তাপে ছাত্রের আবেগকে মহত্ত্বের পিপাসায় এভাবে জাগিয়ে দিয়ে যেতে পারেন—জীবনের একটি–দুটি ক্লাসেও যদি তা তিনি পারেন—তবে তার সমকক্ষ আর কে? একজন শিক্ষক ছাত্রের হৃদয়কে কত গভীরভাবে আক্রান্ত করতে পারেন সেদিনের সেই জ্বলে–ওঠা ঘটিরামবাবু তার উদাহরণ।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৪

নবম শ্রেণীতে ওঠার পর রাধানগর মজুমদার একাডেমি ছেড়ে আমি ভর্তি হলাম পাবনা জেলা স্কুলে। আমাদের বাসা থেকে মাইলখানেক দূরে এই জেলা স্কুল, ইছামতীর শীর্ণ রূপসী ধারা থেকে দূরে, পদ্মার বিশাল জলজ ধারার কাছাকাছি। রাধানগর মজুমদার একাডেমি ছিল শহরের পুবদিকে, আরও পুবে গেলে ঘন জঙ্গলে ঢাকা আবহমানের গ্রামবাংলা, সে–সব পেরিয়ে আর একটু এগোলে বালু চিকচিক–করা ঝপঝপে বিল এলাকায় 'ফান্দে পড়িয়া বগা'র ধু–ধু দেশ। জেলা স্কুল ছিল শহরের পশ্চিমদিকে। তার পশ্চিমে এক মাইলের মধ্যে পদ্মার শাখা–প্রশাখার লীলা–প্রসারিত পৃথিবী। জেলা স্কুলের মাঠের বাতাস বুকের ভেতর নিতে গিয়ে আমি পদ্মার সেই বিশাল জলজ জগতের তাজা ঘ্রাণ টের পেতাম।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

জেলা স্কুলের যে-সব শিক্ষক আমার কিশোর-হৃদয়কে স্বপ্ন আর ভালোবাসার পৃথিবীতে জাগিয়ে তুলেছিলেন, স্কুলের মওলানা কসিমউদ্দিন আহমদ ছিলেন তাঁদের সবার ওপরে। মাথায় জিন্না-টুপি, দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো, স্যুটপরা, ছিমছাম চেহারার উজ্জ্বল চটপটে কসিমউদ্দিন স্যার ছিলেন সারা স্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ। মৌলভি মনে হওয়া দূরে থাক, স্যারদের চেয়েও আধুনিক মনে হত তাঁকে। ক্লাসঘর থেকে স্কাউটিং, খেলার মাঠ থেকে বিতর্কসভা সব জায়গাতেই তিনি ছিলেন আমাদের নেতা ও সহযাত্রী।

লম্বা ঝুলঅলা অকর্ষিত পাঞ্জাবি আর টুপিপরা বিমর্ষ চেহারার যে-সব মৌলভি সাহেবদের আমরা প্রায় প্রতিটি স্কুলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠগুলোর ভেতর নিঃশেষিত হতে দেখে থাকি, তিনি ছিলেন পুরোপুরি তার উল্টো। তিনি আমাদের হুজুর ছিলেন না, ছিলেন স্যার। স্বপ্নেভরা চোখ, উদ্দাম জীবনাবেগে দৃপ্ত, প্রিয়দর্শন ও আপাদমস্তক আধুনিক কসিমউদ্দিন স্যার ছিলেন সারা স্কুলের তারুণ্যের প্রতীক।

কসিমউদ্দিন স্যার আমাদের উর্দু পড়াতেন। তাঁর পড়ানোর ভেতর দিয়ে অস্তায়মান মোগল সাম্রাজ্যের বিষণ্ন-ধূসর চেহারাটা আমরা চোখের সামনে দেখতে পেতাম। তাঁর আবৃত্তির ভেতর দিয়ে প্রেম-ব্যথিত কবি, তাওয়ায়েফ, আর ওমরাহদের বিমর্ষ স্মৃতি-মাখানো দিল্লির হারানো দিনগুলোর রাস্তায় রাস্তায় তিনি আমাদের নিয়ে ফিরতেন। উর্দু কবিতার বলিষ্ঠ পৌরুষ, বিচ্ছেদের রোদন সবকিছুই তার কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয়ে উঠত।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

প্রথম দিন তিনি পড়িয়েছিলেন খাজা মীর দরদ-এর কবিতা :

তেহমদে চন্দ আপনে জিম্মে ধর চলে।
কিস লিয়ে আয়েথে হাম কেয়া কর চলে॥
জিন্দেগি হ্যায় ইয়া কোয়ি তুফান হ্যায়।
হাম তো ইস জিনে কো হাথো মর চলে॥

কবিতাটায় জীবনের শীর্ষকে ছুঁতে না-পারার অতৃপ্তি কেঁদে উঠেছে। কিন্তু আমার জীবনে তার আবৃত্তির সবচেয়ে সংরাগময় আবেদন বেজে উঠত উর্দু প্রেমের কবিতার দুঃসহ দুঃখের ছোঁয়ায়। মোমিনের একটা কবিতা :

ও যো হামমে তুমমে ক্যারার থা, তুমহে ইয়াদ হো কে না ইয়াদ হো—

সেই-যে তোমার আমার মধ্যে অঙ্গীকার ছিল, তোমার মনে আছে কি না-আছে জানি না (কিন্তু আমার মনে আছে)।

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ও যো ইয়ানি নাবাই কা থা তুমহে ইয়াদ হো কে না ইয়াদ হো
ও ন্যায়ে গেল্লে ও শেকায়েতে ও মজে মজে কী হেকায়েতে
মুঝকো ইয়াদ হ্যায় ও জ্বারা জ্বারা তুমহে ইয়াদ হো কে না ইয়াদ হো।

মোমিনের কবিতায় সেই-যে শপথের বিশ্বাস আর অঙ্গীকারকে জেনেছিলাম, সারাজীবন সেই শপথের অন্বেষণেই তো কাটল। কিন্তু কাকেই বা কথা রাখতে দেখেছি। কোথায়ই বা?

আর একটা কবিতা ছিল আলতাফ হোসেন হালির :

—ও উমিদ কেয়া জেসকে হো এনতেহা।
— ও ওয়াদা নেহি যো ওফা হো গিয়া॥

তাকে কি আশা বলা যাবে যা পূরণ হয়ে গেছে। যা পালিত হয়েছে, কী করেই বা তাকে অঙ্গীকার বলি?

কবিতাটার একজায়গায় একটা দুঃসহ কষ্টের কথা ছিল : 'যে দুঃসহ যন্ত্রণা একদিন সমস্ত সহ্যের সীমাকে অতিক্রম করেছিল আজ তা দৈনন্দিন আহার্যের মতো হয়ে গেছে।'

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আরো অনেক কবিতা ছিল অপূর্ব :

ও হাওয়া না রহি ও চেমন না রাহা
ও ফালাক না রাহা ও শামা না রাহা
না ও জাম রহে না ও মস্ত রহে,
ও তরিকায়ে কারে জাহাঁ না রাহা

ও গলি না রহি ও হাঁসি না রহে
ও মোকাঁ না রহে ও মকিঁ রহে....
না ও ফেদাইয়ে আহাদে আলশতো রহে
ও মোশাগেলে রওনাকে দীনা রহে।

সেই বাতাস নেই, সেই বাগিচা নেই, সেই পথ নেই, সেই ঘর বা গৃহ নেই—সারাটা কবিতা ফেলে-আসা সুন্দর সময়ের জন্যে হাহাকার!

রবার্ট বার্নসের একটা কবিতায় একটা মেয়ের রূপ-বর্ণনা পড়েছিলাম অনেক বছর আগে। বর্ণনাটা এমন : তাকে দেখা মানেই তাকে ভালোবাসা, আর (একবার) ভালোবাসা মানে চিরদিনের জন্যে ভালোবাসা। স্যারের মদির কণ্ঠের আবৃত্তি ছিল ঠিক তেমনি : তা শোনা মানেই মুখস্থ হওয়া, আর মুখস্থ হওয়া মানে চিরদিনের জন্যে জীবনের ভেতর গেঁথে যাওয়া। এই মুহূর্তে যে-কবিতাগুলো উদ্ধৃত করলাম তার সবগুলোই সেই স্কুলজীবনের স্মৃতি থেকে সরাসরি তুলে দেওয়া। উদ্ধৃতিতে ভুল থাকতে পারে কিন্তু সঠিকভাবে সেগুলো শুদ্ধ করে দেওয়া আজ আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

Scan & Upload by Tusin ahmed

www.amrajaraboipori.wordpress.com

স্যারের দরাজ গলার উর্দু কবিতার আবৃত্তি আর তাঁর আবেগ-বিধুর বাংলা অনুবাদ যে অনবদ্য কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করত তা দিয়েই কবিতার সৌন্দর্যের সঙ্গে আমার প্রথম সপ্রেম পরিচয়। শিক্ষকতার শক্তি আর তার প্রভাব যে কতটা গভীর আর সুদূরপ্রসারী তা আরেকবার জানতে পেরেছিলাম তাঁর পড়ানোর ভেতর দিয়ে।

একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধ এ দেশে যাদেরকে আত্মাহুতিতে আহ্বান করেছিল, আমাদের ঐ ছোট শহরটায় কসিমউদ্দিন স্যার ছিলেন তাঁদের একজন। ধার্মিক হয়েও তিনি ছিলেন অন্ধত্ব আর সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে তাই প্রত্যাশিত শাস্তিই তাঁকে পেতে হয়েছিল। তাঁর ভেতরকার নিখাদ দেশপ্রেম এবং আধুনিকতা তাঁকে এই মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়েছিল। তাঁর জীবনের পরিণতি কষ্টদায়ক। মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি পর্যায়ের এক অন্ধকার রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁকে ট্রাকে তুলে নিয়ে শহর থেকে বারো-তেরো মাইল দূরে পাবনা-ঢাকা রাস্তার একটা ছোট ব্রিজের ওপর থেকে গুলি করে নিচে পানিতে ফেলে দেয়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে তুলে নিয়ে খানিকটা দূরে গাছপালার নিচে একটা নিরিবিলি জায়গায় সমাধিস্থ করে।

এই হলেন আমাদের কসিমউদ্দিন স্যার—আমাদের কৈশোর দিনের সবচেয়ে জ্বলজ্বলে মানুষ। পাবনা শহরের অধিবাসীরা এই উষ্ণ-হৃদয় মানুষটির স্মৃতিকে মুছে যেতে দেয়নি। শহরের প্রধান সড়কটা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে এসে পাবনা শহরে ঢোকার মুখে কলেজ পেরিয়ে যেখানে ইছামতী-ব্রিজের ওপরে উঠেছে, ঠিক সেখানটায়, রাস্তার বাঁদিকে তার নামে গণ-পাঠাগার এবং স্কুল তৈরি করে তারা তাঁকে সম্মানিত করেছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমার কলেজ-জীবনের শিক্ষকেরা

১

আমার জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল শিক্ষকদের দেখা পেয়েছিলাম আমার কলেজ-জীবনের দিনগুলোয়, বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে। ১৯৫৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পরবর্তী দুই বছর আমি ঐ কলেজের ছাত্র ছিলাম।

আজীবন যে-সব সাংগঠনিক কাজের ভেতর দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আগামী দিনের সম্পন্ন বাঙালি জাতিকে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর তৈরি এই কলেজ তার একটি। তাঁর সবুজ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে অসাধারণ শিক্ষকেরা তাঁর সঙ্গে এই কলেজে এসে ভিড় করেছিলেন, সেই আদর্শের শেষ কয়েকজন তখনো এই কলেজে ছিলেন। এঁদের ভেতর শিক্ষকতার যে জ্যোতির্ময় রূপ আমি দেখেছি তার সমমানের কোনোকিছু আমি আমার জীবনে আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এই কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে আব্বার যোগদানের সূত্র ধরে, খানিকটা কাকতালীয়ভাবেই আমার এই কলেজে ভর্তি হওয়া। আজ বুঝি, এই ব্যাপারটা না ঘটলে আমার জীবনের গতি বেশকিছুটা পাল্টে যেতে পারত। বৈষয়িক স্থূলতার জগৎ আমাকে টেনে নিয়ে যেতে পারত। আগেই বলেছি একজন শিক্ষক হিসেবে জীবন কাটাব—ছেলেবেলাতেই আমি তা ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, পরিচিত বা শুভাকাঙ্ক্ষী সবার কাছে থেকেই ঐ নির্বোধ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার ব্যাপারে চাপ ছিল বিস্তর। এই শিক্ষকদের এই সময় চোখের সামনে না-দেখলে ঐসব মানুষদের প্রভাবে পড়ে যাওয়া হয়ত অসম্ভব ছিল না। একজন সত্যিকার শিক্ষক যে কত অসামান্য একটা ব্যাপার তা এঁদের দেখে বুঝেছিলাম। চোখের সামনে এই অবিশ্বাস্য মানুষদের দেখার ফলে শিক্ষক ছাড়া জীবনে অন্যকিছু হওয়ার সব পথ আমার সামনে থেকে প্রায় পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

তিনজন অসাধারণ ইংরেজির অধ্যাপককে পেয়েছিলাম কলেজে—পরেশ ব্যানার্জি, খুদা নেওয়াজ আর আব্বা। পরেশ ব্যানার্জির স্নিগ্ধ ভরাট কণ্ঠস্বর

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সেদিনের ক্লাসঘরগুলো ছাপিয়ে আমার ভেতর এখনো গমগম করে বাজে। মাঝারি উচ্চতা, দোহারা শরীর ও প্রৌঢ়ত্ব-মাখানো সুদর্শন চেহারার পরেশ ব্যানার্জির দাঁড়ানোর দৃপ্ত ভঙ্গিতে একটা সম্পন্ন রাজকীয়তা ছিল—তাঁর কথাগুলো হৃদয়কে আলোড়িত করে জীবনের অন্দরমহলের ভেতর অনুরণিত হত। কবিকে তিনি মনের সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ হিসেবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সেই অভিভূত বিশ্বাস থেকে আজো আমি পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারি নি। শেলির 'দি স্কাইলার্ক' কবিতাটা পড়িয়েছিলেন তিনি আমাদের। কী অসাধারণ আর বৈভবময় সেই পড়ানো! তাঁর পড়ানোর ভেতর দিয়ে কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৌন্দর্য আমাদের জীবনের গভীর জগৎকে আলোকিত করে দিয়েছিল।

আব্বার সঙ্গে পরেশ ব্যানার্জির একটা জায়গায় মিল ছিল। পরেশ ব্যানার্জি সারাবছর ধরে আমাদের মাত্র একটা কবিতা পড়িয়েছিলেন, আব্বা দু-বছর ধরে কোলরিজের 'এনস্যিয়েন্ট মেরিনার'-এর অর্ধেকের বেশি পড়াতে পারেন নি। কিন্তু কিছু না পড়িয়ে কতটা পড়ানো যায় তার উদাহরণ ছিল এই দুজনের ক্লাস। পাঠ্য বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠার বেশি পড়ান নি তাঁরা, হয়ত চানও নি। কিন্তু হৃদয়ের ভেতর যেন হাজার হাজার পৃষ্ঠা পড়িয়ে ফেলেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের ঐশ্বর্যের সমস্ত হীরা-জহরৎকে যেন উপুড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন আমাদের জীবনের ওপর।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এই দুই শিক্ষকের প্রভাবেই কিনা জানি না আমার নিজের শিক্ষকতার জীবনেও তড়িঘড়ি করে সিলেবাস শেষ করার ব্যাপারটাকে সবসময়ই অর্থহীন মনে হয়েছে। ব্যাপারটাকে মনে হয়েছে জ্ঞানের সঙ্গে বিরোধিতা, শিক্ষকতার বৈভবময় ও উচ্চতর দায়িত্ব থেকে পদস্খলন, বৈষয়িক দরকারের সংকীর্ণ রাস্তায় শিক্ষকের সম্মানকে নিগৃহীত করা। তাঁদের দেখে আমি জেনেছি শিক্ষকের জীবন-ঐশ্বর্য কীভাবে ছাত্রকে তার জীবনের উন্মুখ অনুসন্ধিৎসু ও প্রাথমিক দিনগুলোয় সারাজীবনের জন্যে তিলে তিলে রচনা করে তোলে। সত্যিকার শিক্ষক হতে গেলে এই বড় জিনিসগুলো ছাত্রকে দিতেই হয় তাঁর। ছাত্রদের জীবনকে আলোময় কিছু না দিয়ে দিনগত পাপক্ষয়ের মতো কেবলই রুটিনমাফিক সিলেবাস শেষ আর নোট মুখস্থ করিয়ে যাওয়াকে, এঁদের কাছে পড়ার পর, আমি আর কখনো শিক্ষকতা বলে ভাবতে পারি নি। পাঠ্যবইসর্বস্ব ঐ ব্যাপারটিকে আমার কাছে সবসময় মনে হয়েছে টিউটরের কাজ—কোচিং—নেহাতই একটা চাকরি—প্রাণহীন আলোহীন চাকরি। যে দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষক ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন তা থেকে এ অনেক দূরে।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

২

ইস্তিরি-করা শাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরনে, কাঁধে শাদা মার্জিত চাদর—ফরসা একহারা দীর্ঘ পরিচ্ছন্ন চেহারা—এই ছিলেন আমাদের কালিদাস মুখার্জি—সংক্ষেপে কে. এম.—আমাদের বাংলার অধ্যাপক, আমার কলেজ-জীবনের বিস্ময়কর শিক্ষকদের একজন।

ক্লাসে এসেই ঋজু ভঙ্গিতে প্রথমে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন তিনি কিছুক্ষণ। সম্ভবত ক্লাস পরিবর্তনের বিশৃঙ্খলতা থেকে সুস্থিরতায় ফিরে আসার জন্যে ছাত্রদের সময় দিতেন। এই সময়ের মধ্যেই পকেট থেকে বের করা ধবধবে শাদা একটা রুমাল দিয়ে মুখের ওপর আলতো হাতে চাপ দিতেন কয়েকবার। তারপর সুস্থির হাতে রুমালটাকে পকেটে রেখে উদ্যত হয়ে দাঁড়াতেন—যেন একটা অর্থপূর্ণ কর্তব্য সমাধানের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে এগিয়ে যাচ্ছেন।

এর পর শুরু হত তার কিন্নর-কণ্ঠের অনবদ্য বক্তৃতা। সুরেলা কণ্ঠে, ঝংকৃত গতিতে তাঁর সুন্দর কথাগুলো সচ্ছল স্রোতস্বিনীর মতো নেচে-নেচে প্রাণের আনন্দে এগিয়ে চলতে থাকত। তাঁর মনের উপচে-পড়া মাধুরীকণারা আমাদের অনুভবের ভেতর দিয়ে যেন এক অলীক মন্দাকিনীর দিকে চলে যেতে থাকত। তাঁর প্রতিটি শব্দের সৌন্দর্যকে আমরা জোছনামুগ্ধ সাপের মতো সম্মোহিত হয়ে শুনে যেতাম। তাঁর কথার অনির্বচনীয় বিস্ময় আমাদের শিউরে তুলতে থাকত। যখন ঘণ্টা বেজে যেত, তাঁর পড়ানো শেষ হয়ে আসত তখন দেখতাম তার পড়ানো কবিতাংশটা একটা পরিপূর্ণ স্বপ্নজগৎ হয়ে আমাদের চারপাশে জোছনা-রাতের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ছিল কালিদাস মুখার্জির। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন সুদূর ও রহস্যময়। সবার থেকে দূরে থাকতেন তিনি। তাঁর এই সুদূরতা তাঁর আকর্ষণকে আমাদের কাছে আরও দুর্বার করে তুলত। একটা অচেনা জগতের মানুষ মনে হত তাঁকে। যেন রক্তমাংসময় বাস্তব পৃথিবী অনেক দূরে কবিতার সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার অমলিন সোনালি আত্মা তিনি। তিনি যা পড়াতেন, তাকে জীবন্ত ছবির মতো আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতেন। সে ছবি এত সম্পন্ন, সজীব ও চিত্রময় যে সেখানে না-বোঝা বলে কোনোকিছু থাকে না। তাঁর পড়িয়ে যাবার সময় প্রশ্ন করা বা তর্কবিতর্ক তোলা অসম্ভব ছিল। সেই সুরের অবিরল জোছনাধারায় সম্মোহিতের মতো কেবলি অভিভূত ও স্নাত হতে থাকা ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে পারতাম না।

এ-ধরনের বিমূর্ত ও অতিন্দ্রিয় মানুষদের চেহারা লেখায় ফুটিয়ে তোলা কঠিন। সামনে দাঁড়িয়েও যাঁকে মনে হয়েছে সুদূর ও অচেনা,—আজ এতদূর থেকে তাকে স্পষ্ট রেখায় কী করেই বা আঁকব?

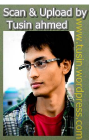

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৩

'মোষ দেখেছ? মোষ?'

আমার হতভম্ব উত্তর শোনার জন্যে দেরি না করেই উনি নিজের মতো বলে যেতে লাগলেন, 'দেখো, মোষের পিঠের ওপর অনেক সময় দু-একটা মাছি ঘাপটি মেরে বসে থাকে, মোষ তা তাকিয়েও দেখে না। হঠাৎ নিজে থেকে যেই সে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে অমনি ওরা যে যার মতো এপাশ-ওপাশ ছিটকে পড়ে যায়। আমি ওদের ঐসব মাছির মতো মনে করি।'

সমালোচকদের উদ্দেশে কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলা শেষ করে থামলেন কলেজের ইংরেজি বিভাগের আরেক অধ্যাপক খুদা নওয়াজ। অসামাজিক, বিপত্নীক, উদ্ভট ও নিঃসঙ্গ খুদা নওয়াজ স্যারকে নিয়ে শিক্ষক-ছাত্র মহলে নানারকম কথাবার্তা চালু ছিল। তাঁর খাপছাড়া অদ্ভুত ও রহস্যময় জীবনযাপনই এর জন্য দায়ী। লোকমুখে শুনতাম, খুদা নওয়াজ স্যারের আসল বাড়ি মুর্শিদাবাদে, ওখানেই কোনো একটা কলেজে অধ্যাপনা করতেন। স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর মানসিক আঘাত এড়াতে ছোটছেলেকে নিয়ে সেই-যে এই কলেজে এসে যোগ দিয়েছিলেন, তার পর অনেক বছর ধরে এখানেই রয়ে গেছেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

টিনের চালঅলা লম্বা সাইজের একটা হোস্টেল দালানকে দু-ভাগ করে দুটো বাড়ি বানানো হয়েছিল। বড় অংশটায় কলেজের অধ্যক্ষের বাস, আমরা ওটাতে থাকতাম। অন্য অংশে থাকতেন অধ্যাপক খুদা নওয়াজ—কলেজে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। তাঁর লম্বা ঘরটার আপদমস্তক ছিল রংবেরঙের নতুন-পুরোনো মোট মোটা বই দিয়ে ঠাসা। ঘরের দুই প্রান্তে তাঁর আর তাঁর ছেলের শাদামাঠা বিছানা, ঘরের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় তাঁর পড়ার চেয়ার আর টেবিল। খুদা নওয়াজ স্যার ছিলেন মাঝারি উচ্চতার মানুষ, বয়স বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ, গায়ের রং কালো, ক্ষিপ্র দোহারা শরীরে স্বাস্থ্যের ঝকঝকে বিচ্ছুরণ। স্যারের ছেলেটা আমাদের বয়েসী। দেখতে স্যারের ঠিক বিপরীত। কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ, লম্বাটে গড়ন, চোখদুটো সোনালি। ছেলেটাকে দেখে স্যারের প্রয়াত স্ত্রীর সৌন্দর্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

স্যারের গলার স্বর ছিল স্নেহমাখা, মুখ হাসিখুশি, ব্যবহার মধুর এবং অন্তরঙ্গ। তবু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। এমনিতেই এদেশে তাঁর কোনো আত্মীয়-বন্ধু ছিল না। তার ওপর কলেজের ছাত্র বা শিক্ষক কারো সঙ্গেই দরকারের বাইরে মিশতেন না তিনি। মানুষের পৃথিবীকে তিনি যেন একরকম প্রত্যাখ্যান করেই দিয়েছিলেন। ক্লাস শেষ করেই সোজা ফিরে আসতেন নিজের ঘরে, অধ্যাপকদের কক্ষেও বসতেন না। আচ্ছন্ন আত্মমগ্ন অবস্থায় ঘর-ভর্তি বইয়ের আনন্দময় নির্জন জগতে চলত তাঁর উদ্যত নিঃসঙ্গ অবিশ্রাম বেঁচে থাকা।

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

প্রতিবেশিতার কারণে তিনি আমাকে এড়াতে পারলেন না। সাহিত্যের প্রতি আমার নিষ্কৃতিহীন আগ্রহের কারণে আমরা উভয়ে উভয়ের কাছে ক্রমাগতভাবে অনিবার্য হয়ে উঠতে লাগলাম। অন্তরঙ্গভাবে তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন। জ্বলন্ত সাহিত্যাগ্রহ নিয়ে সময়ে-অসময়ে আমি তাঁর কাছে ছুটে যেতাম। নতুন কোনো বই শেষ করার উত্তপ্ত শিহরণ জানাতে তিনি নিজেও একেকসময় এসে দাঁড়াতেন আমাদের দরজায়, কড়া নাড়তেন।

অধ্যাপক খুদা নওয়াজের পড়ানোর ভঙ্গি ছিল অনবদ্য। শিক্ষক হিশেবে আর একটা প্রশংসনীয় গুণ ছিল তাঁর। অসংখ্য ইংরেজি কবিতা আর কবিতার লাইন তাঁর মুখস্থ ছিল। মাঝে মাঝেই সে-সব তিনি আবৃত্তি করে শোনাতেন। তাঁর আবৃত্তি ছিল সুন্দর, আশ্চর্য মোহ ছিল তাতে। কবিতাগুলো তাঁর কণ্ঠে গানের মতো শোনাত। শুনতে শুনতে আমার আপাদমস্তক রক্তধারা চঞ্চল হয়ে উঠত। সেই অপার্থিব পুলক আমি সহ্য করতে পারতাম না। আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করতাম 'কার লেখা স্যার? কোথায় আছে কবিতাটা? কোথায়?' আমি কোথায় পাব তারে? স্যার কবিতার নাম বলতেন না, যে-বইয়ে কবিতাটা আছে তার নাম কেবল বলে দিতেন। বলতেন, 'বইটা পড়তে থাকো, লাইনগুলো একসময় পেয়ে যাবে।' অনেক সময় বইয়ের নাম না বলে কেবল লেখকের নাম বলে শেষ করে দিতেন। তখন ঐ লেখকের ঐ লাইনগুলো খুঁজে বের করার জন্যে আমার কী আকুলি বাকুলি, কী অস্থিরতা! ঐ লেখকের রচনাবলির প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছুটে বেড়ানোর পাগলামি। তারপর একসময় যখন বইয়ের ভেতর সম্পন্ন হিরণ-রেখার মতো সেই জায়গাটা জ্বলে উঠত তখন কী স্বর্গীয় আনন্দের দ্যোতনা! কী অকথ্য উল্লাস শরীরের কণায় কণায়! পড়াশোনার জগতে ছাত্রদের আগ্রহকে বন্য ঘোড়ার মতো ছুটিয়ে তুলতে এই কৌশলটা অতুলনীয়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

যাকে ভালোবেসেছিলেন বলে মানুষকে ভালোবাসার যোগ্য মনে হয়েছিল সেই নারীকে হারিয়ে মানুষের পৃথিবীকেই বিদায় জানিয়ে ছিলেন অধ্যাপক খুদা নওয়াজ। নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ উঁচু শ্বাসরোধকারী ঘরের ভেতর শবেবরাতের প্রদীপের মতো জেগে থাকতেন তিনি। আর ঐ জীবনের মধ্যে বেঁচে থেকেই বইয়ের সুদূর অলীক জগতের ভেতর একসময় অবকাশ খুঁজে নিয়েছিলেন নিঃশব্দে।

একদিন শেলফ থেকে একটা বই টেনে বের করে আমার হাতে দিলেন।

'দেখ তো বইটা কার?'

'শেক্সপিয়রের।'

আরেকটা দিয়ে বললেন, 'এটা?'

'বেকনের।'

'এটা?'

'[illegible]'

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

Scan & Upload by Tusin ahmed

www.amrajaraboipori.wordpress.com

'এগুলো?'

প্লেটো, পুশকিন, জয়েস, হেগেল, ফ্রয়েড, পাবলভ, আইনেস্টাইন, এ্যারিস্টটল—একের পর এক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের গাদা-গাদা বই দেখিয়ে চললেন তিনি।

'বল কাদের সঙ্গে সারাক্ষণ আমার কথাবার্তা; কাদের সঙ্গে আমার প্রতি মুহূর্তের বসবাস? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সব মানুষের সঙ্গে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

উৎসাহে ঝলমল করে উঠলেন তিনি। 'তাহলে বল, কেন এইসব অপোগণ্ডদের সঙ্গে বসে বসে জীবনের অপচয় করতে যাব আমি? স্থূল অর্থহীন কথাবার্তায় সময় নষ্ট করতে যাব?' রবার্ট সাদীর 'দি স্কলার' কবিতাটা আবৃত্তি করতে করতে নিজেই নিজের বক্তব্যকে সমর্থন করে চলেন:

My days among the Dead are past
Around me I behold;
Where're these casual eyes are cast,
The mighty minds of old:
My never-failing friends are they;
With whom I converse day by day.

www.amrajaraboipori.wordpress.com

With them I take delight in weal
And seek relief in woe;
And while I understand and feel
How much to them I owe;
My cheeks have often been bedewed
With tears of thoughtful gratitude.

My thoughts are with the Dead; with them
I live in long-past years,
Their virtues love, their faults condemn,
Partake their hopes and fears,
And from their lessons seek and find
Instruction with an humble mind.

এই হচ্ছে আমার প্রথম জীবনের অন্যতম বন্ধু, গুরু, পথপ্রদর্শক অধ্যাপক খুদা নওয়াজ।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

মানুষ-বিবর্জিত, উঁচু, বৈভবময় এক পৃথিবীর নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ বাসিন্দা, অধ্যাপক খুদা নওয়াজের সঙ্গে ঐ কটা দিনের স্মৃতি এখনো অম্লান হয়ে আছে।

৪

শীতকাল। ডিসেম্বরের শেষ বা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ। দিন-দুই ধরে গোমরা আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের একটানা ছোটাছুটি চলছে। সেই সাথে ভুতুড়ে হাওয়ার তীক্ষ্ণ অস্ফুট হাস-ফাঁস। এরই মধ্যে কলেজের মাঠে ক্রিকেট খেলার যোগাড়যন্ত্রে নেমে গেছি আমরা পুঁচকে ছাত্র, আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অর্থনীতির অধ্যাপক নারায়ণ সমাদ্দার। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া পোশাক ভেদ করে সূঁচের মতো গায়ে এসে বিঁধছে। একেবারে খাঁটি ব্রিটিশ আবহাওয়াই বটে। ক্রিকেটের জন্যে আদর্শ।

স্ট্যাম্পগুলো পুঁতেতে পুঁততে স্যার বলে উঠলেন, 'এই সূঁচ-বেঁধানো ঠাণ্ডাকে ইংরেজিতে কী বলা যেতে পারে?' স্যারের চোখে কৌতুক নেচে বেড়াচ্ছে। হয়ত কোনো একটা ভালো শব্দ মনে এসে গেছে তাঁর। ক্লাস নাইনের ইংরেজি [illegible] উক্ত কবিতাটা আমাদের পড়তে হয়েছিল—নোটবইয়ের টীকাভাষ্য-সুদ্ধ, ঐ নোটবইয়েই ছিল শব্দদুটো। কাজেই উত্তর এসে গেল ঠোঁটের আগায়। বলে উঠলাম, 'চিলিং কোল্ড, স্যার।' নোটবই-এর শব্দদুটো কতখানি সঠিক জানতাম না কিন্তু বিস্ময়ে খুশিতে স্যার যেন নতুন মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলেন। স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে যেন মুখর হয়ে উঠলেন তিনি : 'ঠিক বলেছ, একেবারে ঠিক, চিলিং কোল্ড! হ্যাঁ, ঠিক! চিলিং... চিলিং ..... এই ঠাণ্ডার একজ্যাক্ট এক্সপ্রেশন।' যেন তাঁর ভাবনার চেয়েও সুন্দর হয়ে গেছে শব্দটা। চিলিং বলার সময় চ'-এর উচ্চারণ জিভ চেপে এমন তীক্ষ্ণ সুন্দরভাবে তিনি করছিলেন যে শীতের কনকনে সূচিতীক্ষ্ণতাটা যেন আমরা শারীরিকভাবে অনুভব করছিলাম।

আজকের ক্লিশে ব্যবহার করা সমাজের ছেলেমেয়েদের কাছে শব্দটা অপরিচিত নয়। কিন্তু তখনো শব্দটা আমাদের—বিশেষ করে মফস্বল কলেজের ছেলেমেয়েদের কাছে—বেশ অজানা। ইংরেজি শব্দদুটো আমার বানানো নয়, নোটবই থেকে মুখস্থ করা। স্যারের তা জানা থাকারও কথা নয়। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে স্যার এমন তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন যেন শব্দদুটো আমারই বিস্ময়কর প্রতিভার অলৌকিক উদ্ভাবন। আমার ভেতরটা গর্বে খুশিতে উপচে উঠল। প্রশংসা করার মতো সামান্য কিছু পেলেও স্যার এভাবে অকৃপণভাবে আমাদের প্রশংসা করতেন, সেই প্রশংসার খোরাক চলার জন্যে তাঁদের

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অনুপ্রাণিত করে তুলতেন। মনে আছে, এই ঘটনার পর ইংরেজি সাহিত্য পড়ার আগ্রহ আমার কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল।

সবচেয়ে ভালো কিনা বলতে পারব না, কিন্তু কলেজের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষকদের একজন ছিলেন তিনি। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন নারায়ণ সমাদ্দারের হৃদয়ের মতো তাঁর গায়ের রং-ও ছিল গোলাপি, দুধে-আলতা রং বলতে সেকালে যা বোঝাত তাই। ধুতির সঙ্গে খয়েরি লাল রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি পরতেন তিনি। স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ আর দীর্ঘ উন্নত দেহকান্তি নিয়ে যখন তিনি ক্লাসের মঞ্চে এসে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর ভেতর যেন দুর্লভ কিছু দেখতে পেতাম আমরা। শিক্ষকদের অন্যান্য যোগ্যতার মতো তাদের দৈহিক সৌন্দর্যও যে অনেক সময় ছাত্রদের জীবনের স্বপ্ন গড়ে ওঠার জন্যে কাজে আসে তাঁকে দেখার পর সেটা টের পেয়েছিলাম।

অসাধারণ পড়াতেন নারায়ণ সমাদ্দার। বক্তৃতা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ভেতরকার উৎসাহ যেন আচমকা উচ্ছ্বিত হয়ে উঠত। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সেই স্নিগ্ধ, হিংস্র খরস্রোত সেতারের ঝালাতে উঠে যেত যেন। তারপর অবিশ্রান্ত সেই ঝংকার-মুখর অশ্বক্ষুরধ্বনি সপ্ত-আকাশকে উচ্চকিত করে, উন্মত্ত প্রাণনায় কেবলি ছুটে বেড়াতে থাকত। কখনো সাহিত্যের, কখনো শিল্পের, কখনো আধুনিক রণকৌশলের বা ইতিহাসের ঘটনার লোকাতীত কাহিনীর রক্তিম বর্ণনা, কখনো বিজ্ঞানের সর্বশেষ চিন্তাধারা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের উদ্দীপ্ত বিরোধের গল্প—এমনি হাজারো জীবন্ত বিষয়ের ভেতর দিয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে স্বপ্নের শিখরে শিখরে ছুটে চলতেন তিনি। ঠিক এমনি যখন পরিস্থিতি, স্বপ্ন-মুখরতায় এমনি অসামান্য আর স্পন্দমান—সেই মুহূর্তে হঠাৎ করেই ক্লাস-শেষের ঘণ্টার নির্মম শব্দ আমরা শুনতে পেতাম। ক্ষুব্ধ হতাশার সঙ্গে আমাদের মনে হত অনিবর্চনীয়তার সেই স্বর্গ থেকে আমাদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার জন্যেই কেউ যেন সুপরিকল্পিতভাবে এই ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমাদের ভুল ভাঙত। সম্বিত ফিরে আসত আমাদের। মনে পড়ত এই পৃথিবীর বাগেরহাট নামের একটা ছোট্ট শহরের, তারও চেয়ে একটা ছোট্ট কলেজের একটা অন্ধকার ক্লাসঘরে আমরা এতক্ষণ ক্লাস করছিলাম। এবং জনৈক শিক্ষক এই ছোট বিষণ্ন ক্লাসঘরটিকে এতক্ষণ মহাবিশ্ব পরিক্রমণমুখর এক উল্লসিত আলোর ভুবন করে রেখেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুনীর চৌধুরী তখন শিক্ষক হিশেবে নাম করতে শুরু করেছেন। তাঁর পড়ানোর খ্যাতি দূর মফস্বলে বাস করেও আমাদের কানে পৌঁছে গেছে। কিন্তু নারায়ণ সমাদ্দারের এই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল পড়ানোর চেয়ে অসাধারণ আর কী পৃথিবীতে থাকতে পারে কিছুই সেদিন আমার পক্ষে ভেবে পাওয়া সম্ভব হত না। নারায়ণ সমাদ্দার বা কালিদাস মুখার্জি ছিলেন সেই অসম্ভব মাপের শিক্ষক, এতদিন পরেও যাদের অসামান্য পড়ানোর সমকক্ষ কিছু আমি কল্পনা করতে পারি না।

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কোনো কালে কোনো শিক্ষায়তনেই অসাধারণ শিক্ষকের সংখ্যা খুব একটা বেশি থাকে না, থাকার দরকারও হয় না। সমাজের আর সব অঙ্গনের মতো শিক্ষক-সমাজও সাধারণ গতানুগতিক মানুষ দিয়েই তৈরি। অল্প-সংখ্যক উজ্জ্বল শিক্ষকই এই অঙ্গনকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে রাখেন। আমার ধারণা কোনো শিক্ষায়তনে একশ জন শিক্ষকের মধ্যে যদি দশ-পনের জন উজ্জ্বল শিক্ষকও থাকেন, বাকিরা থাকেন চলনসই, তাহলেও আমরা তাকে একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষায়তনের সম্মান দিতে পারি। স্বল্প-সংখ্যক ও দীপান্বিত ঐ মানুষদের আলোয় শিক্ষায়তনের বিরস নিষ্প্রাণ আবহাওয়া ঝলমল করতে পারে।

আমাদের ১৯৫৫-৫৭ সালের বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে ঐ মাপের বেশকিছু উজ্জ্বল শিক্ষক আমরা পেয়েছিলাম।

৫

কত আটপৌরে শিক্ষকদের মধ্যেও কত বড় বড় মূল্যবোধ দেখেছিলাম সে সময়ে, সে-সব মূল্যবোধ আমাদের অজান্তে আমাদের জীবনের ধারাটাকে পাল্টে দিয়েছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কলেজের বাণিজ্য বিভাগে একজন অধ্যাপক ছিলেন। স্যারের নামটাও আজ মনে নেই। অনেক মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া নেহাতই একজন ভেদাভেদহীন মানুষ। তবু তাঁর মধ্যেও একদিন এমন একটা অসাধারণত্বের পরিচয় পেয়েছিলাম যা আমাকে অভিভূত করে দিয়েছিল।

একদিন ক্লাসে এসে স্যার পড়াতে শুরু করেছেন। হঠাৎ লক্ষ করলাম তাঁর মুখখানা যেন আগুনের আঁচ লাগা, সারা শরীর তিরতির করে কাঁপছে। বুঝলাম খুব জ্বর নিয়ে স্যার পড়াতে এসেছেন। কেবল আজ নয়, স্যারের ধাঁচটাই ছিল এমনি। ভালো থাকুন মন্দ থাকুন স্যার ক্লাসে আসতেনই। কলেজে না-আসা তার ব্যাকরণের বাইরে ছিল।

স্যারের অবস্থা অনেককে উদ্বিগ্ন করল। দুয়েকজন মুখ ফুটে উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করল। রোজকার মতো চৌকির ওপরে দাঁড়িয়ে পড়াচ্ছিলেন স্যার। কে একজন পেছন থেকে বলে বসল, স্যার আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। আজ নাহয় বসেই পড়ান।

স্যার কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেলেন। তারপর রুগ্‌ণ হেসে শান্ত গলায় বললেন, 'সেটা যে হয় না!'

না হওয়ার কী আছে! একজন রুগ্‌ণ মানুষ, দাঁড়িয়ে পড়াতে কষ্ট হচ্ছে, তিনি না-দাঁড়িয়ে চেয়ারে বসে পড়াবেন, এতে 'হয় না'র কী থাকতে পারে!

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল ছেলেটা। বলল, 'বসে পড়ালে তো অসুবিধা নেই স্যার !' কিন্তু স্যার অনড়। দাঁড়িয়ে পড়ানোর সপক্ষে স্যারের বক্তব্য শোনা গেল পরেই : 'একটু আগে আমি যখন ক্লাসে এসেছিলাম তখন তোমরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে শ্রদ্ধা দেখিয়েছিলে। এখন আমার ফেরত দেওয়ার পর্ব। এখন তোমরা বসে থাকবে আর আমি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদের দেওয়া সেই শ্রদ্ধাকে সম্মান দেখাব। '

না, ক্লাসে স্যারের সেদিন বসা হয় নি। কোনোদিন বসে পড়ান নি স্যার ক্লাসে।

স্যারের কথা শুনে বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। মানুষের প্রতি কী অসীম শ্রদ্ধাবোধ থাকলেই না এভাবে ভাবা যায় !

দেশের সুদূর ছোট্ট মফস্বল শহরের টিমটিমে বিমর্ষ ঐ কলেজ ছিল যে-কোনো ভালো মাপের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই সমকক্ষ। যে বলিষ্ঠ আদর্শবাদ, পিপাসা ও উৎসাহ তখন ঐ সাধারণ কলেজটির করিডোরে করিডোরে বহমান ছিল, সত্যিকার ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও তা আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী।

আমরা যখন ঐ কলেজে পড়ি তখন কলেজের মূল ভবনটা বেশ পুরোনো হয়ে এসেছিল। বহু বছর ধরে বাতাসের বিরতিহীন তাড়নায় দালানের প্লাস্টার ক্ষয়ে গিয়ে তা নানারকম জীবজন্তুর ছবি আর আঁকাবাঁকা উদ্ভট রেখায় ভরে উঠেছিল। পুরোনো টেবিল-বেঞ্চি-অধ্যুষিত দালানটার রঙচটা চেহারা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল একটা বিমর্ষতার রাজত্ব। আমাদের কাছে কিন্তু কলেজটাকে কখনো পুরোনো, গুমোট বা ভ্যাপসা মনে হত না। কোনো দৈন্য-দারিদ্র্যের চিহ্ন খুঁজে পেতাম না আমরা তার জরাজীর্ণ চেহারায়। সারা কলেজ জুড়ে আমরা দেখতে পেতাম শুধু আলো—অফুরন্ত খেলে-বেড়ানো উল্লসিত আলো। প্রতিটা ঘরে, কামরায়, ক্লাসকক্ষে, করিডোরে কেবল রাশি রাশি আলোর পায়রার উজ্জ্বল পাখা-ঝাপটানি। সে আলোর উপচানো জগৎ এমনই বিপুল আর অবারিত যে বাইরের আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীটাকেও এর পাশে আমাদের কাছে নিষ্প্রভ মনে হত। উল্টে আমরা যেন বাইরের সেই আলোকিত বিমর্ষতা থেকে বাঁচবার জন্যে কেবলই ঐ গুমোট অন্ধকার ঘরগুলোর দিকেই ছুটে যেতে চাইতাম।

বাগেরহাট কলেজের এই বৈভবের যুগ এরপর খুব বেশিদিন অব্যাহত থাকে নি। আমরা যখন দ্বাদশ শ্রেণীর শেষের দিকে ঠিক সেই সময়, কলেজের এইসব শিক্ষকদের প্রায় সবাই একজোট হয়ে, অল্প সময়ের ব্যবধানে, ভারতে চলে যান। সে-সময়কার উগ্র পাকিস্তানপন্থীদের রূঢ় ও অসম্মানজনক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও তৎপরতার মুখে নিরাপত্তাহীন ও আশাহত অবস্থায় চলে যেতে হয় তাঁদের। তাঁদের বিদায়ের পর থেকে আজ অব্দি সেখানে নিষ্ফলা শীতের বিস্তীর্যমান সাম্রাজ্য, পত্রহীনতার রুক্ষ কর্কশ পৃথিবী।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বাগেরহাট কলেজে আমার একজন নীরব পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁর প্রসঙ্গে দুয়েকটি কথা বলেই শেষ করব। বাগেরহাট কলেজটা সে-সময় ছিল একটা ছোট্ট ছিমছাম ছবির মতো। কলেজে ঢোকার পথে বিশাল শিরীষগাছটার নিচে বাংলোর ধাঁচে তৈরি কলেজের বড় আকারের ক্যাফেটিরিয়া—সেখান থেকে একটা লাল সুরকির রাস্তা কলেজের মূল ভবন আর সবুজ মাঠের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে বাঁ-দিকে বাঁক ঘুরে বিজ্ঞান-ভবনের দিকে হারিয়ে গেছে।

মূল ভবনটার সামনের দেয়ালের ধার ঘেঁষে সুদৃশ্য পামগাছের সারি। এর আঙিনার দরজা দিয়ে ঢুকলেই সিমেন্টের বেদির ওপর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে-থাকা ভাস্কর্যটা চোখের সামনে দেখা যায়। বিকেলের দিকে যখন কলেজ নির্জন হয়ে আসত—পামগাছ, রেস্তোরাঁ, পুকুর, রাস্তা সবকিছু নিয়ে ক্যাম্পাসটাকে একটা ছোট্ট সুন্দর রূপকথার মতো মনে হত, তখন নিঃশব্দে আমি প্রফুল্লচন্দ্রের সেই ভাস্কর্যের সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম। তারপর সেই মানুষটার দিকে—যিনি একদিন ছিলেন আজ নেই—একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তাঁর ভেতর থেকে জীবনের কোনো দুর্লভ শিক্ষা ও শ্রেয়োবোধকে নিজের ভেতর টেনে নিতে চাইতাম। আমি লক্ষ্য করতাম বিকেলের সেই স্তব্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভেতর আমার হৃদয় একটা দৃঢ় গভীর আত্মবিশ্বাসে সুস্থিত হয়ে উঠছে।

বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের অনেক শিক্ষকের কাছ থেকেই অনেক দুর্লভ প্রাপ্তি ঘটেছিল যা আমার জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এই নিঃশব্দ পথপ্রদর্শক তাঁর জীবনের কর্ম, সাধনা আর একাগ্রতার নিথর শীর্ষ থেকে আমাকে যে-নিঃশব্দ নির্দেশ উপহার দিয়েছিলেন তার সমান কিছু ঐ কলেজের আর কারো কাছ থেকে পেয়েছি বলে মনে হয় না।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

স্বাধীনতাযুদ্ধের ধর্মান্ধ দিনগুলোয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় কিছু দুষ্কৃতকারী ঐ ভাস্কর্যটা ভেঙে ফেলে। কিন্তু সেই বর্বরতাও তাঁকে ঐ কলেজের নিঃশব্দ নিয়ন্তার ভূমিকা থেকে সরিয়ে দিতে পারে নি। শুনেছি তাঁর একজন ভক্ত মূর্তিটার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মাথাটাকে স্বাধীনতাযুদ্ধের পুরো সময় ধরে একটা ধানক্ষেতের নিচে পুঁতে রেখে কোনোমতে রক্ষা করেছিল। স্বাধীনতার পর সে সেটাকে মাটির নিচ থেকে তুলে কলেজ কর্তৃপক্ষকে ফেরত দিলে অবার প্রফুল্লচন্দ্রের মূর্তিটাকে পুনর্নির্মাণ করা হয়।

* * *

এখানেই আমার কলেজ-পর্বের ইতি। ছেলেবেলায় স্কুল বা কলেজ যেখানেই পড়তে গেছি, সেখানেই এমনি বেশকিছু অসাধারণ শিক্ষকের দেখা পেয়েছি। এ থেকে ধারণা হয় আমাদের ছেলেবেলার শিক্ষায়তনগুলোয় শিক্ষকদের মান

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

গড়পড়তাভাবে ছিল যথেষ্ট উন্নত। এ-ধরনের শিক্ষকেরা তখন প্রায় সবখানেই ছিলেন। এমন কিছু মূল্যবোধকে সেই শিক্ষকরা ধারণ করতেন যা শ্রেয়জীবনের অনুকূল। আজকের স্কুল-কলেজগুলোতে এই মাপের শিক্ষক কমে এসেছে।

[আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের যাঁরা উজ্জ্বল শিক্ষক তাঁদের গল্প এই পর্বে বলাই হয়ত সঙ্গত হত। তবু তাঁদের কাহিনী আমি তুলে ধরেছি এই বইয়ের পরিশিষ্ট-পর্বে। কেন তা করেছি, তার ব্যাখ্যা সেখানে রয়েছে। আমার স্কুল-পর্বের কয়েকজন শিক্ষকের গল্পও এই বইয়ের পরিশিষ্টে সংযোজিত হল। কিছুক্ষণ আগে স্কুল-জীবনের যে-সব শিক্ষকের গল্প বলেছি, আমার জীবনের ওপর তাঁরা সুপ্রভাব ফেলেছিলেন। কিন্তু এই শিক্ষকদের প্রভাব আমার ওপর হয়েছিল ক্ষতিকর। তাই তাঁদের কথা ভিন্ন পর্বে পরিবেশন করলাম।]

www.amrajaraboipori.wordpress.com

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

Scan & Upload by Tusin ahmed

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমার শিক্ষক-জীবন

মুন্সীগঞ্জ কলেজ

১

আগেই বলেছি, আমি প্রথম অধ্যাপনায় যোগ দিই ১৯৬১ সালে, মুন্সীগঞ্জ কলেজে। মুন্সীগঞ্জ শহরের পুবদিকের বিস্তীর্ণ সবুজ প্রকৃতি-জগতের কোলের ভেতর দালানকোঠার একটা ছোট পরিপাটি বাগানের মতো ফুটে-থাকা এই মুন্সীগঞ্জ কলেজ। কলেজের দক্ষিণদিকটা প্রায় জনবসতিহীন। সেদিকে তাকালে শস্যভারনম্র অফুরন্ত আর সম্পন্ন একটা পৃথিবী চোখে পড়ে। মুন্সীগঞ্জ জেলার পুব পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া গোক্ষুর-কালো মেঘনার খরস্রোত এবং পশ্চিম পাশ দিয়ে নেমে আসা পদ্মার সমৃদ্ধ জলধারা পরস্পরের দিকে বাঁকা হয়ে চাঁদপুরের কাছে গিয়ে মিশেছে। কলেজের দক্ষিণদিকের আদিগন্ত মাঠের ওপর দিয়ে বয়ে আসা উত্তাল হাওয়ায় সেই বিপুল জলজ-জগতের খবর পাওয়া যায়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ ঝকঝক করত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য-পাস-করে-আসা মেধাবী, তরুণ আর চৌকশ অধ্যাপকে। কলেজে বর্ষীয়ান অধ্যাপক তখন প্রায় ছিলেনই না। শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে বয়স্ক ছিলেন মাত্র দুজন : অধ্যক্ষ আর উপাধ্যক্ষ, আব্বা আর অধ্যাপক হাসমত উল্লাহ। এঁদের বন্ধুত্বও ছিল প্রায় প্রবাদের মতো। সারাদিন এই দুই বর্ষীয়ান রসিক নিজেদের জগতের ভেতর দুই প্রাণোচ্ছল শিশুর মতো কী সব অবোধগম্য ব্যাপার নিয়ে যে অমন মশগুল হয়ে থাকতেন, আমাদের তা স্বাভাবিক বুদ্ধির বাইরে ছিল।

মুন্সীগঞ্জ ঢাকার কাছে। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব তুখোড় ছাত্র এম.এ. পাস করার পর বড় মাপের কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে সুবিধা হবে ভেবে ঢাকা বা ঢাকার কাছাকাছি কোথাও একটা চলনসই গোছের চাকরি নিয়ে নিরিবিলিতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চাইতেন, মুন্সীগঞ্জ কলেজের চাকরি তাঁদের জন্যে ছিল আদর্শ।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অধ্যাপনার চাকরি, কাজেই সারাদিনে বড়জোর দু–তিনটা ক্লাস, তা ছাড়া ছুটিও বিস্তর। এতে নিমগ্নভাবে পড়াশোনার সময় পাওয়া যায় অনেক। এ–ছাড়া মুন্সীগঞ্জ ঢাকার কাছে। যেতে বা আসতে সময় লাগে দু–ঘণ্টারও কম। কাজেই যে–কোনো দরকারে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ঢাকায় আসার বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় কাটিয়ে যাবার সুযোগ অনেক। তাই এই কলেজে চাকরির দিকে সবার দৃষ্টি ছিল লুব্ধ। এই কলেজে এঁরা কেউই বেশিদিন চাকরি করতেন না। পরীক্ষা দিয়ে ভালো চাকরি পেলেই চলে যেতেন।

মুন্সীগঞ্জ কলেজের ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য–পাস–করা মেধাবী ছাত্রদের এই দুর্বলতার খবর কলেজ–কর্তৃপক্ষের জানা ছিল, তাই তাঁরা এর পুরো সুযোগ নিতেন। তাঁরা এদের বেতন দিতেন অন্য কলেজের শিক্ষকদের চেয়ে অনেক কম। 'হয় এই বেতনে কাজ কর, নয় অন্য পথ দেখ। আমাদের লোকের অভাব নেই'—এই ছিল তাঁদের সাফ সাফ মনোভাব। নিরুপায় হয়ে এঁরা অল্প বেতনে এখানে কাজ করতে বাধ্য হতেন। এইসব স্বল্পস্থায়ীদের যে এভাবে কম বেতনে খাটিয়ে নেওয়া যাচ্ছে এ–নিয়ে কলেজ–কর্তৃপক্ষের মধ্যেও অদ্ভুত একটা আত্মপ্রসাদের ভাব ছিল।

এইসব তরুণ আর প্রদীপ্ত অধ্যাপকদের দেখে সেই সময় প্রায়ই আমার একটা কথা মনে হত। এ–প্রসঙ্গে সেই কথাটা একটু বলে নিই। বাগেরহাট কলেজের মতো এই কলেজের এই অধ্যাপকেরাও ছিলেন একইরকম সুযোগ্য ও মেধাবী। তবু বাগেরহাট কলেজে যে–সব অধ্যাপকের ভেতর দিয়ে জীবনের সর্বোচ্চ দীপ্তিকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাঁদের সঙ্গে মুন্সীগঞ্জ কলেজের এইসব ঝকঝকে তুখোড় অধ্যাপকদের একটা জায়গায় পার্থক্য ছিল। মুন্সীগঞ্জ কলেজের এই অধ্যাপকদের প্রায় সবাই অধ্যাপনাকে নিতেন নেহাতই সাময়িক প্রয়োজন মেটাতে। স্বভাবত মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত বলে এঁদের পড়ানোর ভঙ্গি ছিল চিত্তাকর্ষক। এঁদের অধ্যাপনা ছাত্রদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করত। তবু ছাত্রদের জীবনকে এঁরা সত্যিকার গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন না। মুন্সীগঞ্জ কলেজের ঐ তরুণ অধ্যাপকদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা পরবর্তীতে দেশের শীর্ষস্থানীয় আমলা বা অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের প্রায় কেউ–ই ছাত্রদের জীবনকে সদূরভাবে প্রভাবিত বা আলোড়িত করেছেন এমন কখনোই প্রায় আমি দেখি নি। এর কারণ একটাই। হৃদয়ের গভীরে এঁরা শিক্ষক ছিলেন না। এঁরা ছিলেন শিক্ষক–জগতের ভাড়াটে। তাঁদের ভেতর শিক্ষকতার বড় কোনো স্বপ্ন ছিল না—যা ছিল বাগেরহাট কলেজের ঐ–সব নিবেদিত শিক্ষকদের মধ্যে। তাঁদের মেধার সমস্ত দীপ্তি তখন একটা ঈপ্সিত চাকরির এবং জীবনের নিরাপত্তার করুণ কামনার ওপর কাঙালের মতো নুয়ে আছে। কাজেই একজন সুশিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্রেরা যা পায় ছাত্রদের তা দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমার আব্বা মুন্সীগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন উনিশ শো সাতান্ন সালে। আগেই বলেছি আব্বার মধ্যে শিক্ষকতার বেশকিছু চিরায়ত ও উন্নত মূল্যবোধ ছিল। অপরাজিত দৃঢ়তার সঙ্গে আব্বা এগুলোকে সমুন্নত করে রাখতে চেষ্টা করতেন। তাঁর এই তেজ এবং আপোষহীনতাকে আপাতভাবে উঁচুমাপের শিক্ষকের গুণ বলে মনে হলেও, আমার ধারণা, ভেতরে ভেতরে এর অনেকটাই ছিল আসলে সামন্তবাদী মনোভাবের পরিচয়বাহী। সেকালের প্রায় সব মানুষই ছিলেন কিছুটা ও-রকম। কেবল আদর্শের ব্যাপারে নয়, জীবনের প্রায় কোনো ক্ষেত্রে কোনোভাবেই তাঁরা নমনীয় হতে চাইতেন না। অপরিবর্তনীয়তাকে তাঁরা জীবনের সর্বোচ্চ মর্যাদার ব্যাপার বলে মনে করতেন। ঈপ্সিত আদর্শকে বাঁচানোর স্বার্থেও সামান্যতম আপোষ এমনকি দ্বিতীয় চিন্তাকেও আমল দিতেন না। জীবনের মুখোমুখি হতেন তাঁরা মধ্যযুগের ইউরোপীয় বীরপুরুষদের মতো। যাকে তাঁরা একবার সত্য বলে জানতেন, তাকে অবলীলায় তাঁরা চিরসত্যের আসনে বসিয়ে দিতেন; তাকে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে সত্যের উচ্চতর তল অন্বেষণ করাকে তাঁরা কেবল অবাঞ্ছিত নয়, অস্তিত্বের পরাজয় বলেই মনে করতেন। কৌশল, আপোষরফা বা আপেক্ষিকতা বলে তাঁদের কাছে কিছু ছিল না। মেয়ে বাপের বংশমর্যাদার তুলনায় সাধারণ ঘরের কোনো ছেলেকে ভালোবসেছে—এর শাস্তি হিশেবে মেয়ের জীবনকে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যেতে দিতেও তাঁরা অবিচল থাকতেন তবু সেই ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে অনুমোদন করতেন না। পরিবর্তনহীন, স্থির, অনড় একটা পৃথিবীর অবিচল অধিবাসী ছিলেন তাঁরা, নিজেদের তাঁরা ভাবতেন সেই আদর্শকে সমুন্নত রাখার অপরাজিত ও সংশপ্তক সৈনিক বলে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আব্বা মুন্সীগঞ্জ কলেজে যোগ দেবার বেশ কয়েক বছর আগেই শিক্ষায়তনটি প্রায় পুরোপুরি ক্ষয়ে গিয়েছিল। অধ্যাপকদের উপদলীয় কোন্দলে, অরাজকতায়, অব্যবস্থায় কলেজে শিক্ষার পরিবেশ বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। এই বিশৃঙ্খলতার ঘূর্ণিপাক থেকে কলেজকে বাঁচানোর জন্যেই কলেজ-কর্তৃপক্ষ খানিকটা অনুনয় করেই আব্বাকে ঐ কলেজে নিয়ে আসে। আব্বা যে-বছর ঐ কলেজে যোগ দেন তার আগের বছর ঐ কলেজের শিক্ষাগত অধঃপতনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটে। কলেজের বি.এ. পরীক্ষার্থীদের সবাই দল ধরে ফেল করে। ফলে পরীক্ষায় ফেলের হার দাঁড়ায় শতকরা একশো। আব্বা অধ্যক্ষ হয়ে আসার পর সিদ্ধান্ত নেন যে, যারা টেস্ট পরীক্ষায় সব বিষয়ে পাস করবে না, তাদের কাউকেই তিনি বি. এ. পরীক্ষার জন্য উত্তীর্ণ করবেন না। সেবার কলেজের বি. এ. টেস্ট পরীক্ষায় অংশ নেয় চুরাশি জন। এদের ভেতর সব পেপারে পাস করে মাত্র চার জন। আব্বা কেবল ঐ চারজনকে বি.এ. পরীক্ষার জন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাকি আশি জনকে ফেল করিয়ে দেন। ব্যাপারটা

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

নিয়ে ছাত্র এবং অভিভাবকদের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দেয়। কিন্তু আব্বাকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলও সরানো গেল না। আব্বা কলেজ ছাড়তে বা জীবন বাজি রাখতে রাজি কিন্তু আপোষে নারাজ। তাঁর সিদ্ধান্ত একটাই : গত বছর ফেলের হার হয়েছে শতকরা একশো, এবার পাসের হার হতে হবে শতকরা একশো। সব হুমকি-ধামকি ব্যর্থ দেখে হতাশ অভিভাবকেরা শেষ অব্দি আপোষ রফায় পৌঁছানোর উদ্দেশে আব্বার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কথাবার্তা হচ্ছিল আমাদের বাসার ড্রয়িংরুমে। আমি ছিলাম পাশের ঘরে। সেখান থেকে কোনো কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। একজন অভিভাবককে বলতে শোনা গেল :

'ইচ্ছে করলেই তো আপনি সবাইকে পাস করিয়ে দিতে পারেন।'

আব্বা উত্তর দিলেন, 'ইচ্ছে করলেই তো আমি তিনতলার উপর উঠে মাটিতে লাফ দিতে পারি। কিন্তু আমি তা করি না। নিজের জীবনের স্বার্থে ঐ লাফ দেওয়া যেমন আমার পক্ষে সম্ভব নয় তেমনি কলেজকে বাঁচানোর স্বার্থেও এদের সেন্টআপ করা সম্ভব নয়।

ফলে মাত্র চারজন ছাত্র বি. এ. পরীক্ষা দিল সেবার। আব্বা যা ভেবেছিলেন ফল হল তাই। পাস করল চারজনই। পাসের হারের দিক থেকে সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মুন্সীগঞ্জ কলেজের ফল হল সেরা—শতকরা একশো জন পাস।

আব্বার চরিত্রের গোঁয়ার্তুমি আর দৃঢ়তা ছিল এমনি। স্বাধীনতা-উত্তর-কালে ক্রমবর্ধমান স্বার্থলিপ্সা, অস্ত্র, সন্ত্রাস আর অরাজকতার মুখে এইসব দৃঢ়চেতা মানুষেরা, বিকাশের অনুকূল আবহাওয়া হারিয়ে, ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে শুরু করেন। আজ দেশের সবখান থেকে এঁরা প্রায় নিশ্চিহ্ন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

২

আগেই বলেছি আব্বা ছিলেন কঠোর নীতিবাদী। যে-কলেজের তিনি অধ্যক্ষ সেখানে নিজের আত্মীয়, বিশেষ করে নিজের ছেলের নিয়োগ দেওয়াকে তিনি একেবারেই নৈতিক মনে করেন নি। তাই ঐ কলেজে যেন কিছুতেই আমি ঢুকতে না পারি তার জন্য তিনি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই শেষপর্যন্ত কলেজে চাকরি পেলেও আমার মনটা এমনিতেই বিমর্ষতার ভেতর ডুবে ছিল। এর ওপর আর-একটা এমন দুঃখজনক ব্যাপার ঘটল যে মন একেবারে হতাশায় ভরে গেল। কলেজে যোগ দিয়েই দেখলাম আমার বিভাগ থেকে প্রতিটি ক্লাসে আমাকে পড়াতে দেওয়া হয়েছে একটিমাত্র বিষয়—ব্যাকরণ। আমার আজন্মকালের বিরক্তির বিষয়। আমার চোখে পানি এসে গেল। দিনগুলোয়

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সুযোগ পাব—তরুণ বয়সের স্বপ্ন আর ভালোবাসায় প্রাণ উজাড় করে সাহিত্যের সৌন্দর্যলোক ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ পাব। কিন্তু রুটিন দেখে সব আশার ওপর ছাই পড়ে গেল। কোথায় ছাত্রদের নিয়ে সৌন্দর্য আর প্রেমের শীর্ষে শীর্ষে ঘুরে বেড়াব, তার জায়গায় এই নিস্পৃহ কঠিন ব্যাকরণ। কেবলি মনে হতে লাগল এই বিশাল কলেজটার ক্লাসে ক্লাসে বছরের পর বছর ব্যাকরণের মতো রসকসহীন বিষয় পড়াতে পড়াতে আমি নিজেই হয়ত একদিন একটা শুকনো ক্লিষ্ট আর আতঙ্ককর জীবে পরিণত হয়ে যাব। এক সময় ছাত্রদের কাছে হয়ত আমার নামই হয়ে যাবে 'ব্যাকরণ'। পরিস্থিতি এ-ভাবে ভয়াবহ হতে হতে এমন একটা সময় হয়ত আসবে যখন আমাকে দেখলেই তারা প্রাণ নিয়ে দূরে পালিয়ে যেতে চাইবে। আর ব্যাকরণের একটা শুকনো হিসহিসে প্রেতাত্মা হয়ে একা একা এই কলেজের করিডোরে করিডোরে ঘুরে আমার জীবন একদিন নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

কিন্তু ব্যাকরণ পড়াতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে এক আশ্চর্য আনন্দ-জগতের খবর পেয়ে গেলাম। শতাব্দী শতাব্দী ধরে হাজার কোটি মানুষের সজীব চিত্তের দীপ্তি আর আলো দিয়ে তৈরি আমাদের যে-ভাষা, ব্যাকরণ তো সেই ভাষারই বর্ণনা। জীবনের প্রতিমুহূর্তের আবেগ, প্রেম, যন্ত্রণা, বিস্ময়, উৎসাহ আর খুশিতে প্রাণ পেয়ে জনমানুষের মুখে-মুখে রচিত উচ্চারিত বিচ্ছুরিত আমাদের অনিন্দ্যসুন্দর যে-ভাষা, হীরের টুকরোর মতো দীপ্র অজস্র শব্দের প্রতিমুহূর্তের উৎপ্রাণতায় যা উজ্জ্বল আর নৃত্যশীল, ব্যাকরণ তো সেই বৈভবেরই সজীব বিবরণ। ভাষার প্রাণোজ্জ্বলতার এই দীপ্র রহস্য যতই আমি অনুভব করতে লাগলাম তা ততই আমাকে হতবাক করতে লাগল। আমার হৃদয়ের সেই জেগে-ওঠা বিস্ময় আমার জীবনের প্রথম ছাত্রছাত্রীদের চোখের সামনে মেলে ধরার আনন্দেই আমার মুন্সীগঞ্জ কলেজের দিনগুলো একধরনের অলীক খুশির ভেতর দিয়ে পার হয়ে গেছে, সাহিত্যের সৌন্দর্যে ছাত্রদের হৃদয়কে প্রাণিত করতে না-পারার দুঃখ নিয়ে খুব বেশি হা-হুতাশ করতে হয় নি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সিলেট মহিলা কলেজ

১

আমার মুন্সীগঞ্জ কলেজের চাকরি ছিল খণ্ডকালীন। কাজেই কিছুদিনের মধ্যেই বাসার ভাইবোনের কাছে তা পূর্ণকালীন চাকরি জোগাড় করতে না-পারার প্রতীক হয়ে উঠতে লাগল। ফলে উপায়হীন হয়ে 'সম্মানজনক' চাকরির খোঁজে নামতে হল। এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়-উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মতো আমাদের অবস্থা

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অনিশ্চয়তায় আর ভবিষ্যৎহীনতায় এমন করুণ ছিল না। কোনো কলেজের সামনে গিয়ে দিনকয় ঘোরাঘুরি করলে একজন এম.এ. পাস তরুণ বা তরুণীর কিছু–না–কিছু একটা জুটেই যেত। আমার চাকরি জুটতেও দেরি হল না।

ঢাকায় এসেছিলাম দিনকয়েকের জন্যে। হঠাৎ আমার বন্ধু আতাউল (এখন বাংলাদেশের শীর্ষ সচিব) দেখা হতেই বলে উঠল :

'চাকরি করবে?'

'কোথায়?'

'আছে। সিলেট মহিলা কলেজে।'

'বল কী? মহিলা কলেজ!'

এক–মুহূর্তে আমার তরুণ চোখের সামনে একঝাঁক সুনীল প্রজাপতির ওড়াওড়ি অনুভব করলাম।

'ওখানে আছে জানলে কী করে?'

'আপা চাকরি করতেন। ছেড়ে দিচ্ছেন। তাড়াতাড়ি গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পার।'

দেরি করলাম না। রাতের ট্রেনে সিলেটে রওনা হয়ে গেলাম। গিয়ে দেখলাম সেখানে চাকরি পাবার ব্যাপারে আমার একটা দুরপনেয় অযোগ্যতা আছে। একে সিলেট তখন কঠোরভাবে রক্ষণশীল, তার ওপর কলেজটা 'মহিলা কলেজ', অথচ আমি 'অমহিলা'। চাকরি প্রায় অসম্ভব। কিন্তু মুন্সীগঞ্জ কলেজের মতো এ–কলেজে ঢোকার ব্যাপারেও আমার ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। ইন্টারভিউর সময় আমার চেহারার নানান ভালোমন্দ খতিয়ে দেখে কলেজের অধ্যক্ষা এবং বর্ষীয়সী অধ্যাপিকারা, ছাত্রীদের জন্যে আমাকে খুব একটা বিপজ্জনক মনে না হওয়ায়, সদয় হয়ে আমাকে নেবার অনুকূলে মত দিলেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কলেজের নাম মহিলা কলেজ হলেও সেখানে মহিলারা পড়ে না, পড়ে তরুণীরা। কাজেই ঐ সৌভাগ্যের কারণে একজন নব্য–অধ্যাপকের বিষণ্নতা–রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা নয়। সিলেটের মেয়েদের সৌন্দর্যের খ্যাতি সে–কালে ছিল সারা বাংলাদেশ–জোড়া। আমাদের কলেজেও তার অনেক চলমান উদাহরণ ছিল। মেয়েদের ব্যাপারে পিতৃস্নেহ জাগার বয়স সেটা নয়। কাজেই সবকিছু মিলিয়ে তরুণ অধ্যাপকের সময়টা খুব নৈরাশ্যপূর্ণ ছিল এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না।

কিন্তু সিলেটে ট্রেন থেকে নেমে প্রথমেই যা নিয়ে অসুবিধায় পড়তে হল তা হল সিলেটের ভাষা। বুঝলাম চারশো বছর আগেও শ্রীচৈতন্য এখানকার ভাষা নিয়ে কেন অমন অপার্থিব আনন্দে(?) উদ্বাহু হয়েছিলেন, আর মুজতবা আলী মৌলভীবাজার থেকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা শুরু করতেই কেন রবীন্দ্রনাথ বলে উঠেছিলেন—'কথায় যেন কমলালেবুর গন্ধ পাচ্ছি রে'।

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

প্রথমে অসুবিধায় পড়লাম সিলেটের 'ক'-এর উচ্চারণ নিয়ে। সিলেটে 'ক'-এর উচ্চারণ নেই, এখানে 'ক'-এর উচ্চারণ ফারসি 'খে'-এর মতো। এ নিয়ে অভিনেতা হুমায়ুন ফরিদীর কাছ থেকে একটা জোক শুনেছিলাম কিছুদিন আগে। সেটা এরকম : 'এ-কটা কাক 'কা' 'কা' করতে করতে ঢাকা থেকে সিলেটের দিকে রওনা হয়েছে। অর্ধেক পথ পার হতেই সে বলতে শুরু করল 'খা' 'খা'। এই 'ক' 'খ'-এর গোলকধাঁধা থেকে বেরোতে পারলেও যাউক্কা-খাউক্কা, ইতা-খিতার মতো ঐ-ভাষার আরো যত অসংখ্য অপরিচিত ব্যাপার বেরোতে লাগল তার পুরো ফিরিস্তি দিতে চাই না। পাঠকেরা এ-ব্যাপারে অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার ওপর লেখা বই পড়ে নিলেই সব জানতে পারবেন।

রাস্তাঘাট বা হাটে-বাজারে মানুষজনের মুখে এইসব উচ্চারণ দুয়েকদিনের মধ্যে সয়ে এলেও গভীর হতাশায় মুষড়ে পড়তে হল যখন দেখা গেল কলেজের ঐ-সব প্রিয়দর্শিনী তরুণীদের উচ্চারণও হুবহু একই রকম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তা-ও সয়ে এল। হয়ত একটু তাড়াতাড়িই এল। এতগুলো সুশ্রী মেয়ে যে-ভাষায় কথা বলে চারপাশকে অনুক্ষণ কলকণ্ঠ-মুখরিত করে রেখেছে তা বেশিদিন না-বুঝতে পারা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। কেবল সয়ে নয়, অদ্ভুতভাবে টের পেলাম একসময় ঐ ভাষাটা আমার কাছে মধুর লাগতে শুরু করছে। বড় বড় ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা বলেছেন, কোনো ভাষা যদি তাড়াতাড়ি আর ঠিকমতো শিখতে চাও তো চটপট ঐ ভাষার কোনো মেয়ের প্রেমে পড়। আমার ব্যাপারে কী হয়েছিল বলতে পারব না, তবে কলেজের মেয়েদের সিলেটি সৌন্দর্য যে ঐ ভাষাকে আমার কানে মধুর করে তোলার ব্যাপারে অনুকূল হয়েছিল, তা খানিকটা লাজরক্তিম না হয়েও বলতে পারি। আমাদের ঐ নারীবিবর্জিত যুগে একজন নব্যযুবকের পক্ষে মেয়েদের কলেজে অধ্যাপনা করার ব্যাপারটা অন্যদের কাছে কী যে অসম্ভব ঈর্ষণীয়, তা যিনি তা করেন নি, তাঁকে বোঝানো কঠিন। আশেপাশের যুবকদের চোখে সেই বিষণ্ণ ঈর্ষার দৃষ্টি উপভোগ করে মজা পেতে লাগলাম। সেইসঙ্গে কেবল সিলেটি ভাষা নয়, সিলেট জায়গাটাকেই আমার ভালো লেগে যেতে শুরু করল। সিলেটের মহিলা কলেজে অধ্যাপনা না করেও রবীন্দ্রনাথ সিলেটের নাম দিয়েছিলেন শ্রী-ভূমি, আর আমি তো সেই সৌভাগ্যের যন্ত্রণাবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ। চা-বাগান, ঝরনা আর পাহাড়-ঘেরা সিলেট আমার কাছে হয়ে উঠল স্বর্গের শ্রীভূমি। সিলেটি ভাষা হয়ে উঠল পৃথিবীর মধুরতম ভাষা।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পৃথিবীর কোনো স্বর্গই বেশিদিন স্থায়ী হয় না। আমার সিলেটি নিয়তিও হল না। কলেজে যোগ দেবার পর মাস-দুয়েক কলেজ খোলা ছিল। এর পর হঠাৎ করেই বাষট্টির বিখ্যাত ছাত্র-আন্দোলনের মুখে তা বন্ধ হয়ে গেল। মাসখানেক

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পর যখন কলেজ খুলল তার আগেই রাজশাহী সরকারি কলেজে যোগ দেবার নিয়োগপত্র আমার কাছে পৌঁছে গেছে। সিলেট মহিলা কলেজের দিনগুলোর স্বল্পস্থায়ী মিষ্টি স্বপ্ন, কলেজ থেকে জাফলঙের পিকনিকে যাবার স্মৃতি, ছাত্রীদের দেওয়া 'অপু' নাম, আর তরুণ বয়সের বিষণ্ন হৃদয় পেছনে ফেলে রাজশাহীর ট্রেনে চেপে বসলাম।

২

সিলেটের একটা ব্যাপার আমার খুব ভালো লেগেছিল। তা হল সেখানকার অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ। কি-হিন্দু কি-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই সেখানে ছিল কঠোররকমে ধার্মিক ও রক্ষণশীল, কিন্তু তারা সাম্প্রদায়িক ছিল না। এই জায়গায় বাংলাদেশের আর সব জেলা থেকে সিলেট ছিল আলাদা। এর কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। সারা বাংলাদেশের সব জায়গায় জমিদারেরা ছিল অধিকাংশই হিন্দু, প্রজারা ছিল মুসলমান। এতে জমিদারদের শ্রেণীগত অত্যাচারকে মুসলমান প্রজারা ধর্মীয় নিষ্পেষণ বলে ধরে নিত। সহজেই তা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের দিকে মোড় নিয়ে নিত। কিন্তু সিলেট ছিল এ থেকে স্বতন্ত্র। সেখানে যেমন ছিল হিন্দু জমিদার, তেমনি ছিল মুসলমান জমিদার। বাংলার আর সব জায়গায় জমিদারদের মতো এই দুই সম্প্রদায়ের জমিদাররাও ছিল একই রকম অত্যাচারী। এই অত্যাচারের সামনে হিন্দু প্রজার সঙ্গে মুসলমান প্রজার পার্থক্য ছিল না। জমিদারদের অত্যাচারের এই অভিন্ন চেহারাটা সাধারণ প্রজাদের চোখে ধরা পড়ত। তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল যে এই অত্যাচার ধর্মগত নয়, শ্রেণীগত। তাই জমিদারের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জন্ম নিত খুব অল্প। তাছাড়া শ্রেণীস্বার্থে হিন্দু জমিদার ও মুসলমান জমিদারেরা ছিল বন্ধু। প্রজাদের ভেতর সাম্প্রদায়িকতা উসকে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ তারা বিপন্ন করতে চাইত না। জমিদারদের ভেতরকার এই স্বার্থঘটিত বন্ধুত্ব প্রজাদের মধ্যেও সম্প্রসারিত ছিল। প্রজারা দেখত বন্ধুত্ব রাজায় প্রজায় হয় না, হয় রাজায় রাজায়, নয়ত প্রজায় প্রজায়। এই কারণে রাজাদের বন্ধুত্বের ছত্রচ্ছায়ায় নিজেদের ভেতর বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে তাদের খুব একটা আপত্তি হত না।

এ-কথা ঠিক যে, সিলেট মহিলা কলেজে আমার মাস-কয়েকের অবস্থান আমার তরুণ চোখে স্বপ্নমেদুরতার একটা মিষ্টি ছোঁয়া বুলিয়ে দিয়েছিল। তবু ঐ অল্প সময়ের মধ্যে এ-কথাও একই সঙ্গে টের পেয়েছিলাম যে নিখাদ মেয়েদের কলেজগুলো আসলে ঠিক ভালো কলেজ নয়। ঐ কলেজে যোগ দেবার

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

প্রথমদিনের একটা ঘটনা থেকে কথাটা আমার মনে আসে। আমার শৈশব কেটেছে মফস্বলে, নারী-বিবর্জিত এক সুকঠোর পৃথিবীতে। মেয়েদের সঙ্গে সহজ বা অন্তরঙ্গ পরিচয়ের অবকাশ না-থাকায় সেই কঠিন নারী-বিচ্ছিন্ন জগতে মেয়েমাত্রেই আমাদের চোখে হয়ে উঠেছিল 'দেবী'। মহিলা কলেজে অধ্যাপনার প্রথম দিন কলেজে এই দেবীদের একটা ভিন্নরকম চেহারা চোখে পড়ল। কলেজের গেট দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছি হঠাৎ গেটের পাশে এমন এক অপ্রীতিকর দৃশ্য দেখতে পেলাম যা নারী সম্পর্কে আমার আশৈশবের সেই স্বপ্নকে প্রায় গুঁড়িয়ে দিল। গেট পেরিয়ে বাঁ-পাশে তাকাতেই দেখলাম আমার আবাল্য স্বপ্নের অমনি দুই 'দেবী', বেশ কিছুক্ষণ হাতাহাতি চুলোচুলির শেষে, হয়ত ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে, দুজন দুজনের চুল আঁকড়ে পরস্পরের ওপর ঝুলে রয়েছে আর বেশকিছু ঘিরে-থাকা মেয়ে কুরুচিপূর্ণ করতালিতে তাদের ঐ কুৎসিত মারামারিকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে। আমার মনে হয় আমার সারাজীবনে দেখা সবচেয়ে জঘন্য দৃশ্যের এটি একটি। হয়ত কেবলমাত্র মেয়েদের কলেজ বলেই সেদিন ওখানে এমন একটা বিশ্রী দৃশ্য দেখতে হয়েছিল। যে-কলেজে কো-এডুকেশন বা সহশিক্ষা আছে, ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়াশোনা করে সেখানে হয়ত এমন একটা অপ্রীতিকর দৃশ্য কিছুতেই দেখতে হত না।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সিলেট মহিলা কলেজ থেকে আমি গিয়েছিলাম রাজশাহী কলেজে। সেটা ছিল কো-এডুকেশন কলেজ। সেখানে তো এমন দৃশ্য কখনো দেখি নি। বরং দেখেছি এর উল্টো ব্যাপার। ছেলেরা আর মেয়েরা পরস্পরের সামনে নিজেদের সবচেয়ে সুন্দর আর মর্যাদাসম্পন্ন করে উপস্থিত করার চেষ্টা করছে। নিজেদের ঐশ্বর্যের শ্রেষ্ঠ মাধুরীটুকু অন্যদের সামনে তুলে ধরে অন্যদের হৃদয়ে নিজেদের স্থান করে নিতে চেষ্টা করেছে। এই কলেজটায় ছেলে-মেয়ে দু-দলকেই সুন্দর লাগত। আমি নিজে যখন কলেজের ছাত্র তখন আমাদের ক্লাসে বেশকিছু মেয়ে পড়ত। তাদের মধ্যে দু-তিনজন ছিল বেশ সুন্দরী। কলেজের সাহিত্য প্রতিযোগিতায়, ডিবেটে তারা নিয়মিত শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকত। তাদের সঙ্গে কথা বলার, পরিচিত হবার বা বন্ধুত্বের কোনো সুদূর সম্ভাবনাও আমাদের ছিল না। তবু বড় বড় চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে চেয়ে-থাকা ঐ সুন্দরী সহপাঠিনীদের মনে একটুখানি জায়গা পাবার জন্যে আবৃত্তিতে বিতর্কে উপস্থিত-বক্তৃতায় অংশ নিয়ে আমরা কলেজে খ্যাতিমান হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি। শুধুমাত্র একটি বিশেষ মেয়ের চোখে প্রশংসাযোগ্য হয়ে ওঠার অসহায় চেষ্টায় কত ছাত্রই না দিনরাত অমানুষিক পড়াশোনা করে পরীক্ষায় উজ্জ্বল সাফল্য পাওয়ার চেষ্টা করে অহরহ! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতাটিও কি শেষপর্যন্ত কোনো তুচ্ছ অর্থহীন নারীর হৃদয়ে একটুখানি স্থান পাবার আশায় লেখা নয়? সহশিক্ষা এ-জন্যেই এতখানি কাম্য ও জরুরি যে তা ছাত্র এবং ছাত্রীদের অন্তর্গত শক্তি ও ব্যক্তিত্বের সুন্দরতম

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

জিনিশগুলোকে সহজ, অন্তরঙ্গ ও মনোরমতমভাবে বিকশিত হয়ে ওঠার অনাবিল পরিবেশ উপহার দেয়। যে-কলেজ ঢালাওভাবে কেবল ছাত্রদের বা ছাত্রীদের সে-কলেজের ছেলেমেয়েদের সামনে এই চ্যালেঞ্জ ও অনুপ্রেরণা থাকে কম। মেয়েদেরকে ছেলেদের লিপ্সা থেকে বাঁচাতে বা তাদের চরিত্র রক্ষা ও নিরাপত্তার কথা ভেবে যাঁরা আজও সারাদেশে মেয়েদের আর ছেলেদের জন্যে আলাদা বিদ্যায়াতনের কুৎসিত খাঁচা তৈরির ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন তাঁরা হয়ত বুঝতেও পারেন না যে এইসব কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের এই অস্বাভাবিক অসুস্থ ও অবদমনমূলক ব্যবস্থার শিকারে পরিণত করে তাদের কতখানি মানসিক বৈকল্যের ভেতর তাঁরা নিক্ষেপ করছেন ; নারী ও পুরুষকে পরস্পরের কাছে অপরিচিত সন্দেহজনক ও ভীতিপ্রদ করে তুলে একটা অকর্ষিত সৌন্দর্যহীন ও কদর্য জীবনের বাসিন্দা করে তুলছেন। কারো এসব কলেজে সুন্দর হবার দরকার নেই। তাই ছেলে-মেয়ে কেউ সেখানে সুন্দর নয়। ছাত্রী-অধ্যুষিত সিলেট মহিলা কলেজে মাস-কয়েকের জন্যে এবং কেবলমাত্র ছাত্রদের কলেজ ঢাকার বিজ্ঞান কলেজ ও ঢাকা কলেজে তিরিশ বছর শিক্ষকতার সময় ছাত্র ও ছাত্রীদের এই অকর্ষিত ও কদর্য চেহারা আমি দেখেছি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

রাজশাহী কলেজ

১

রাজশাহী কলেজে আমি যখন যোগ দিই তার পনের বছর আগেই এদেশ থেকে ব্রিটিশ আমল বিদায় নিয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের ধুলো আর ঘোড়ার গাড়ি ধূসরিত এই ছোট্ট বিভাগীয় শহরটির সরকারি কলেজের ভেতর দুই শতাব্দীবাহী ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খলা এবং মূল্যবোধ তখনো প্রায় অপ্রতিহতভাবেই বিরাজ করছে। কেবল কলেজের নয়, শহরের চেহারাটাও ব্রিটিশ আমলের অবসানের পর খুব একটা বদলেছে বলে মনে হয় না। শহরের মূল রাস্তাটা ছাড়া (যেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক থেকে এগিয়ে এসে শহর পেরিয়ে কলেজের সামনে দিয়ে কোর্টের দিকে চলে গেছে) শহরের প্রায় অধিকাংশ রাস্তা ছিল ইঁট বিছানো—সেগুলো যেমন খোয়া-ওঠা তেমনি ঘোড়ার বিষ্ঠা, ধূলা আর আবর্জনায় নারকীয়। রাজশাহীর পাশেই মাইলের পর মাইল জুড়ে পদ্মার বিস্তীর্ণ চরের একটানা রাজত্ব। সেখান থেকে উড়ে আসা ধুলোয় রাজশাহী শহর প্রায় সারাবছর আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। গরমের দিনে শরীর ঘামে জ্যাবজেবে হয়ে উঠলে সেই ধুলো শরীরে সেঁটে যায়।

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

এমনি এক পটভূমিকায় স্থাপিত রাজশাহী কলেজের শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশ, তাতে ঘড়ির কাঁটার সাথে ছবির মতো ক্লাসের পর ক্লাস বয়ে চলেছে। সারাটা কলেজ জুড়ে নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষার একটা সুশৃঙ্খল পরিবেশ। এ-যুগের সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মতো ক্লাসের ঠিক আগখানটায় বা ক্লাস বসে যাবার পর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ক্লাস নিয়েই আবার বাড়ির পথ ধরার কোনো উপায় নেই সেখানে। অন্য দশটা সরকারি অফিসের কর্মকর্তাদের মতো কলেজের অধ্যাপক প্রভাষকদের কলেজে আসতে হত সকাল দশটায়—যেতে হত ঘড়ি ধরে বিকেল পাঁচটায়—এরই মধ্যে ক্লাস নেওয়া, লাইব্রেরিতে পড়াশোনা, নানান সাময়িক পরীক্ষা আর টিউটেরিয়ালের পাট চুকোনো, খাতা দেখা আর অবসর সময়ে স্টাফরুমে প্রাণখোলা আড্ডা আর চায়ের সঙ্গে গরম শিঙাড়া আর সমুচার উষ্ণ উত্তাপ উপভোগ করা। অধ্যাপনার যাবতীয় কাজকর্ম সব কলেজের ভেতর। নানান ব্যস্ততা আর আনন্দের ভেতর দিয়ে কেটে যাওয়া এক-একটা চমৎকার কাজের দিন।

মাসদেড়েক হোটেলে আর মেসে কাটিয়ে শেষমেশ কলেজের ভেতর ছোট্ট ছিমছাম ফুলার হোস্টেলে জায়গা পেলাম। আবাসিক বাড়ি হিসেবে ফুলার হোস্টেলের পত্তন কতদিন আগে হয়েছিল, কোন ধরনের ছাত্রেরা সেই হোস্টেলে থাকত, বলতে পারব না। আমি যখন ফুলার হোস্টেলে ঠাঁই পেলাম তার অনেক আগেই ফুলার হোস্টেল আবাসিক চরিত্র হারিয়ে মূল কলেজ বিল্ডিঙের অংশ হয়ে গেছে। ফুলার হোস্টেলের দোতলা দালানের সামনের দিকের ছোট ছোট কামরাগুলো তখন অনার্স ক্লাসের কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তারই পেছন দিকে কয়েকটা ছোট ঘরে আমাদের মতো নিঃসঙ্গ ও অবিবাহিত গুটিকয় চালচুলোহীন শিক্ষকের থাকার ব্যবস্থা। সে-সময় একজন তরুণ প্রভাষক সদ্য সরকারি কলেজে যোগ দিয়ে মাসান্তে বেতন পেত আড়াইশো টাকা, সেইসঙ্গে মহার্ঘ ভাতা হিসেবে বাড়তি তিরিশ টাকা—সাকুল্যে দুইশো আশি টাকা। এদের মধ্যে বিবাহিতদের ভাগ্যটা অবিবাহিতদের তুলনায় আরো একটু দড়। বিবাহ ভাতা হিসেবে তারা পেত আঠারো টাকা বেশি। বেতনের দিনে আমাদের সামনে দিয়েই ট্রেজারি থেকে আসা আঠারো টাকার নতুন করকরে নোটগুলো পকেটে পুরে বাড়ির দিকে রওনা দিত তারা। ঐ আঠারোটি টাকা আমাদের অবিবাহিত জীবনের করুণ যন্ত্রণাকে অসহনীয় করে তুলত।

ফুলার হোস্টেলে পৌঁছোনোর মুখে, হোস্টেল থেকে মিটার তিরিশেক দূরে কলেজের মাঝখানটাকে গাঢ় ছায়ায় ঢেকে একটা সুবিশাল শিরীষ গাছ দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো দাঁড়িয়ে। গাছটার বেশকিছু বড় ডাল নিচের দিকে পাতা ছড়িয়ে মাটির কাছাকাছি অব্দি নেমে এসেছে। চারপাশ নির্জন দেখলে আমি

www.amrajarabdipori.wordpress.com
www.amrajaraboipori.wordpress.com
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori
Scan & Upload by Tusin ahmed

www.amrajaraboipari.wordpress.com

একেক সময় গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে যখন সবুজ পাতাগুলো দুই হাতে ছুঁয়ে তার ভেতর একধরনের অসীমতার স্পর্শ অনুভব করতাম। অল্পদিন, বড়জোর মাস-পাঁচেক ছিলাম আমি রাজশাহী কলেজে। এর মধ্যে গরমের সময় মাস-দেড়েক ছিলাম ঢাকায়। অল্প সময়-পরিসরে রাজশাহী কলেজটাকে আমার ভালো করে দেখা হয় নি। তবু কলেজটার ভেতর যে শান্ত সুস্থিত মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা, পড়াশোনার উপযোগী নিরিবিলি পরিবেশ চোখে পড়েছিল আজও তা আমার স্মৃতিতে জেগে আছে।

২

ব্রিটিশ আমলের অবিভক্ত বাংলার অন্যতম সেরা সরকারি কলেজ ছিল এই রাজশাহী কলেজ। কলকাতার কাছাকাছি ছিল বলে প্রেসিডেন্সি কলেজের খ্যাতিমান অধ্যাপকেরা অনেকসময় দ্বিতীয় পছন্দ হিশেবে বদলি হয়ে এই কলেজে আসতে চাইতেন। ফলে জাতীয়ভাবে কৃতিমান বহু প্রথিতযশা অধ্যাপক বিভিন্ন সময়ে ঐ কলেজে শিক্ষকতা করে গেছেন। আমি যখন ঐ কলেজে যাই তখনো বেশকিছু ভালো অধ্যাপক ছিলেন সেখানে, অল্পদিন কাজ করায় তাঁদের সঙ্গে ভালোভাবে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয় নি। যাঁদের দেখেছি তাঁদেরও দেখেছি শিক্ষক-কক্ষের স্বল্পায়তন পরিসরে, নেহাতই সীমিত জানালার ভেতর দিয়ে দেখা পৃথিবীর মতো করে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

রাজশাহী কলেজে যাঁকে আমার বিভাগের শিক্ষক হিসেবে দেখে সবচেয়ে খুশি হয়ে উঠেছিলাম, তিনি আবু হেনা মোস্তফা কামাল। ঠিক একই সময়ে না হলেও একই স্কুলের ছাত্র ছিলাম আমরা। পাবনা জিলা স্কুল থেকে তিন বছরের ব্যবধানে—তিনি ১৯৫২ সালে, আমি ১৯৫৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করি। আমাদের ছেলেবেলার পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আকাশের প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ তারকাদের তিনি ছিলেন একজন। একদিকে ভালো ছাত্র হিশেবে, অন্যদিকে ভালো কবিতা প্রবন্ধ বিশেষভাবে গান লিখে অল্প বয়সেই তিনি সেই সময়কার পূর্ব পাকিস্তানের ছোট্ট সাংস্কৃতিক মহলে সুপরিচিত হয়ে যান। কিন্তু সৃষ্টিশীলতার যে প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে তিনি ঝিকিয়ে উঠেছিলেন তার অগ্রযাত্রা পরবর্তী সময়ে একই গতিতে উচ্ছ্বিত থাকে নি। তাঁর প্রিয় শিক্ষক মুনীর চৌধুরীর মতো তিনিও, সৃষ্টিশীলতার তীব্র প্রাথমিক ও স্বল্পস্থায়ী পর্যায় পার হয়ে, প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের দিকে ঝুঁকে যান। এই যাত্রার একপর্যায়ে, প্রথমে চট্টগ্রাম ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অধ্যাপক, হলের প্রোভোস্ট ও শেষপর্যায়ে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক হিসেবে অব্যবহৃত জীবনের খেদে ভারাক্রান্ত অবস্থায় মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে হৃদরোগের আক্রমণে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল ছিলেন অত্যন্ত প্রখর ও মেধাবী। তাঁর বাচনভঙ্গি ও কথাবার্তা ছিল ক্ষিপ্র, বুদ্ধিদীপ্ত ও চিত্তাকর্ষক। ধারালো রসবোধ আর বুদ্ধির দীপ্রতায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে রাখতে পারতেন। তাঁর ক্লাসের বক্তৃতাও ছিল প্রসাদগুণসম্পন্ন। তাঁর বক্তৃতার বহুল আলোচিত গুণগুলো উপভোগ ও আয়ত্ত করার জন্যে বেশ কয়েকদিন আমি অনার্সের ছাত্রদের সঙ্গে বসে তাঁর ক্লাস করেছি। তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমরা খুবই আশান্বিত ছিলাম, কিন্তু জীবন সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমানভাবে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সহজাত ভালোবাসার অভাব, আত্মম্ভরিতা, পরচর্চার নিষ্কৃতিহীন প্রবণতা তাঁর এই সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছিল মনে হয়। তবু মেধা, উৎসাহ, দীপ্তি, উপস্থাপনযোগ্যতা, কবিত্ব সবদিক ধরলে আমাদের সময়কার সাংস্কৃতিক জগতের একজন উজ্জ্বল মানুষ তিনি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৩

রাজশাহী কলেজে থাকার সময় ঐ কলেজের যে-জিনিসটি আমার মনে সবচেয়ে গর্ব জাগিয়েছিল তা হল ঐ কলেজের লাইব্রেরি। উন্নতমানের বাংলা ও ইংরেজি বইয়ে ঠাসা এই লাইব্রেরিটিতে সাম্প্রতিকতম কালে প্রকাশিত বইয়েরও ঘাটতি ছিল না। কলেজের শুরু থেকেই যে অনেক বিদ্বান ও আলোকিত অধ্যাপক ঐ শিক্ষায়তনে অধ্যাপনা করেছেন, তাঁদের হাতে সংগৃহীত লাইব্রেরির বইগুলোর উন্নতমান ও রুচি তার প্রমাণ। কলেজ লাইব্রেরির পাঠকক্ষে সে-সময় জনা পনেরো-বিশেক অধ্যাপক নিয়মিত পড়াশোনা করতেন। লাইব্রেরির আর সবকিছুর চেয়ে এটিই ছিল আমার চোখে সবচেয়ে জ্যোতির্ময় দৃশ্য। পাঠকক্ষে অধ্যাপকেরা দল বেঁধে বসে পড়াশোনা করছেন এমন দৃশ্য রাজশাহী কলেজ ছেড়ে আসার পর কলেজ-পর্যায়ে আমি আর দেখিনি। শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড। কাজেই পড়াশোনার ব্যাপারে তাঁদেরই সবচেয়ে বেশি অগ্রণী থাকার কথা। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যান নিলে হয়ত আজ ধরা পড়বে—আমলা, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সামরিক কর্মকর্তা, উকিল—এমনি যত রকম পেশার মানুষ সমাজে রয়েছে, তাদের মধ্যে শিক্ষকদের ভেতরেই পড়াশোনার চর্চা সবচেয়ে কম। (একটু নিষ্ঠুর শোনালেও) কথাটা বললে হয়ত পুরো অসত্য হবে যে শিক্ষকরাই আজ আমাদের

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

দেশের সবচেয়ে অশিক্ষিত সম্প্রদায় (অন্তত শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত যে কটি পেশাজীবী সম্প্রদায় আজ দেশে রয়েছে তাদের মধ্যে)। এর যে-সব কারণ থাকতে পারে তার একটা হল দেশের সবচেয়ে উপেক্ষিত শিক্ষাহীন এবং ব্যর্থ ছাত্রটিই আজ এই জাতির শিক্ষক।*

---

* কেন দেশের সবচেয়ে ব্যর্থ ছাত্রটি এই জাতির শিক্ষক হয়ে পড়ল তা আমার জীবনের একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছি। একদিন ঢাকা কলেজের তথাকথিত সেরা ছাত্রদের একটা ক্লাসে পড়াচ্ছি। কথায় কথায় একটা জাতির জীবনে ভালো শিক্ষকদের কতটা দরকার সেই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা উঠল। আমি আমার সেই পুরোনো কথাগুলো তাদের কাছে তুলে ধরলাম। বললাম, দেখ, একটা জাতির মানুষেরা ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, আমলা, ব্যবসায়ী, দারোগা, শিক্ষক—যা-ই হোক, এই শিক্ষাঙ্গনের ভেতর দিয়েই সবাইকে তো যেতে হয়। জীবনে তারা কতবড় হবে তার অনেকটাই নির্ভর করে এই শিক্ষাঙ্গনে তারা তাদের সামনে কত বড় মাপের সম্পন্ন শিক্ষকদের দেখতে পেলে তার ওপর। জীবন কত জ্যোতির্ময়, কত হিরণ্য-সম্ভব তা কেবলমাত্র ভালো শিক্ষকরাই তাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন। সেই জীবনের স্বপ্নে তাদের প্রজ্জ্বলিত করে তুলতে পারেন।

ছেলেরা ঘন ঘন মাথা নেড়ে আমার কথায় সায় দিয়ে যেতে লাগল। আমি তাদের বিপুল সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে জানতে চাইলাম, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অমনি ভালো বা বড় শিক্ষক হতে চায় কিনা। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করলাম, তাদের একজনও তা হতে চায় না। আমি হাত তুলে এ ব্যাপারে তাদের সম্মতি জানাতে বললাম। কিন্তু মিথ্যা করেও কেউ হাত তুলল না। আমার মাথায় তখন একটা দুর্বুদ্ধি খেলে গেল। আমি তখন তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে কারা ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও, হাত তোল। এবার সারা ক্লাসে একটা শোরগোল পড়ে গেল। সবাই একসঙ্গে হাত তুলল। কেউ কেউ দুহাত তুলে দেখাল। আমি তাদের স্মরণ করিয়ে বললাম, তোমাদের কি জানা আছে যে জাতীয় বেতন স্কেলে শিক্ষকের আর ইঞ্জিনিয়ারের বেতন সমান। তাহলে সবাই ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও, একজন শিক্ষক হতে চাও না, এ কেমন কথা! শিক্ষকতা কি এতই খারাপ একটা ব্যাপার?

দেখলাম আমার কথা শুনে তারা মৃদু হাসছে। হাসির অর্থ সোজা : বেতন সমান, কিন্তু আয় তো সমান নয়। আয় মানে এখানে কী, তা বোঝা দুরূহ নয়। এই আয় আজ সারা দেশে সবার আছে। দারোগা, ইঞ্জিনিয়ার, আমলা, ডাক্তার, ব্যবসায়ী সবারই বৈধ বা অবৈধভাবে এই আয় আছে। নেই কেবল শিক্ষকের। আজ জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষকই সবচেয়ে দরিদ্রতম ব্যক্তি। বেতনের হাতে-গোনা সামান্য কটা টাকার ওপর তার জীবন ও ঐহিক নিয়তি। এই অবস্থায় দেশের কোন মেধাবী ছাত্রটি আজ শিক্ষকতায় আসতে প্রলুব্ধ হবে? কেন দেশের সবচেয়ে ব্যর্থ ও উপেক্ষিত ছাত্রটি আজ শিক্ষক হবে না? শিক্ষকদের মান কী করে আমরা ওপরে ওঠাব দলছুট হয়ে যারাও দুচারজন শিক্ষকতায় আসবে তারাও যখন বাস্তবতার চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করে রাশি রাশি প্রাইভেট পড়িয়ে ছাত্রশিক্ষক সম্পর্ককে আর্থিক লেনদেন বা কেনাবেচার স্তরে নামিয়ে আনবেন তখন কী বলে আমরা তাঁদের তা থেকে বিরত করব? কোন্ মহান যুক্তিতে ন্যূনতম জীবনধারণের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে আমরা তাকে অনুরোধ করতে পারি? তাদের কোন অপরাধে? যে ক্লাসটির কথা কিছুক্ষণ আগে উল্লেখ করেছি সে ক্লাসের উজ্জ্বল ছাত্রদের মধ্যে কি অন্তত দশটি ছাত্রও ছিল না যারা ভালো শিক্ষা হবার যোগ্য ছিল এবং শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিয়ে জীবন উপভোগকে আনন্দময় করে তুলতে আগ্রহী ছিল? কিন্তু সামাজিক অব্যবস্থার কারণে তারা যদি তা না পেরে ওঠে আর স্থূল অকর্ষিত চেহারার একদল ঠিকাদার পরিবেষ্টিত হয়ে এই দুর্লভ মানবজন্মকে অপচিত করাকে ভাগ্য হিশেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়, তবে কী করা যেতে পারে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সমাজের যে-মানুষটি জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রায় সর্বতোভাবে ব্যর্থ— ডাক্তার, আমলা, উকিল, কন্ট্রাক্টর, দারোগা বা দোকানদার—প্রায় কোনোকিছুই হতে পারে নি, শিক্ষকতা শেষপর্যন্ত তারই নিরুপায় পেশা। এই শিক্ষকের মধ্যে পড়াশোনার সংস্কৃতি গড়ে ওঠার কোনো কারণ নেই, আমার শিক্ষকতার দিনগুলোয় দেখিও নি তা আমি। দ্বিতীয়ত দেশে প্রায় সব পেশাতেই উন্নতি বা উচ্চতর পদে আরোহণের জন্য প্রশিক্ষণ বা যোগ্যতা-পরীক্ষা সূত্রে কমবেশি পড়াশোনায় অংশ নিতে হয়। আমাদের শিক্ষকদের তা-ও নিতে হয় না। শিক্ষকতা আজ দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোচ্চসংখ্যক মানুষের সেই আলোকবিস্তারী পেশা, যে-পেশায় জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে তার আগ্রহ সবচেয়ে কম। আজ এই পেশায় যোগ দেবার পর সারাজীবন বইয়ের একটি পাতা না উল্টিয়েও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হিসেবে সসম্মানে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। শিক্ষকদের জীবনে জ্ঞানের চর্চা না-থাকায় ছাত্রের জীবনে তা স্বাভাবিকভাবেই সংক্রমিত হয় না।

বইয়ের জগতে নিমগ্ন শিক্ষক, বিশেষ করে কলেজ পর্যায়ে, আমার জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি। কিছুদিন আগে খুলনার মেয়র তৈয়বুর রহমানের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে আমরা একই সঙ্গে পড়াশোনা করেছি। কথায় কথায় আমরা দুজনেই স্মরণ করতে পারলাম যে কলেজে পড়ার সময় আমরা যখনই কলেজের শিক্ষক-কক্ষের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতাম তখন প্রায় নিয়মিতভাবে ভেতর থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞানের মতো বিষয় নিয়ে শিক্ষকদের উচ্চস্বরের ঝগড়াঝাঁটির শব্দ শুনতে পেতাম। সেই প্রচণ্ড ঝগড়াঝাঁটি প্রায় পুলিশ-ডাকার পর্যায়ের। আজ কলেজের শিক্ষকদের কক্ষ থেকে এইসব নিরর্থক চিৎকার আর হুহুংকারের শব্দ চিরবিদায় নিয়েছে। বই এখন আর শিক্ষক-জীবনের কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয় নয়। শিক্ষকের অধিকাংশ কথাবার্তা প্রাইভেট টিউশনি, চাকরি, বেতন, ইনক্রিমেন্ট—এসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ভি.সি. আর.-এর যুগ শুরু হবার পর ১৯৮৪-৮৫ থেকে ৯০-৯২ সালের দিকে কলেজের অধ্যাপকদের মুখে না হলেও অধ্যাপিকাদের মুখে একবার কিছুদিন 'বই' শব্দটি ব্যবহৃত হতে এবং সেই 'বই' নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় নিমগ্ন হয়ে থাকতে দেখেছি। কিন্তু কান খাড়া করেই বুঝেছি এ বই পড়ার বই নয়, এগুলো আসলে বাংলা আর হিন্দি ফিল্মের ভিডিও ক্যাসেট। চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে সাহিত্যের বিখ্যাত বইগুলোকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা হত বলে সেকালের সাধারণ দর্শক ফিল্মকে বই বলতেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় সহকর্মিণীরা আসলে সেই বই আর তার নায়ক-নায়িকাদের অনন্যসাধারণ গল্প-সংলাপ নিয়ে অমন মশগুল।

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori
Scan & Upload by Tusin ahmed

www.amrajaraboipori.wordpress.com

একটা হাতল-ওয়ালা কাঠের চেয়ারের সামনে একটা ছোট্ট শাদামাঠা কাঠের টেবিল—সারাটা পাঠকক্ষ জুড়ে পাঁচ সারিতে জনাতিরিশেক শিক্ষকের এমনিভাবে একসঙ্গে বসে পড়াশোনার বন্দোবস্ত—এই ছিল রাজশাহী কলেজ লাইব্রেরির পাঠকক্ষের মোটামুটি চেহারা। কলেজে যোগ দেবার দিন-তিনেক পর পাঠকক্ষে গিয়ে যে টেবিলে বই নিয়ে বসলাম, দেখলাম তার পাশের টেবিলে একজন অধ্যাপক নিবিষ্টভাবে পড়াশোনার ভেতর ডুবে আছেন। অধ্যাপক বলতে ছেলেবেলা থেকে আমি মনের পটে যে ছবি এঁকে রেখেছিলাম, তার সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল চোখে পড়ল। কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক তিনি। নাম আজাহার হোসেন। আগের দিনই কলেজের একটা আলোচনাসভায় ভদ্রলোককে বক্তৃতা করতে দেখেছি, সেই চমৎকার ইংরেজি তখনও আমার কানে লেগে ছিল। তাঁকে এত কাছাকাছি পেয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার উৎসাহ বেড়ে গেল। দু-তিন দিন পাঠকক্ষে যাতায়াত করতেই বুঝলাম, পাঠকক্ষে তিনিই আমার নিয়মিত ও নিকটতম প্রতিবেশী, আমার পাশের টেবিলে বসেই তিনি পড়াশোনা করেন। তাঁর টেবিলটা পাঠকক্ষের আর সব টেবিলের মতোই, তার ওপরে তাঁর গাদা-করা বইয়ের স্তূপ। টেবিলটার এককোণে আঠা দিয়ে সেঁটে রাখা একটা লম্বা চৌকোনা কাগজের উপর পদবি সহ তাঁর নাম ইংরেজিতে টাইপ করে লেখা। পাঠকক্ষে অন্যসব শিক্ষকদের বিশেষ কোনো পড়ার টেবিল ছিল না। যখন যিনি যে টেবিল সামনে পেতেন সেখানেই বসে যেতেন। কিন্তু এ-ব্যাপারেও তিনি একনিষ্ঠ, নিয়মিত পড়াশোনার মতো তার টেবিলও নির্ধারিত।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমি নিয়মিত তাঁর পাশের টেবিলে বসতে থাকায় ঐ টেবিলটির ওপর আমার দখলি স্বত্ব একরকম পাকা হয়ে উঠল। আমার বইপত্র সবকিছুই থাকত ঐ টেবিলটায়। কাজেই অন্য অধ্যাপকেরা ক্রমে ক্রমে অধ্যাপক আজাহার হোসেনের টেবিলের মতো আমার টেবিলটাকেও এড়িয়ে চলতে লাগলেন।

পাশাপাশি বসে আমি ও অধ্যাপক আজাহার হোসেন পড়াশোনা করি কিন্তু কারো সাথে কারো পরিচয় নেই। এভাবেই চলতে লাগল দিনের পর দিন। আশ্চর্য নিথর আর কথাহীন এই অপরিচয়। ইচ্ছে করলেই হয়ত তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে যেতে পারে কিন্তু তাঁর তুলনায় আমার বয়স এত কম যে এগিয়ে গিয়ে পরিচয় করার কথা ভাবলে কেমন একটা দ্বিধায় পড়তে হয়। অথচ তাঁর দিক থেকেও পরিচিত হওয়ার কোনো আগ্রহ নেই। এমনি যখন অবস্থা তখন হঠাৎ একদিন পাঠকক্ষে ঢুকেই একটা রহস্যজনক ব্যাপার চোখে পড়ল। আমার টেবিলের ডান কোণ ঘেঁষে হুবহু তাঁর টেবিলের আদলে একটা লম্বা চৌকো কাগজ সাঁটা, ওপরে ইংরেজি টাইপে আমার নাম আর পদবি। অধ্যাপক আজাহার হোসেন ছাড়া কে করতে পারেন এটা? কিন্তু তাঁর চেহারায় কোনো ভাবান্তর নেই। তা এমনি নির্লিপ্ত

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

যে আমার টেবিলে ঐ টাইপ-করা কাগজটার প্রাদুর্ভাবের ব্যাপারে তাঁর-যে কোনো ভূমিকা আছে, ধারণা করা প্রায় পুরোপুরি অসম্ভব। ব্যাপারটায় নিশ্চিত হতে না পারায় এগিয়ে গিয়ে তাঁকে যে ধন্যবাদ জানাব তাও যেমন সম্ভব হল না, তেমনি তিনি ছাড়া এটা কে করতে পারে তাও মাথায় এল না। ফলে সামান্য দূরত্বে বসে একটা রহস্যময় সম্পর্কের ভেতর আমাদের অপরিচয়ের প্রদীপ নীরবভাবে জ্বালিয়ে রেখে আমরা যে-যার মতো কাজ করে যেতে লাগলাম। দিনের পর দিন আমরা পাশাপাশি টেবিলে নিঃশব্দে পড়াশোনা করেছি অথচ সৌজন্যসম্মত সাধারণ আলাপ-পরিচয়টুকু পর্যন্ত হয় নি কখনো। পাঁচটা মাস চলেছে এভাবে। একটা অদ্ভুত অযোগাযোগের ভেতর আমরা একসময় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। যে-কেউ মানবেন সম্পর্ক হিশেবে এ খুবই হিমশীতল আর অদ্ভুত। জীবনে কখনো কারো সঙ্গেই আমার এমনটা হয় নি। গতানুগতিক ছোট্ট সাধারণ হাসি বিনিময় করেই আমি আর অধ্যাপক আজাহার হোসেন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেছি। অধ্যাপক আজাহার হোসেন এমনিতেই অন্তর্মুখী এবং খানিকটা অদ্ভুত স্বভাবী মানুষ ছিলেন। তার ওপর সদ্য বিলেত থেকে তখন তিনি ফিরেছেন, পরিপাটি স্যুটটাই-এর মতোই বিলেতি কায়দা-কেতা তখনো পুরোদস্তুরভাবে গায়ে পরে আছেন তিনি। তৃতীয় কোনো ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে না দিলে যে আর কোনোভাবে মানুষে মানুষে পরিচয় হতে পারে, ব্রিটিশ এটিকেটের চাপে হয়ত তা তাঁর স্মৃতি থেকে সাময়িকভাবে তখন হারিয়ে গিয়েছে। এজন্যে, না অন্য কোনো কারণে এমনটা ঘটেছিল জানি না কিন্তু সেই তরুণ বয়সে অধ্যাপক আজাহার হোসেনের ভেতর পড়াশোনার যে স্থির উজ্জ্বল ছবি কয়েকটা দিনের জন্য চোখের সামনে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, সারা শিক্ষক-জীবন জুড়ে তা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৫

কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে আর যাঁদের কথা স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁদের মধ্যে কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স-পর্বে আমার শিক্ষক ইদ্রিস আলী অন্যতম। ঐ বয়সেও তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ আর সুপুরুষ। স্যার একসময় নাটক করতেন। তাঁর নিখাদ ও আপাত ভাবলেশহীন গভীর কণ্ঠস্বরে একধরনের সরস নাটকীয়তা ছিল। তাঁর সাধারণ কথাবার্তার সেই মৃদু নাটক আজও কানে বাজে।

অসম্ভবরকম প্রাণোজ্জ্বল আর বুদ্ধিদীপ্ত সুলতানুল ইসলাম ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক। মনে হয়, পারিবারিকভাবে তিনি উর্দুভাষী ছিলেন। তাঁর বাংলা

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

উচ্চারণে উর্দুর টান ছিল। পারিবারিক ঐতিহ্যের কাছ থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাটির মতোই তিনি পেয়েছিলেন আরেকটা জিনিস : একটা বেয়ারা রকম কেশ-বিমুখ মাথা। ঐ সময়ে তা প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছিল। জিন্না-টুপি ধাঁচের উঁচু গোল একটা পশমি টুপি পরে থাকতেন তিনি সবসময়। টুপিটা তিনি ধর্মীয় কারণে, না মাথার দুরপনেয় নান্দনিক শূন্যতার খেসারত হিসেবে ব্যবহার করতেন জানি না, তবে যে-রকম প্রচণ্ড গরমে তাঁকে ঐ জবরজং পশমি টুপি মাথায় নিয়ে নির্বিকারে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি, নিখাদ ধর্মীয় আনন্দে রাজশাহীর দুঃসহ আবহাওয়ায় সেভাবে ঘুরে বেড়ানো সত্যি সত্যি দুরূহ।

চুলের অকাল পাক-ধরা বা বলা-নেই কওয়া-নেই হঠাৎ করে মাথা জুড়ে একটা চকচকে টাক পড়ে যাওয়া আসলেই একটা বেদনাদায়ক ব্যাপার। যৌবনকে তা কয়েকদিনের মধ্যে প্রৌঢ়ত্বের শেষ কোঠায় ঠেলে দিতে পারে; পঁয়ত্রিশ বছরের জ্বলজ্বল যুবককে মনে হতে পারে পঞ্চাশ বছরের পাতাঝরা প্রৌঢ়। এমন হৃদয়বিদারক বিপর্যয়ের পর একজন সংবেদনশীল যুবকের যা করণীয় থাকে, শিব্রামের ভাষায় তা একটাই : আত্মহত্যা করা। সেটা সবসময় সম্ভব না হলে যা করা যায় অধ্যাপক সুলতান তাই করতেন—মাথায় টুপি পরে চুলের ঐ উদ্ধারহীন নিঃস্বতার ক্ষতিপূরণ করতেন। স্যুটে-টুপিতে অধ্যাপক সুলতানকে রীতিমতো প্রবীণ মনে হত। মানুষের হৃদয়ের যৌবনকে বোঝার শক্তি আমার তখনো হয় নি। চক্ষুগ্রাহ্য বয়সই তখন আমার কাছে মানুষের একমাত্র বয়স। কাজেই প্রাণের প্রাচুর্যে জমজমাট অধ্যাপক সুলতান তখন আমার কাছে নেহাতই একজন বৃদ্ধ। তবু তাঁর বয়স আঁচ করার জন্য সহজ কৌতূহল নিয়ে একদিন জানতে চাইলাম, তিনি অধ্যাপনা করছেন কত বছর ধরে? উনি তারুণ্যদীপ্তভাবে হেসে বললেন, আঠেরো বছর। তাঁর গলার স্বরে প্রবীণতার গর্বিত ভঙ্গি ফুটে উঠল। আঁতকে উঠে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত-চোখে তাকিয়ে দেখলাম : আ-ঠে-রো ব- ছ-র। আঠেরো বছরের শিক্ষক-জীবন শেষ-করা একজন বৃদ্ধ বসে আছেন সামনে! একটা অতিজাগতিক ভয় যেন চেপে ধরতে লাগল আমাকে। আমি যত বছর ধরে পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছি প্রায় ততগুলো দিন কেবল শিক্ষক হিশেবেই কাটিয়েছেন তিনি! আমার সামনে যেন কোনো ভীতিকর প্রপিতামহের প্রেতাত্মাকে বসে থাকতে দেখলাম আমি। সেদিন বুঝি নি যদি তাঁর শিক্ষকতা জীবন আঠের বছর হয়ে থাকে, আর সে-সময়কার আর দশজনের মতো যদি একুশ-বাইশ বছরে তিনি শিক্ষকতায় যোগ দিয়ে থাকেন তবে তাঁর বয়স তখন কিছুতেই চল্লিশ-বেয়াল্লিশের বেশি ছিল না। আজ ভেবে সংকোচ হয়, মাত্র চল্লিশ বছরের একজন মানুষকেও, নিজেদের অল্প বয়সের অবিমৃষ্যতার কারণে, আমাদের চোখে কত বয়সেরই না মনে হয়েছে! জানি না আমাদের তরুণ ছাত্রছাত্রীরাও আমাদের এখন ঐ ধরনের প্রাচীন পৃথিবীর বিলুপ্ত প্রজাতি হিসেবেই দেখে কি না।

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

একজন মানুষ আঠারো বছর অধ্যাপনা করেছেন শুনে সেদিন ভয়ে আঁতকে উঠেছিলাম, অথচ আজ তিরিশ বছরের অধ্যাপনা জীবনের পর আরও চার বছর পার করে যখন এই গল্প আমি লিখছি, তখনও নিজেকে পঁচিশ বছরের যুবকের চেয়ে কিছুতেই বেশি বলে মনে হচ্ছে না। এও তো জীবনের আর একধরনের পরিহাস।

রাজশাহী কলেজের আর যাঁদের কথা চোখে ভাসে তাঁদের মধ্যে ড. আবু মাহমুদ একজন। ড. মাহমুদ গত বছর নায়েমের মহাপরিচালকের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। সেই সময় তিনি ছিলেন ইংরেজির তরুণ অধ্যাপক। শালপ্রাংশু আবু মাহমুদের বলিষ্ঠ নম্র ব্যক্তিত্ব এখনো চোখে লেগে আছে। আর ছিলেন অসিতদা, আমাদের বিভাগের অসিত মজুমদার, কলেজে আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ। তাঁর জীবনে বিয়ের সুন্দরতম সময়গুলো যে-আশঙ্কাজনক গতিতে বেহাত হয়ে যাচ্ছে তা এতবার বলেও বিয়ের ব্যাপারে আমরা কেউই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি নি। একটি চৌষট্টি-কলাসম্পন্না সর্বগুণান্বিতা পাত্রীর আসন্নতার ব্যাপারে তিনি এমনই নিঃসংশয় আর নিরুদ্বেগ ছিলেন যে ঐ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে তাঁর রক্তে কিছুতেই চাঞ্চল্য ধরানো যায় নি।

আর একজন অধ্যাপক ছিলেন কলেজে। অসহ্যরকমের বিরক্তিকর এবং বাচাল স্বভাবের জন্য মনে আছে তাঁকে। তাঁর নাম এখানে লিখব না। তাঁর দুটো চোখের মণিতেই কিছুটা খুঁত ছিল, চশমার ভেতর দিয়েও তা চোখে পড়ত। এই ধরনের শারীরিক খুঁতঅলা মানুষের ভেতর অনেক সময়েই কমবেশি অস্বাভাবিকতা থেকে যায়। হয়ত নিয়তির অন্যায় বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তাদের ভেতর ঐ অস্বাভাবিকতার সংক্রমণ ঘটে। এমনি কোনো একটা বাড়াবাড়িরকম হাস্যকর প্রবণতার জন্যে ছাত্রেরা তাঁর চোখের খুঁতের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর নাম দিয়েছিল—মিস্টার লুক হেয়ার অ্যান্ড সি দেয়ার।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আর একজন সহকর্মীর কথা মনে পড়েছে—ফুলার হোস্টেলে আমার রুমমেট ছিলেন তিনি। ভদ্রলোকের নাম বা কোন্ বিভাগের অধ্যাপক তিনি ছিলেন—কিছুই মনে নেই। কিন্তু তাঁর ভেতর যে মাধুর্যময় মরমী চেহারাকে ভরা জোয়ারের মতো ছলছলিয়ে উঠতে দেখেছিলাম আজও তা মনে আছে। অদ্ভুত আমুদে আর খেয়ালি মানুষ ছিলেন তিনি। সারাদিন ফুর্তিতে উৎসাহে মৌ মৌ করতেন। ভদ্রলোক ছিলেন 'যাত্রা'-পাগল। অধ্যাপনায় আসার আগে গ্রাম্য-যাত্রা দলে বিবেকের পাঠ করতেন। নাটক আর গানের মদিরতায় ভরা ঐ যাযাবর জীবনের ভেতরে তাঁর সমস্ত হৃদয়মন এমনভাবে আটকা পড়ে গিয়েছিল যে সরকারি কলেজে যোগ দিয়েও যাত্রার আকর্ষণ তিনি ছাড়তে পারেন নি। বছরখানেক অধ্যাপনার পর একদিন হঠাৎ করেই কলেজ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। ফিরেছিলেন বছর দুই পর। উল্টোপাল্টা পথে চাকরিটা কোনোমতে ফেরত নিয়ে

Scan & Upload by Tusin ahmed
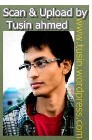
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

রাজশাহী কলেজে এসে যোগ দিয়েছিলেন দিনকয়েক আগে।

তখনো 'যাত্রা' তাঁর সারা অস্তিত্বে। সবে ছেড়ে-আসা অভিনয়ের কথা মনে হলে হঠাৎ করেই আত্মবিস্মৃতের মতো দুই হাত শঙ্খচিলের ডানার মতো দুদিকে আলতোভাবে দোলাতে দোলাতে ঘরের ভেতরেই বিবেকের গান শুরু করতেন :

হারায়ে গিয়াছে দেবতা আমার—
সকলি গিয়াছে হারায়ে ....

তাঁর দুই চোখ ছলছল করে উঠত, মুখের প্রতিটা রেখায় একটা বিমর্ষ বেদনা গভীর হয়ে জমে যেত, শূন্য হৃদয়ের সেই করুণ হাহাকার সারাটা ঘরকে বেদনা-ভারাক্রান্ত করে চারপাশের হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে হারিয়ে যেত একসময়।

৬

রাজশাহী কলেজে ছিলাম মাত্র পাঁচ মাস। দু-মাস যেতে-না-যেতেই রাজধানীর হাতছানি কুহকীর মতো আমাকে ডাকতে শুরু করল। ক্ষমাহীন, নিষ্কৃতিহীন সে আহ্বান। কেবলই মনে হত, আমার অনেক আরাধ্য আছে, অনেক কর্তব্য আর দায় আছে :

www.amrajaraboipori.wordpress.com

And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep :

সেই আরাধ্যের সার্থকতা রাজধানীর সংক্ষুব্ধ জনবহুল কর্ম আর উত্তেজনার ভেতর, আধুনিক বিশ্ব-সংস্কৃতির রাজপথে। রাজশাহীর শান্ত নিস্তরঙ্গ মধ্যযুগীয় পৃথিবীতে সেইসব আকুতির কোনো উত্তর নেই। সেই রাজধানীতে আমাকে যেতেই হবে। সেখানে না-যেতে পারার চিন্তামাত্রেই দুঃস্বপ্ন, ব্যর্থতা মানে আত্মবিনাশ।

অথচ সেই ঢাকায় ফিরে যাবার পথ প্রায় রুদ্ধ। ঢাকায় বদলি হবার মতো কলেজ তখন মাত্র একটা : ঢাকা কলেজ। সেখানে প্রভাষকের পদ সাকুল্যে দুটো। উচ্চপদের সীমিত সংখ্যার কারণে সেকালে প্রভাষক থেকে কনিষ্ঠ অধ্যাপকের পদে পদোন্নতি পেতে শিক্ষকদের অনেক বছর লেগে যেত। অনেকের বিশ-বাইশ বছরও লাগত। এমনি অবস্থায় কবে যে ঢাকা কলেজের ঐ তরুণ প্রভাষক দুজনের অন্তত একজন বৃদ্ধ হয়ে পদোন্নতি পাবেন, তাঁর পদটা খালি হবে, আর যদি তা হয়ও তবু ঢাকার বাইরের এতগুলো সরকারি কলেজের

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

প্রভাষকদের শ্যেনদৃষ্টির সামনে থেকে আমিই যে কী করে সেই পদ ছোঁ মেরে হাতিয়ে নিতে পারব এ-সব জটিল সমস্যার কোনো কূলকিনারা আমি খুঁজে পেতাম না। মেয়েদের একমাত্র সরকারি মহাবিদ্যালয় ইডেন কলেজে স্বর্গবাসী হওয়ার সুযোগ একমাত্র মহিলা শিক্ষকদের, পুরুষ শিক্ষক সেখানে অবাঞ্ছিত। কাজেই সব দিক অন্ধকার।

রাজশাহীতে যতই দিন যেতে লাগল ততই মনে হতে লাগল এই প্রাণহীন পৃথিবীতে, পুতুল নাচের ইতিকথার শশী ডাক্তারের মতো, প্রত্যন্ত গ্রামের রাস্তায় হেঁটে হেঁটে উদ্ধারহীন বিকাশহীন অবস্থায় আমিও একসময় হয়ত অমনি নিঃশেষ হয়ে যাব। আমার নামের যে জ্বলন্ত তরুণ একদিন ইকারুসের মতো সূর্যের প্রদীপ্ত পিপাসায় উঁচু আকাশের পথে পাখা মেলেছিল সে অসহায়ের মতো সমুদ্রের কালো গভীর অতলে হারিয়ে যাবে।

হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর আলোর রেখা খেলে গেল। একজন খবর নিয়ে এল: বছর দুই আগে ঢাকার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুলকে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে, এখন এর নাম ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজ (বর্তমান নাম বিজ্ঞান কলেজ)। এখানে একটা প্রভাষকের পদ আছে। আরও শোনা গেল সেই কলেজের বাংলার একমাত্র প্রভাষক রেজাউল হক (বর্তমানে রংপুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ), বাড়ি উত্তরবঙ্গে বলে রাজশাহী কলেজে বদলি হওয়ার জন্যে রামগিরি পর্বতের বিরহী যক্ষের মতো ঢাকার সানুদেশে দিনে দিনে আত্মক্ষয়ে ক্ষীণ হয়ে চলেছেন।

আমি ঢাকার যক্ষ, রেজাউল হক রাজশাহীর। দুজনে এককাট্টা হয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করে বদলির ব্যবস্থা করে নিতে দেরি হল না। রাজশাহী কলেজে থাকতে স্নাতক ও অনার্স পর্যায়ের ছাত্রদের পড়াতাম। এখানে উচ্চ মাধ্যমিকের ওপর ছাত্র নেই। তবু তাই সই। ঢাকা তো! এর জন্যে আমি যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে পারি। উচ্চ মাধ্যমিক তো উচ্চ মাধ্যমিক, ঢাকায় আসার জন্য আমি তখন প্রাইমারি চাই কি নার্সারিতে পড়াতেও রাজি। হ্যাঁ, ঢাকায় আসার জন্যে। একমাত্র অব্যর্থ ও অনিবার্য ঢাকায়—আমার স্বপ্নের, আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল উদ্ধার, আমার আনন্দ সাফল্য উৎসব আর আলোমেলার শহর—আমার আশৈশবের ঈপ্সিত গন্তব্য—ঢাকায়।

৭

রাজশাহীতে যা নিয়ে আমি সবচেয়ে অসুবিধায় পড়েছিলাম তা হল আমার তরুণ ও অপরিণত বয়স। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে, বড় বড় অধ্যাপকদের মতো সারাদিন লাইব্রেরিতে বই নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকছি, নিজের অধ্যাপকসুলভ ভারিক্কিকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে একজোড়া গোঁফও রেখেছি, কিন্তু প্রবীণেরা আমাকে গুরুত্বই দিচ্ছেন না। তাঁরা কেউ-ই যেন আমাকে কলেজের ওপরের ক্লাসের ছাত্রের বেশি কিছু ভাবতেই নারাজ। আমার চেহারার স্নিগ্ধতা-মাখানো কৈশোর আমার গুরুগম্ভীর ও অধ্যাপকীয় হয়ে ওঠার সব প্রাণপণ চেষ্টাকে বানচাল করে চলেছে।

কিন্তু কী-ই-বা করতে পারি আমি। সদ্য একুশ-পেরোনো একজন তরুণের অপরিণত চেহারাকে গুরুত্বপূর্ণ করার জন্যে তাকে আর কতটাই বা ভয়াবহ করে তোলা যায়।

আগেই বলেছি, ঐসময় রাজশাহী কলেজে ব্রিটিশ আমলের চাকরির আবহাওয়া অনেকখানিই টিকে ছিল। অধ্যাপকদের ভেতর উঁচু-নিচু, ছুৎ-অচ্ছুৎ, আশরাফ-আতরাফের চুলচেরা বিভেদ তখনো নিষ্ঠুর ও অসম্মানজনক। অধ্যাপকেরা প্রভাষকদের যেন প্রায় চাকরবাকর মনে করতে চাইতেন। আমি ওখানে থাকতেই এ-সব নিয়ে একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটেছিল—কলেজের একজন বিভাগীয় অধ্যক্ষ ও ঐ বিভাগেরই একজন প্রভাষকের মধ্যে। অধ্যক্ষ সাহেব একা থাকতেন একটা আট কামরাওয়ালা বিশাল সরকারি বাসা নিয়ে, তাঁর পরিবার থাকত ঢাকায়। পুরো বাড়িটা বছরের পর বছর খালি পড়ে থাকত। অথচ তরুণ প্রভাষকদের অনেকেরই তখন থাকার জায়গা নেই। তাদের থাকতে হত শস্তা হোটেলে বা মেসের ঘিনঘিনে নোংরা ঘরে। হোটেল আর মেসের অস্বাস্থ্যকর রান্না আর মিউনিসিপ্যালিটির খারাপ পানি খেয়ে প্রায়ই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ত। রোগে ভুগত। আমাদের সেই তরুণ প্রভাষক বিভাগীয় অধ্যক্ষের কাছে প্রভাষকদের এই দুরবস্থার ছবি তুলে ধরে বিনীতভাবে জানতে চান, দু-তিন জন প্রভাষকের থাকার জন্য তিনি তাঁর বাসায় একদিকের একটি বা দুটি কামরা ছেড়ে দিতে পারেন কি না। শুনে অধ্যক্ষ দরাজ গলায় খানিকটা হেসে উত্তর দেন, গাধা গরু সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে নাকি?

আমাদের সেই তরুণ প্রভাষক এমনিতেই ছিলেন একটু ঠোঁটকাটা। এই অপমানে তিনি আরও চটে গেলেন। তাছাড়া তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তাই তাঁর হারাবারও কিছু ছিল না। বিভাগীয় অধ্যক্ষের বাক্যগঠনের ত্রুটির সুযোগ নিয়ে তিনি সরাসরি বলে বসলেন : স্যার গাধাই বা কারা আর গরুই বা কারা একটু বুঝিয়ে দেবেন।

কলেজের যে-সব শিক্ষকদের তাঁর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে চলে যাবার ভবিষ্যৎ ছিল না, তারা এ-সব অপমানের জবাব ওভাবে দিতে পারত না। সারাজীবন ঐ অপমান নীরবে সহ্য করে যেত। ব্রিটিশ আমলের সামন্ত-আবহাওয়ার প্রভাব আমাদের শিক্ষকদের মধ্যেও ছুৎ-অচ্ছুতের কী দুঃসহ ও

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

নিষ্ঠুর দেয়াল তুলে রেখেছিল তা বোঝানোর জন্যেই গল্পটা বললাম। কলেজের অধ্যক্ষ তো বটেই, উপাধ্যক্ষকেও নিজের কামরা ছেড়ে খুব একটা বের হতে দেখতাম না আমরা। শিক্ষক ছাত্রদের থেকে নিজেদের দুর্গম বিচ্ছিন্ন ও রহস্যাবৃত করে রাখতেই তাঁরা যেন ছিলেন তৎপর। এটাকে তাঁরা কলেজের ওপর তাঁদের কর্তৃত্বকে সার্বভৌম করে রাখার অব্যর্থ মহৌষধ বলে মনে করতেন। এখনকার প্রভাষক বা সহকারী অধ্যাপকদের মতো যখন-তখন প্রিন্সিপ্যালের ঘরে ঢুকে তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করা তখন ছিল চিন্তারও বাইরে। সে-সময়কার অধ্যক্ষেরা একালের ছাত্র-রাজনীতির তাড়া-খাওয়া ডানাভাঙা অসহায় অধ্যক্ষদের মতো এমন শিক্ষক বা ছাত্র-আশ্রিত ছিলেন না বলে এই বিচ্ছিন্নতাকে তাঁরা দাপটের সঙ্গে বজায় রাখতে পারতেন।

আমার বয়স কম, দেখতে তারও চেয়ে কম লাগে, চোখেমুখে কৈশোরিক শিশির-কণা তখনো জড়িয়ে আছে—এই অপরাধের কী প্রতিকার আছে আমার হাতে ! আমার বয়স তখন সবে একুশ ছেড়ে বাইশে পড়েছে। এখন যে-বয়সে ছেলেমেয়েরা অনার্সের প্রথম বর্ষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষে ওঠে, সেই বয়সে আমি অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের পড়াই। কলেজে এম. এ. থাকলে হয়ত এম. এ. শেষ পর্বের ছাত্রই পড়াতাম। কিন্তু বয়স যা-ই হোক, আমি তো অধ্যাপক, অধ্যাপকের মর্যাদাসম্পন্ন চেহারা নিয়ে সবার সামনে দাঁড়াতেই আমি চেষ্টা করছি। এ-ব্যাপারে সবার এত অনাস্থা থাকলে কীভাবে চলবে ! এ অবস্থা কারো কারো স্বরে যে কতখানি করুণা আর সহানুভূতি নিয়ে ঝরে পড়ত একটা ঘটনার উল্লেখ করে তা বোঝানোর চেষ্টা করি।

একদিন কলেজের বর্ষীয়ান হেডক্লার্কের কাছে মাসপয়লার বেতন নিতে গেছি। তিনি আমার দিকে অনেকক্ষণ সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে একসময় বললেন : 'এমন মায়া-মায়া চেহারা। কোথায় আটকা পড়ে যে কষ্ট পেতে হবে তাই ভাবি।' উনি হয়ত কোনো সম্ভাব্য হৃদয়হীনার কাছ থেকে আমার বেদনার্ত হৃদয়ের ফালি-ফালি হয়ে যাওয়ার কষ্টের ইঙ্গিত করতে চাইলেন।

ঐ বয়সে সহানুভূতি পেতে সবারই ভালো লাগে। কিন্তু তা নিশ্চয়ই এ-ধরনের অস্তিত্ব হারানোর বিনিময়ে নয়।

কিন্তু অধ্যাপকগিরির গুরুগম্ভীর ভাবের তুলনায় আমার বয়স যে সত্যিসত্যি কত কম সেটা বেরিয়ে পড়ল কলেজের এক কর্তার সঙ্গে একটা ঘটনায়। সত্যি সত্যি যে কতটা ছেলেমানুষ তখন ছিলাম নিচের ঘটনাটি তার প্রমাণ দেবে।

কর্তাব্যক্তিটিকে দূর থেকে চার-পাঁচবার দেখার সুযোগ হলেও তাঁর সাথে আমার সামনাসামনি দেখা হয়েছিল সব মিলে দুবার। দ্বিতীয়বারের গল্পটা এখানে বলছি।

একদিন, তখন সকাল এগারটা সাড়ে এগারটা হবে, শিক্ষকদের কমনরুমে আড্ডায় মেতে আছি, হঠাৎ তাঁর পিয়ন এসে জানাল, অমুক স্যার সালাম

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

দিয়েছেন। একজন সামান্য প্রভাষককে অমন কর্তাব্যক্তির সালাম! সবার সামনে দিয়ে তাঁর রুমের দিক এগোলাম। আমার বুক ঢিপঢিপ করছে।

কর্তাব্যক্তি অন্তরঙ্গ স্বরে আমার সঙ্গে কথা বললেন। আমার প্রতি কলেজের শিক্ষকদের স্নেহের কথা বললেন, শিক্ষক হিশেবে আমার সাফল্যের প্রশংসা করতে গিয়ে খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি। এতবেশি মাধুর্য দেখে ভেতরে ভেতরে ভয় হল। কাউকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলতে হলে তাকে প্রথমে উঁচুতে ওঠাতে হয়, তাহলে ফেলাটা জমে ভালো। আমার আশঙ্কা মিথ্যা হল না। কিছুক্ষণ এ-কথা ও-কথার পর তাঁর মুখ থেকেই শোনা গেল আসল কথা। বললেন, সবই ভালো আমার—পড়ানো, পড়াশোনা, কথাবার্তা, সৌজন্য, বিনয়—সবই আছে আমার মধ্যে। কেবল ছোট্ট একটা ব্যাপার! ...

উৎকর্ণ হয় উঠলাম শোনার জন্যে।

না, লুকোলেন না তিনি। সহজভাবে জানিয়েছিলেন তিনি ব্যাপারটা; আমার পায়ের স্পঞ্জের স্যান্ডেল দুটোকে প্রবীণ শিক্ষকরা মেনে নিতে পারছেন না। আর সবই মেনে নেওয়া যায় কিন্তু একজন শিক্ষকের পায়ে এমনি স্যান্ডেল মেনে নেওয়া কঠিন।

এখন সবাই কমবেশি বাসায় যে স্পঞ্জের স্যান্ডেল পায়ে দেয়, তা প্রথম বাজারে আসে ১৯৬০-এর দিকে। পায়ের তলায় স্প্রিঙের মতো স্বাদু অনুভবের কারণে স্যান্ডেলগুলো দেখতে দেখতে সারাদেশে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কেবল ঘরের ভেতরে নয়, স্যান্ডেল হিশেবে বাইরেই সেগুলো পরে বেড়াতে থাকে সবাই। প্রায় ফ্যাশানই হয়ে ওঠে ব্যাপারটা। আমিও যুগরুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চামড়ার স্যান্ডেল ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে এই স্যান্ডেলকেই আমার একমাত্র পাদুকা করে তুলেছিলাম। সব জায়গার মতো কলেজেও যেতাম ঐ স্যান্ডেল পরেই। কিন্তু এই তুচ্ছ নিরপরাধ স্যান্ডেলজোড়া-যে কলেজের অধ্যাপক সম্প্রদায়ের মর্যাদাকে এতটা সংকটাপন্ন করে ফেলেছে, তাঁর কথা থেকে তা বুঝতে পেরে খুবই সংকুচিত হয়ে পড়লাম। ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়। তাঁর কথা মেনে নিয়ে চলে আসতে পারতাম। কিন্তু বেধে গেল আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। ছেলেবেলা থেকে আমি সরল-শাদামাঠা জীবনে বিশ্বাস করি। ইংরেজিতে যাকে বলে 'প্লেন লিভিং অ্যান্ড হাই থিংকিং'—অনেকটা সে-রকম একটা জীবন—কত অল্প দিয়ে জীবনকে কতটা সুন্দর আর পরিতৃপ্ত করে তোলা করা যায়, এ চেষ্টাই আমি করে এসেছি ছেলেবেলা থেকে এবং আজও করে চলেছি। "অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন"—এইসব কথার ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমার ছেলেবেলায় যে সম্পন্ন জীবনের স্বপ্ন জাগিয়েছিলেন—কিংবা কলেজে থাকতে ডয়োজিনিসের জীবনী আর তাঁর সম্বন্ধে কিছু বিক্ষিপ্ত লেখা পড়ে যে সহজ

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com
সুন্দর জীবনের স্বপ্নে প্রাণিত হয়েছিলাম সারাজীবন সেই শাদাসিধা সহজ জীবনই আমি খুঁজে বেড়িয়েছি। বস্তু আর উপকরণের ক্লেদাক্ত ভারের নিচে জীবনের নির্মল উৎসধারাকে পিষ্ট করে মানব-জনমকে ব্যর্থ করাকে আমি জীবনের অপচয় মনে করেছি। এটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস। এই পথে কেউ আমাকে প্ররোচিত করেনি। এ-ব্যাপারে আমি স্পর্শকাতর। এ-ব্যাপারে গায়ে পড়ে কেউ উপদেশ দিতে এলে বা একে তাচ্ছিল্য করতে এলে আমাকে আমি হেসে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করি, জোর করতে এলে তেড়িয়া হয়ে উঠি।

এর আগেও এ-প্রসঙ্গে গায়ে পড়ে হিতোপদেশ দিতে-আসা অনেককে অনেকবার কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছি আমি। কর্তা মহোদয়ের বেলাতেও ঘটল অমনি ব্যাপার। তিনি ভালো মানুষ, না হলে বস্ হিসেবে আদেশের সুরে সরাসরিই কথাটা বলে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। আমার সম্মান রেখেই কথা বলেছিলেন তিনি।

উনি আর দশটা মানুষের কেউ হলে আমি ঘন ঘন শিরশ্চালনের মাধ্যমে সমর্থনের কপট ভঙ্গি করে কৌশলে প্রসঙ্গটা হয়ত এড়িয়ে যেতাম। কিন্তু এ তো তা নয়। কর্তৃপক্ষের আপাত-সৌজন্যময় অনুরোধের তল দিয়ে শোনা যাচ্ছিল কলেজের কায়েমি অধ্যাপকচক্রের সুস্পষ্ট নির্দেশের সুর! ব্যাপারটা আমাকে উত্তেজিত করে তুলল। আমার ঐ বয়স পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে, বাইরের কারো নাহক খবরদারিতে আমি কেন যেন অসুস্থ হয়ে উঠতাম। খানিকটা উত্তেজিতভাবে কিন্তু নমনীয় গলায়, যতটা সম্ভব ভদ্রতা বজায় রেখে বললাম, কিন্তু স্যার, আমি তো স্যান্ডেল দিয়ে ছাত্র পড়াই না।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমার মুখের উত্তর শুনে কর্তা মহোদয় চুপ হয়ে গেলেন, একসময় বললেন: 'আপনি আসুন।' তাঁর গলায় হতাশা।

৮

রাজশাহী শহরে এই কয়েকমাসের জীবনে একজন বলীয়ান মানুষের সঙ্গে দেখা হয় আমার, তাঁর কথা দিয়েই রাজশাহী কলেজের প্রসঙ্গ শেষ করব। তাঁর নাম আবদুল হাফিজ। বয়সে আমার চেয়ে বছর আট-দশের বড় ছিলেন তিনি। তাঁর ভেতরকার জান্তব ও দুর্দম যৌবন সহজেই তরুণ-হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করে তুলত। কালো রঙ, খাঁদা নাক, গণ্ডের বেঢপ উঁচু গঠন ও চওড়া হাড়অলা সমর্থ দেহ, সব নিয়ে বেপরোয়া আত্মবিশ্বাসী আবদুল হাফিজ সবাইকে প্রচণ্ডভাবে তাঁর দিকে আকর্ষণ করতেন। প্রথম পরিচয়েই তিনি আমাকে প্রবলভাবে টেনে

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

নিলেন । তাঁকে আমি হাফিজ ভাই বলে ডাকতাম। আমার এই সম্বোধনের সূত্রে ও পরে নিজের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি পরবর্তীতে ষাটের দশকের ঢাকার সমস্ত তরুণ লেখকের হাফিজ ভাই হয়ে ছিলেন।

অজানা নানা বিষয় সম্বন্ধে জ্যান্ত আর রগরগে খবর পাওয়া যেত হাফিজ ভাই-এর কাছে থেকে। যে-কোনো ব্যাপারকে রক্তে-মাংসে জীবন্ত করে চোখের সামনে তুলে ধরার ক্ষমতা ছিল তাঁর।

তাঁর কাছ থেকেই প্রথম মানবজাতির নিষিদ্ধ জগতের কথা জানতে পারি আমি। আদিমতা আর অবদমিত যৌনতার গহন অস্তিত্বের খবর পাই। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে মার্কসীয় ও ফ্রয়েডীয় ভাবনার ধারক। সাম্যবাদী বোধের পাশাপাশি তাঁর কাছ থেকে শোনা ছোট ছোট লোকজ গল্পের ভেতর হাজার হাজার বছর ধরে প্রবহমান এদেশের বামাচারী তান্ত্রিক সাধনার জীবন্ত ছবি আমি চোখের সামনে দেখতে পেতাম। আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম অমিত শক্তিমান হাফিজ ভাই আমাদের সাহিত্যে বলিষ্ঠ অবদান রাখবেন। তাঁর প্রথমদিকের গল্পে ও প্রবন্ধে এই শক্তিমত্তার ছাপ ছিল। কিন্তু জীবন-সংগ্রামের দাঁতাল আক্রমণ তাঁর এই সম্ভাবনাকে অনেকখানি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। কিছুটা জীবন-সংগ্রামের চাপে, কিছুটা নিজের অস্থিরচিত্ততার জন্য তিনি কখনো রাজনীতি, কখনো গবেষণা এবং কদাচিৎ সাহিত্যচর্চায় সক্রিয় হলেও শেষপর্যন্ত কোনো সুস্থির লক্ষ্যে স্থিত হতে পারেন নি। সাহিত্য, জীবন ও নারী সম্বন্ধে তাঁর আবেগ ছিল বলিষ্ঠ ও রক্তমাংসময়। সময়ের আক্রমণে সেই দুর্ধর্ষ হাফিজ ভাই-এর পরাক্রান্ত যৌবন আজ প্রায় মিথ্যা হয়ে এসেছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

রাজশাহী শহরের পশ্চিম ধার জুড়ে পদ্মার বিস্তীর্ণ চিকচিকে বালুময় জগৎ। তার ভেতর দিয়ে গোটা কয়েক রুপোলি জলজ ধারা। রাজশাহী কলেজের ধার ঘেঁষে পদ্মার এমনি একটা বড় শাখা প্রবাহিত ছিল সে-সময়। সন্ধ্যার পর অন্ধকার নেমে এলে আমি আর হাফিজ ভাই একেকদিন তার পাশ-ঘেঁষা পদ্মার বাঁধের ওপর গিয়ে বসতাম। সামনে চৈত্রের তাপে পদ্মার খরস্রোতা ধারা অন্ধকারের ভেতর হিংস্র শ্বাপদের মতো তীব্র উচ্ছ্বাসে চকচক করত। মনে আছে একদিন গল্প করতে করতে হাফিজ ভাই সংস্কৃত ধ্বনিবাদীদের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। "ধ্বনিবাদীরা বলতেন", হাফিজ ভাই বলেছিলেন, "যখন চোখ অবলুপ্ত হয়ে যাবে, দৃশ্যমান জগৎ অদৃশ্য হবে, সামনে থেকে ঘ্রাণ স্পর্শ আস্বাদান সব বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন পৃথিবীময় জেগে থাকবে শুধু একটি জিনিশ : শব্দ। শুধুই ধ্বনিময় শব্দের জগৎ। এই শব্দই হচ্ছে ব্রহ্ম"।

কথাটা ধ্বনিবাদীদের না হাফিজ ভাই-এর নিজের জানি না, কিন্তু শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি কথাটার সত্যতা যাচাই করার জন্যে চারপাশের ছেঁকে-ধরা অন্ধকারের ভেতর চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ নীরব

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

হয়ে বসে রইলাম। মুহূর্তে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল যেন আমার চারপাশে। চারপাশের সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ভেতর আমি অনুভব করলাম আমার সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া পদ্মার উচ্ছ্বিত ক্রূর কলস্বর মুহূর্তে এক বিশাল শব্দ-জগৎ হয়ে জেগে উঠে, পৃথিবীর আর সবকিছুকে বিলুপ্ত করে, আমার দৃশ্যজগৎহীন সত্তার চারপাশে জীবন্ত গর্জনে স্ফূরিত স্ফুটিত ও বিস্ফোরিত হয়ে চলেছে।

দেখতে দেখতে আমার রাজশাহী কলেজের নির্বাসনের দিন শেষ হয়ে এল। কলেজের সীমানা-ঘেঁষা পদ্মার উচ্ছল জগৎ, ফুলার হোস্টেলের সামনের বিশাল শিরীষের ডালপালার নুয়ে-আসা আনত সাম্রাজ্য, লাইব্রেরির অধ্যয়ন-সজীব পাঠকক্ষ (যেখানে অনেক কিছুর সাথে স্যাফোর কবিতা আর মেটারলিঙ্কের বেশকিছু অনবদ্য নাটক পড়ে আমি প্রতিভার অপার্থিবতা দেখে শিউরে উঠেছিলাম), রাজশাহী শহরের ধুলো আর গরমে গুমোট মন্থর জগৎ—সব পেছনে ফেলে একদিন সন্ধ্যায় আমি ট্রেনে উঠলাম। যে-কোনো বিদায়ের ভেতর, তা সে যত ছোটই হোক, একটা মৃত্যু লুকিয়ে থাকে। আমি বুকের ভেতর সেই মৃত্যুর তীক্ষ্ণ ক্রূর যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলাম। ঝাপসা চোখে জানলা দিয়ে তাকিয়ে আমার মনে হল সারা রাজশাহী শহর কোনো দীর্ঘ ফরসা সুন্দরীর অশ্রুসজল চোখের মতো আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজ

১

ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজে যোগ দিয়ে আমি যেন আমার ঈপ্সিত স্বর্গ খুঁজে পেলাম। মাসকয়েক অপেক্ষা করার পর থাকার জায়গাও পেলাম চমৎকার। কলেজের নির্মীয়মাণ দোতালা হোস্টেল ভবন তখন সমাপ্ত-প্রায়। সেই হোস্টেলের দোতালার সামনের দিকের শেষপ্রান্তে মাঠের পাশ-ঘেঁষা বড় ঘরটা আমার থাকার জন্য বরাদ্দ করা হল।

থাকার জায়গা পেয়েই তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিপাটি করার কাজ শুরু করলাম। দিনকয়েকের মধ্যে গোটা-তিরিশেক নানান জাতের বড় বড় পাতাওয়ালা গাছের টব ঘরের ভেতর লাইন করে বসিয়ে, সারা ঘরটাকে একটা ছোটখাটো উপবন করে তুললাম। তার ছায়ায় এককোণে বিছানায় শুয়ে আমার দিন কাটতে লাগল।

এই সময় বাংলা পড়ানোর একটা খণ্ডকালীন চাকরি পেয়েছিলাম প্রকৌশল

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগে, বিভাগটা তখন সদ্য খোলা হয়েছে। অধ্যাপক ড্রুম্যান তখন সেখানকার ডিন। সেই স্থাপত্য বিভাগের প্রভাবে উপবন চর্চার পাশাপাশি গ্লু আর বাঁশের ছোট চিকন ফালি দিয়ে নানারকম টাওয়ারের মডেল বানিয়ে ঘরের এককোণের একটা টেবিল প্রায় ভরে তুলেছি। হোস্টেলের ছাত্রেরা জানালার ভেতর দিয়ে আমার এইসব উদ্ভট কাণ্ডকারখানা দেখে এবং এ-ধরনের আজব উৎসাহের রহস্যভেদ করতে না পেরে নানারকম মনগড়া গল্প বানিয়ে বৈকালিক আড্ডার সময়গুলোকে জমিয়ে তুলতে লাগল। প্রতি ভোরে টবগুলোর নতুন-ফোটা ফুলের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আর ঘ্রাণের হালকা স্নিগ্ধ অনুভূতি পেতে পেতে আমার ঘুম ভাঙতে লাগল।

কলেজে সব মিলে শ্রেণী দুটো—একাদশ আর দ্বাদশ। কাজেই ক্লাসের সংখ্যা বেশি হবার উপায় নেই। দিনে সর্বোচ্চ ক্লাস নিতে হয় দুটো। এরপর কলেজে থাকা না-থাকা নিয়ে কথা বলার কেউ নেই। রাজশাহী কলেজের মতো দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে কলেজে আটকা থাকার দায় নেই এখানে। সুদূর মফস্বলের জন্যে যা প্রযোজ্য রাজধানীর জন্যে তা প্রযোজ্য হতে পারে না। রাজধানী সব দিক থেকেই কিছুটা রাজকীয়। শক্তির পাশাপাশি প্রত্যাখ্যান, বিধির পাশাপাশি বিদ্রোহের মতো সবকিছুই এখানে তুলনামূলকভাবে স্বাধীন, কিছুটা সুতো ছেড়ে দেওয়া। কাজেই এর পরবর্তী দিনের বাকি সময়টুকু একচ্ছত্রভাবে আমার। ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াও, পড়াশোনা কর, জীবনের খুশি আর উদ্দেশ্যের ভেতর যেভাবে যতক্ষণ ইচ্ছা নিজেকে ছড়িয়ে বিছিয়ে দাও, কোনো অসুবিধা নেই। যে অবাধ স্বাধীন জীবনধারার স্বপ্ন শৈশব থেকে দেখে আসছিলাম হঠাৎ করেই তা যেন স্বর্গ থেকে সামনে খসে পড়ল। ঠিক করলাম 'এখানে বাঁধিব মোর তরণী'। 'অন্য কোথা অন্য কোনো খানে'র দিন শেষ। ঠিক করলাম এখান থেকে আর কোথাও যাব না। বদলি পদোন্নতি কোনোকিছুর বিনিময়েই না। চাকরি-জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এইখানে, এই কলেজে, প্রভাষক হিসেবে কাজ করব। এর মধ্যে একসময় প্রবীণ আর পরিপক্ব হয়ে উঠলে, সর্বসম্মত সমর্থনে সরকারি কলেজ প্রভাষক সমিতির আজীবন সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের প্রবীণতম প্রভাষক হিসেবে বৃদ্ধ বয়সে অবসর নেব।

না ছাত্রদের চেয়ে বড় কিছু নেই এই মুহূর্তে। তাদের জন্যে দরকার মতো সবই করতে চাই। কিন্তু তার পাশাপাশি আমার অন্যান্য আনন্দের কাজগুলোও যেন করে যেতে পারি, এই ছিল আমার চিন্তা। সুতরাং কাজ বা দায়িত্বভারহীন এই চাকরি-জীবন আমার জীবনের ইচ্ছামতো কাজগুলো অবাধে করে যাবার জন্যে খুব সহায়ক হয়েছিল। সব অভিশাপেরই কিছু-না-কিছু ভালো দিক থাকে। আমার ধারণা আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা চিরকালই বেশকিছুটা অবক্ষয়ী। ছাত্রের পরিপূর্ণ বিকাশের দায়িত্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এ-দেশ কখনো নেয়নি। শিক্ষার উচ্চতম মানদণ্ড

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বা শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ কোনো শিক্ষায়তনে হয়ত কখনোই ছিল না। এমনি অবক্ষয়ী পরিবেশের সুযোগেই, শিক্ষকতার বাইরে, সারাজীবন নিজের খুশিমতো এতগুলো কাজের মধ্যে জড়িয়ে থাকা সম্ভব হয়েছিল আমার পক্ষে। উন্নত দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ছাত্রদের সামগ্রিক বিকাশের জন্যে শিক্ষকদের কাছ থেকে যে-পরিমাণ সময়, শ্রম, কর্তব্যনিষ্ঠা, জ্ঞানসাধনা ও আত্মোৎসর্গ প্রত্যাশা করা হয় আমাদের দেশে তা হয় না। ঐসব দেশে একজন শিক্ষকের সম্পূর্ণ জীবনটাকেই চাওয়া হয় শিক্ষকতার কাজে ব্যয় করার জন্যে। সেজন্য সেখানে একজন শিক্ষকের প্রতিদিনের প্রায় সবটুকু ফলবান বা ব্যবহারযোগ্য সময়ই ব্যয় হয়ে যায় শিক্ষক হিশেবে নিজের অবস্থানকে টিকিয়ে রাখার নানা প্রাণপণ চেষ্টায়, উদয়াস্ত শিক্ষকতার নানা প্রাণান্তকর টুকিটাকি কাজে। সন্দেহ নেই সে-ধরনের পরিস্থিতিতে পড়লে, ঐসব দেশের শিক্ষক বা পেশাজীবীদের মতো জীবনের অন্যান্য ইচ্ছাখুশিগুলোর জন্য আমার হয়ত সময় দেওয়ার কোনো উপায়ই থাকত না। কিন্তু আমাদের দেশে বিশেষ করে আমাদের দেশের সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষকের কাছে শিক্ষায়তনের এ-ধরনের কোনো দাবি না-থাকায় এটা আমার পক্ষে অত সহজে সম্ভব হয়েছিল। আমাদের দেশের শিক্ষায়তনগুলোয় একমাত্র ক্লাস নেওয়া ছাড়া, শিক্ষকের আজ আর প্রায় কোনো কাজই নেই। ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষায়তন, রাষ্ট্র, সমাজ কেউ আজ শিক্ষকের কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা করে না। এটুকু পেলেই বিদ্যায়তন আজ কৃতার্থ। কিন্তু এটুকুও যে আজ শিক্ষকেরা শিক্ষাঙ্গনকে দিচ্ছেন কি না তাও হিশেব করে দেখার অবকাশ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গাতেও শিক্ষককে ক্লাস নিতে বাধ্য করার মতো কার্যত কোনো ব্যবস্থা নেই। একজন শিক্ষক তাঁর নির্ধারিত ক্লাস নেবেন কি নেবেন না তার অনেকখানিই তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোয় সুনিয়মিত লোকসান যাওয়া বা উপজেলা বা ইউনিয়নের চিকিৎসা-কেন্দ্রগুলোতে ডাক্তার না-থাকা আজ যেমন দৈনন্দিন ও মেনে-নেওয়া ব্যাপার হয়ে গেছে, শিক্ষাঙ্গনে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কলেজগুলোর ক্লাসে শিক্ষকের না-থাকাটাও হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটা একইরকম।

সরাসরিভাবে সরকার পরিচালিত স্কুল ও কলেজ বা সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার মান যে এতটা নিচু পর্যায়ে নেমে গেছে তার কারণ একটাই : বিনিয়োগকারী হিশেবে সরকারের বেদনাদায়ক অযোগ্যতা। ভালো মানের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্যে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কলেজ-স্কুলগুলোর প্রায় যাবতীয় ব্যয় বহন করছে কিন্তু সেই মানের শিক্ষা তাদের কাছ থেকে বুঝে নেবার মতো গায়ের জোর, কর্তৃত্ব বা স্পৃহা কোনোকিছুই তার নেই। সরকারের কাছে এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর আজ কার্যত কোনো জবাবদিহিতাও নেই। এ-সব প্রতিষ্ঠানের কোনো দুর্নীতি বা অযোগ্যতার শাস্তি

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com
দেবার শক্তি যেমন সরকারের নেই, তেমনি তার হাতে নেই এমন কোনো প্রশাসনিক প্রক্রিয়া যা দিয়ে ঐ ত্রুটিগুলো সরিয়ে তুলে সবকিছু নিরাময় করা যেতে পারে। মাঝখান থেকে এরা সরকারের দেওয়া সুলভ ও বিপুল ভর্তুকির উদার অপব্যবহার করে যেতে পারছে বলে শিক্ষার মান দিনের পর দিন নিচে নামতে নামতে প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে। যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একসময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হত, এ বছর এশিয়ার প্রথম পঞ্চাশটি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় তার নাম নিচের দিকেও কোথাও নেই। দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা আরও করুণাবহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও আবর্তক—প্রায় সবরকম ব্যয় বহন করতে হয় সরকারকে। এটা এতখানিই যে এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বেতনেরও প্রায় পুরোটাই বহন করে সরকার। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় দেশে চালের দাম যখন ছিল প্রতি মণ দুটাকা, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন ছিল মাসে ১২ টাকা। অর্থাৎ একমাসের বেতন ছিল ৬ মণ চালের দামের সমান। আজ চালের মণ দুটাকা থেকে বেড়ে ৬০০ টাকা হয়েছে, সে-সময়কার ১২ টাকা হয়েছে আজকের ৭২০০ টাকার সমান কিন্তু ছাত্রদের বেতন সেই ১২ টাকাই রয়ে গেছে। আজ ১৯৯৭ সালে যখন বাংলাদেশি মুদ্রা ফেলে-দেওয়া কাগজের দরে বিকোচ্ছে সে-সময় একজন ছাত্র মাসিক মাত্র ১২ টাকা বেতন দিয়ে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। এত অল্প বেতনের বিনিময়ে কতটুকু বিদ্যা আশা করতে পারে সে তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে? শিক্ষার কোন মানদণ্ড, শিক্ষকের কোন যোগ্যতা বা তাঁদের কতটুকু মনোযোগ বা সহযোগিতা আশা করতে পারে সে? ১২ টাকা বেতন দিয়ে ৭২০০ টাকার বিদ্যা আশা করতে গেলে শিক্ষকদের বক্তব্যও তো হয়ে উঠতে পারে পুরোনো ঢাকার সেই বিখ্যাত বাড়িওয়ালারই মতো : 'ভাড়া দেন তো মোটে পাঁচ টাকা, চাল দিয়া পানি পড়ব না তো কি হরবত পড়ব?'
www.amrajaraboipori.wordpress.com
শিক্ষায়তনের এই অভিভাবকহীনতা দেশের জন্য যত বেদনাদায়কই হোক, আমার নিজের জীবনভর কাজের জন্য খুবই সহায়ক হয়েছিল। এই অবস্থা আমার সারাজীবনকে বিপুল অবসরে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন বিপুল আলস্যেভরা যে অবকাশ আর অবসরের স্বপ্ন দেখেছেন প্রায় সেই অবসর। পেশার জন্য আমাকে সত্যিকার অর্থে কোনো সময়ই দিতে হয় নি। সারাটা জীবন প্রতিদিন আমাকে ক্লাস নিতে হয়েছে গড়ে বড় জোর দুটি; তাও বছরে চার থেকে পাঁচ মাসের বেশি নয়। এমনিতেই কলেজগুলো রোজা, পূজা, গরমের ছুটির সাথে সাপ্তাহিক অন্যান্য ছুটি মিলিয়ে অকারণে বন্ধ থেকেছে ছ-মাস। এর ওপর কখনো কোনো ছুতোয় জাগ্রত ছাত্রসমাজের সংগ্রামী চেতনা তেতে উঠলে বা কোনো গণ-আন্দোলনের হাওয়া দুর্বার আবেগে বইতে শুরু করলে আরও এক-দেড় মাস ছুটির বোনাস পেয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। ফলে চাকরি করলেও আমি সারাজীবন,
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পেশাগতভাবে একজন কর্মহীন স্বাধীন ও প্রায় জবাবদিহিহীন মানুষ হিসেবে জীবন কাটিয়েছি। কেবল স্বাধীন নয়, সারাজীবন আমি প্রায় একটা বোহেমিয়ানের জীবনই যাপন করতে পেরেছি। প্রথম দিকে ষাট দশকের সাহিত্য আন্দোলনের মত্ততায় জড়িয়ে গিয়ে পত্রিকা প্রকাশের মতো অনিশ্চিত এক তীব্র হিংস্র অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করে যে-সময় পার হয়েছে তার পরিমাণ বারো বছরের কম নয়। এরপর টেলিভিশনের অনুষ্ঠান করার জন্য দশ বছরের যে একটানা সার্বক্ষণিক উৎকণ্ঠা আর শ্রম দিতে হয়েছে তাও অমানুষিক। সবশেষে গত আঠারো বছর ধরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের জন্যে দিনে গড়পড়তা যে চোদ্দ-পনের ঘণ্টা সময় দিতে হল—এত সব কি সম্ভব হত যদি সত্যি সত্যি আমাকে পুরোপুরি আত্মোৎসর্গিত ও ন্যায়নিষ্ঠ শিক্ষকের জীবন যাপন করতে হত?

আমি জীবনে যেটুকু ভালো কাজ করতে পেরেছি তার অনেকটাই শিক্ষকতার হিস্যা থেকে চুরি করে নেওয়া। আমাদের সময়কার শিক্ষাঙ্গনের অরাজকতা আমাকে এই সুযোগ দিয়েছিল। দিনে গোটা-দুই ক্লাস। তাও বছরে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় মাস। এর চেয়ে বেশি কিছু শিক্ষাঙ্গন হয়ত সতিসত্যিই আমার কাছ থেকে চায় নি, আমিও দিতে উৎসাহী হইনি। নিজে থেকে দিতে গিয়ে দেখেছি শিক্ষাঙ্গন তা নিতে চায় না। শিক্ষাঙ্গনের কায়েমি স্বার্থ ঐ গায়ে-পড়া অতি-উৎসাহকে তীক্ষ্ণ নখরে কেবলি ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে। এ-কালের সব শিক্ষককেই শিক্ষাঙ্গন এই সুযোগ দিয়েছিল। প্রায় সব শিক্ষকের জীবন আমারই মতো ছিল এমনি অফুরন্ত অবকাশে ভরা। তাঁদের অধিকাংশই অনায়াসে পেয়ে-যাওয়া এই সময়টাকে নানান অর্থপূর্ণ কাজে ব্যয় করতে পারতেন। কিন্তু অনেকেই তা করেন নি। দুর্লভ মানব-জন্মের মতো একে অযথা অপচয় করেছেন অথবা কেবল অর্থকরী প্রয়োজনে ব্যয় করেছেন। আমি এই সময়কে ব্যক্তিগত লাভের জন্যে, অলস স্বপ্নে বা উদাসীনতায় অপচয় করি নি, নানান ধরনের কাজে একে ব্যবহার করেছিলাম। শিক্ষক হিসেবে আমার যদি কোনো অপরাধ থাকে তবে তা এই।

আমার মধ্যে চারটি মূল প্রবণতা আমি দেখতে পাই : একটি বিনোদনের, একটি শিক্ষকতার, একটি লেখালেখির আর একটি সংগঠনের। সংগঠন বা লেখালেখি নিয়ে এখানে আমি কিছু বলব না। বিনোদন আমি করেছিলাম প্রধানত টেলিভিশনে, শিক্ষকতা করেছিলাম পেশাগত জীবনে আর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শিক্ষকতায়। মানুষের রক্তগত প্রবণতাগুলো বিচ্ছিন্ন বা যোগাযোগহীন অবস্থায় থাকে না। থাকে একসঙ্গে। এজন্যে আমার বিনোদন ও শিক্ষা—এর একটা অন্যটার মধ্যে এসে ঠাঁই নিয়েছিল। এতে অনেক পরস্পরবিরোধী ঘটনা ঘটেছে সারাজীবন। টেলিভিশনের দর্শকরা আমাকে বিনোদনকারী হিশেবে ভালোবেসেছিল, কিন্তু গ্রহণ করেছিল শিক্ষক হিসেবে। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ঘটেছিল উল্টো ব্যাপার। আমার কলেজের এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীরা আমার কাছ থেকে শিক্ষার কথা পেলেও তা উপভোগ করেছিল বিনোদনের কারণে। তবু একেক সময় সন্দেহ জাগে, আমার ভেতর এই দুই বিরুদ্ধ প্রবণতা শেষ অব্দি দুটোকেই ব্যর্থ করে দিয়েছিল কি না। শিক্ষা দিতে গিয়ে বিনোদন আর বিনোদন করতে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে সবকিছুকে হাস্যকর আর অবিশ্বাসযোগ্য করে ফেলেছি কি না আজীবন।

২

মুখে মুখে না চাইতে পার, কিন্তু কপালে রাজতিলক থাকলে রাজা না হয়ে কারো উপায় থাকে না। ভিড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও রাজবাড়ির হাতি রাস্তার ধার থেকে পিঠে তুলে নিয়ে সোজা বসিয়ে দেবে সিংহাসনে। আমারও হল সেই অবস্থা। মনে মনে ঠিক করেছিলাম, আর যাই করি কোনোদিন প্রশাসনিক দায়িত্বে যাব না। শিক্ষা-বিভাগের বাইরে তো নয়ই, ভেতরেও না। স্বপ্নের ভেতর সব শিক্ষকের মতো আমিও তো চিরদিন রাজা হতেই চেয়েছি, কিন্তু তা বিত্তের জগতের নয়, হৃদয়ের জগতের। ছাত্রদের মনের সেই রাজার নাম শিক্ষক, আমি সেই শিক্ষক হতেই চেয়েছি। মন্ত্রী, সান্ত্রী, সচিব, আমলা, অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষের মতো ভেদাভেদহীন কর্মচারী হিসেবে জীবন কাটাতে চাই নি। আজ আমার প্রার্থনা একটাই, যেখানে যতদিনই বেঁচে থাকি, শিক্ষক হিসেবেই যেন বাঁচি, মরতে হলেও ঐ শিক্ষক হিশেবেই।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আগেই বলেছি তেজগাঁও টেকনিক্যাল স্কুল রাতারাতি প্রমোশন পেয়ে বনে গিয়েছিল ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজ। স্কুলের সঙ্গে প্রমোশন পেয়েছিলেন হেডমাস্টারও। হয়ে গিয়েছিলেন প্রিন্সিপ্যাল। আমি যখন ঐ কলেজে যাই তখন প্রতিষ্ঠানটির গোটা শরীরটাই বড় আকারের একটা মাধ্যমিক স্কুল, মাথার জায়গাটুকুতে শুধু ছোট্ট এতটুকু একটু কলেজ।

জনাপাঁচেক তরুণ প্রভাষক আর তাদের ওপর একজন অধ্যক্ষকে নিয়ে শুরু হয়েছিল সেই কলেজের নতুন ঘরকন্না। আমি টেকনিক্যাল কলেজে যোগ দেবার মাসকয়েক পর্যন্ত সবই চলছিল ঠিকঠাক মতো। হঠাৎ ঘটল এক বিপজ্জনক ঘটনা। কলেজের অধ্যক্ষ হঠাৎ করেই বিদেশে চলে গেলেন উচ্চশিক্ষার জন্যে। তাঁর পদ খালি হয়ে গেল। তিনি বিদেশে থাকবেন দু-বছরের মতো। কী কারণে জানিনা জনশিক্ষা পরিদপ্তরেরও সিদ্ধান্ত : এই সময়ের জন্য সেখানে নতুন অধ্যক্ষ দেবেন না। কাজেই এর খেসারত দিতে হবে কোনো একজন প্রভাষককে। কলেজের

Scan & Upload by Tusin ahmed
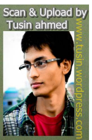
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

প্রভাষকদের মধ্যে যে প্রবীণতম তাঁকে নিতে হবে অধ্যক্ষের দায়িত্ব। প্রভাষকদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম হিসেবে যাঁকে পাওয়া গেল তাঁর বয়সও খুব একটা বেশি নয়। মেরে কেটে চব্বিশ কি পঁচিশ। ভদ্রলোকের নাম মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ। বয়সে তিনি আমাদের চেয়ে খুব একটা বড় ছিলেন না কিন্তু কেন যেন তাঁকে আমাদের চেয়ে অনেক বড় মনে হত। বড় আর যোগ্য। এমনি একধরনের আত্মবিশ্বাসী নির্ভরযোগ্য, নির্ভুল, ভালো মানুষ জীবনে আমি বেশ কয়েকজনকে দেখেছি। কোনোমতে চলে যাচ্ছিল তাঁকে দিয়েই। কিন্তু মাসকয়েক চাকরির পর তিনি একটা ভালো চাকরি (আয়কর বিভাগে) পেয়ে হঠাৎ বিদায় হয়ে গেলেন। পুরো ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজে হাহাকার পড়ে গেল। তারও চেয়ে আতঙ্কর যে-খবরটি উঠে এল তা হল, সরকারি চাকরিতে যোগদানের তারিখ ধরলে এখন কলেজের প্রভাষকদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার দিক থেকে আমিই সবচেয়ে ওপরে। সুতরাং আমাকেই এখন নিতে হবে কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব। নিরুপায় হয়ে আমি ছুটলাম ডি. পি. আই-এর কাছে। ডি. পি. আই. শামসুল হক (পরে মন্ত্রী) আমার বন্ধু খালেদ শামসের আব্বা। ওদের বাসায় যাওয়ার সুবাদে তাঁর সঙ্গে আমার মুখ-চেনা সম্পর্ক ছিল।

আশা ছিল, জোরেশোরে কাকুতি মিনতি করলে পুত্রস্নেহের কথা স্মরণ করে সহানুভূতিশীল হয়ে আমার পরবর্তী কনিষ্ঠ প্রভাষককে অধ্যক্ষের দায়িত্ব দিতে হয়ত তিনি নারাজ হবেন না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলতেই সব আশা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। কঠোর প্রশাসনিক ভাষায় কথা বললেন তিনি। আমি-যে তাঁর কাছে এমন নিয়মবিরুদ্ধ একটা প্রস্তাব উত্থাপন করার সাহস করেছি সেজন্যে প্রথমেই তিনি অপরিসীম রোষ প্রকাশ করলেন এবং উচ্চতর পদে দায়িত্ব গ্রহণের অনিচ্ছা-যে কর্মকর্তা হিসেবে অযোগ্যতারই শামিল এ-কথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে আমাকে সরকারি আনুষ্ঠানিকতাকে সম্মান দেখিয়ে অবিলম্বে দায়িত্ব বুঝে নিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি অবশ্যি আশ্বাস দিলেন যে-কোনো অসুবিধায় তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেবেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

মাত্র তেইশ বছর বয়সে আমাকে একটি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে হল। এ-ধরনের কাজের জন্যে আমার কোনোরকম মানসিক প্রস্তুতিই ছিল না। প্রশাসনিক কাজের প্রতি আমার অবজ্ঞা অপরিসীম, টাকা-পয়সার হিসাব-নিকাশ মনের ভেতরে হতাশা আর বিবমিষা জাগায়, তবু করে যেতে হয় সবকিছু। এর মধ্যেই শোনা গেল পাকিস্তানের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী কলেজ পরিদর্শনে আসছেন। 'অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি'র পদটি ফজলুল কাদের চৌধুরীর কোনো 'স্থায়ী পদ' ছিল না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে পদটিকে তিনি প্রায় স্থায়ী করে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের স্পিকার। সংবিধান অনুযায়ী এই

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পদটি রাষ্ট্রপতির পরেই। কাজেই যখনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দেশের বাইরে যেতেন তখনই তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হয়ে যেতেন এবং ঐ একদিনের বাদশাহীকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্যে, একমুহূর্ত দেরি না করে, পূর্ব পাকিস্তানে এসে প্রেসিডেন্টের সম্পূর্ণ শান-শওকতসহ সারাদেশ বিশেষ করে তাঁর এলাকা চট্টগ্রাম শহরের পরিচিত এলাকাগুলো সফর করতে শুরু করতেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে প্রেসিডেন্টসুলভ প্রতাপ দেখিয়ে তাঁর ক্ষমতার প্রতি সসম্ভ্রম করে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

তিনি কলেজ পরিদর্শনে আসার দিন, আমি কলেজের কয়েকজন প্রভাষক ও প্রবীণ শিক্ষককে নিয়ে তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে কলেজের সামনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাষ্ট্রপতিজনোচিত কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থার কারণে সারা কলেজ পুলিশ আর সামরিক বাহিনীর সদস্যে তখন গিজগিজ করছে। তিনি সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই আমি তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। ডি.পি.আই. আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফজলুল কাদের চৌধুরী ছিলেন খুবই বলিষ্ঠ, বিশালদেহী আর প্রাণবন্ত মানুষ। তাছাড়া সেদিন তিনি খুব ফুর্তিতেই ছিলেন মনে হয়। এ-ধরনের একজন কিশোরসুলভ অধ্যক্ষকে সামনে পেয়ে তাঁর দুইচোখ কৌতুকে নেচে উঠল। আমার হাত ধরে ঝাঁকি দিয়েই প্রাণোচ্ছলভাবে বলে উঠলেন, হ্যালো ইয়াং প্রিন্সিপ্যাল—বলেই হো হো হাসতে হাসতে দুই হাতে ধরে আমাকে প্রায় মাথার ওপর তুলে ফেললেন। নাবালক বয়সে অধ্যক্ষ হওয়ার শাস্তি জনসমক্ষেই পেতে হল। কিন্তু এই অপমানের প্রতিশোধ তাঁকে প্রায় হাতেনাতেই আমি দিয়েছিলাম। রঙ্গরসের ভেতর দিয়ে তাঁর সঙ্গে ভাব জমে যাওয়ায় এই প্রতিশোধের সুযোগটা এল। এক পর্যায়ে কথার প্যাঁচে রাষ্ট্রপতির তহবিল থেকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিলাম কলেজের জন্যে। টাকার ব্যাপারে তাঁর সম্মতি ঠিকমতো না নিয়েই আমি তাঁর অর্থ বরাদ্দের সদয় অনুমোদনের কথাটা সভার সামনে ঘোষণা করে দিলাম। উনি চটলেন না, হেসে বললেন, ইউ নটি প্রিন্সিপ্যাল!

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অধ্যক্ষ হিসেবে ঐ কলেজে আমাকে কাজ করতে হয়েছিল প্রায় পোনে দুই বছর। প্রশাসনের আইন-কানুন বা হিসাব-নিকাশ আমি কিছুই জানতাম না। জানার উৎসাহও ছিল না। এই মনোভাব নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হয় নি। কলেজের শিক্ষক, ছাত্র বা সাধারণ কর্মচারীরা আমাকে ভালোবাসতেন। তাই মোটামুটি সম্মানের সঙ্গে সময়টা পার করতে পেরেছিলাম। কীভাবে ভালোবাসা দিয়ে তাঁরা এই সময় আমাকে বাঁচিয়েছেন তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দেব। আমার চিরাচরিত অভ্যাসমতো একদিন আমি আমার ঘরের সিন্দুক খোলা রেখেই অফিস থেকে চলে গিয়েছিলাম। সিন্দুকে তখন বারো হাজার টাকা ছিল। ব্যাপারটা হঠাৎ করেই কলেজের একজন

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পিয়নের চোখে পড়ে যায়। তার নাম জালাল। বারো হাজার টাকা আজকের হিসেবে অনেক টাকা, অন্তত আড়াই লাখ। সেদিন সে সেই টাকাগুলো নিয়ে নিলেও কেউ তা জানতে পারত না। কিন্তু সে চটজলদি সিন্দুকের দরজা বন্ধ করে ঘরে তালা দিয়ে ছুটতে ছুটতে হোস্টেলে গিয়ে আমাকে খবরটা পৌঁছে দেয়। আমি একটা বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে বেঁচে যাই। সেই সময়কার ঐ কলেজের সবার কথা আজও আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

৩

অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেবার দিনকয়েকের মধ্যেই আমাকে পড়তে হল এক বিশ্রী ধরনের ঘটনার সামনে। তখন মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। কলেজের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি শুরু হয়েছে। আমাদের এ কলেজে ভর্তির জন্য ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কমপক্ষে ৬০০ নম্বর পেতে হত। এটা ছিল প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। এই সময় এক ভদ্রলোক তাঁর এক ছেলেকে ভর্তি করার ব্যাপারে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভদ্রলোক বিস্তর পয়সার মালিক। তিনি আমার কামরায় ঢুকতেই আমাদের স্কুলের জনকয়েক শিক্ষকও হুড়মুড় করে তাঁর পেছনে পেছনে এসে ঢুকলেন। শিক্ষকদের একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং বাকি শিক্ষকেরা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে তিনি যে কত অর্থশালী আর ক্ষমতাবান সে-ব্যাপারে আমাকে জ্ঞান দিতে শুরু করলেন। ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে কলেজে ভর্তি করে নেবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

বললাম, 'অসুবিধা কোথায়?'

ছেলেকে সাথে করেই এসেছিলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'দু-নম্বর কম আছে। মোট নম্বর পাঁচশো আটানব্বই।'

বললাম, 'তাহলে কী করে নেব!'

ভদ্রলোক বললেন, 'মাত্র দু-নম্বরেরই তো ব্যাপার!'

বললাম, 'দু-নম্বর স্ল্যাক করলে তো আরও পঞ্চাশ জনকে নিতে হবে। মোট সিটের সংখ্যাও তো এর চেয়ে কম।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তাহলে স্পেশাল কেস হিসেবে নিন।'

বললাম, 'ওকে নাহয় নিলাম। কিন্তু সমান নম্বর পাওয়া অন্যদের বাদ দেব কোন্ যুক্তিতে?'

ভদ্রলোক কথা বাড়াতে চাইলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, 'তাহলে নেবেন না?'

'আপনিই বলুন কী করে নিই?'

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

'কী করে নেবেন সেটা আপনি বুঝবেন। কিন্তু নিতে হবে আপনাকে।' তাঁর গলার স্বর এমন যে মনে হয় নিজের কোনো অধঃস্তন কর্মচারীকে ধমকাচ্ছেন।

আমি বিনয়ের সঙ্গে দ্বিতীয়বার তাঁকে আমার অপারগতার কথা জানালে, উনি বললেন, 'বেশ, দেখা যাবে কী করে ভর্তি না করেন।' বলে সবার সামনে দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

অপমানে আত্মগ্লানিতে নিজেকে একটা ক্লেদাক্ত জন্তুর মতো মনে হতে লাগল।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর তিনি কতখানি অর্থশালী আর ক্ষমতাবান এবং ভর্তি না-করা হলে তিনি কী ধরনের ক্ষতি করতে পারেন সে-ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ঘরের ভেতরে আসা শিক্ষকেরা প্রায় গায়ে পড়ে আমাকে তার ফিরিস্তি দিতে শুরু করলেন।

তাঁদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে ভদ্রলোকের চেহারাটা চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল। গরিলার মতো আত্মবিশ্বাসী, অদমিত আর বেয়াড়া রকমে স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক। মরণপণ যুদ্ধে ভাগ্যকে হারিয়ে যে-সব মানুষ নিজেদের উদ্যম তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর অটল মনোবলের কারণে সেই ষাটের দশকে অঢেল পয়সার মালিক হতে শুরু করেছেন সেইসব উঠতি মানুষদের তিনি একজন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ছেলেকে এই কলেজে ভর্তি করা তাঁর মর্যাদার জন্যে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল। ফল ফলতে দেরি হল না। পরের দিনই শিক্ষা-বিভাগের এমন একজন বড় কর্তার কাছ থেকে এ-ব্যাপারে ফোন পেলাম যাঁর কাছ থেকে তা পাবার প্রত্যাশা আমার ছিল না। স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যের সঙ্গে তিনি জানতে চাইলেন কোনোভাবে ছেলেটাকে ভর্তি করে নেয়া যায় কিনা। তাঁর কথায় মন তেতো হয়ে উঠল। বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'নতুন দায়িত্ব নিয়েছি স্যার। এ-ধরনের ব্যাপার এখন করা কি ঠিক হবে?'

তিনি সুবিবেচক মানুষ, কথার আওয়াজে পরিস্থিতি আঁচ করে ফোন রেখে দিলেন।

তাঁকে পার করে ভেবেছিলাম ঝামেলা চুকল। কিন্তু দিন-তিনেক পর ফোন এল প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকারের কাছ থেকে।

স্পিকার আব্দুল হামিদ চৌধুরী বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বাবা। তিনিও অত্যন্ত মিষ্টি স্বভাবের মানুষ ছিলেন। বললেন, 'দু-নম্বরেরই তো ব্যাপার। নিলে কি খুব অসুবিধা হবে?'

আব্দুল হামিদ চৌধুরীর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল। পরিচয়ের রেশ ধরে তাঁকে বললাম, আপনি বললে আমি নিয়ে নেব। কিন্তু অন্তত পাঁচশো লোকের কাছে আমাকে এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলতে হবে। আপনি সবার শ্রদ্ধেয়। আপনার অসম্মান হবে।

আব্দুল হামিদ চৌধুরী কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, 'ঠিক আছে। থাক তাহলে।' বলে ফোন রেখে দিলেন।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

দু-তিন দিন গেল না, ফোন পেলাম শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে। এবার আর অনুরোধ নয়। সরাসরি আদেশ : 'নিয়ে নিন ছেলেটাকে।'

আমি মন্ত্রীকে বুঝিয়ে বললাম, ছেলেটাকে ভর্তি করতে হলে ভর্তির নীতিমালাকে অস্বীকার করতে হয়।

'আইন মেনে সব সময় সবকিছু করা যায় না', ওধার থেকে উত্তর এল।

বললাম, 'আপনি বললে আমি অবশ্যই করব। আপনি ওর দরখাস্তের ওপর আমাকে লিখিত নির্দেশ দিন।'

মন্ত্রী মফিজউদ্দিন সাহেব ব্রিটিশ আমলের মানুষ, সেজন্যই কিনা জানি না, ঐ লিখিত আদেশের কথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন।

কিন্তু ভদ্রলোক এলেন। সবকিছু ব্যর্থ দেখে ভয়ংকর চেহারা নিয়ে ছেলেসহ আমার কামরায় এসে দাঁড়ালেন একদিন।

আমার বসার অনুরোধ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ধমকের স্বরে বললেন, 'জানেন আপনার মতো একশোটা মাস্টারকে আমি কিনতে পারি—'

ধমকটা সহ্যশক্তির বাইরে চলে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনি কি জানেন, আপনার মতো একশোটা অশিক্ষিতকে আমি লেখাপড়া শেখাতে পারি?'

আমি জানতাম আমাদের দুজনের কারো পক্ষেই নিজ নিজ দাবি বাস্তবায়নের ক্ষমতা ছিল না। সম্মানের সংকটে পড়েই আমরা এই কথাগুলো বলেছিলাম। ভদ্রলোক রাগে প্রায় সম্বিত হারিয়ে ফেললেন। শান্তগলায় আমি তাকে থামতে বললাম।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমার উত্তরের জন্য ভদ্রলোক তৈরি ছিলেন না। হঠাৎ প্রচণ্ড ঘা খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক হয়ে গেলেন। নিজেকে খানিকটা শান্ত করে নিয়ে বললাম, 'আপনি আমার মতো কতজন শিক্ষককে টাকা দিয়ে কিনতে পারেন জানি না। কিন্তু যে-ছেলের জন্য আপনি এতসব করতে চাচ্ছেন তাকে স্বচ্ছন্দে বাড়িতে ফেরত নিয়ে যেতে পারেন। ওর লেখাপড়া হওয়ার কোনো কারণ নেই। যে ছাত্র একবার জানতে পারে তার শিক্ষকেরা তার বাবার টাকায় কেনা চাকর, সে কখনো মানুষ হয় না।'

সেদিন শিক্ষকসত্তার অহংকারে গলা উঁচু করে তাঁকে কথাগুলো বলেছিলাম কিন্তু আজ পেছনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আমার নয়, সারাদেশে সবখানে তার দম্ভই তো আজ জয়ী হয়েছে। জাতির শিক্ষকেরা আজ ছাত্রদের বাবার পয়সায় কেনা ব্যক্তিগত ভৃত্যের কাতারে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন। হায় শিক্ষকতা! যে-শিক্ষাকে একদিন জীবনের সর্বোচ্চ বৈভব ভেবে অন্ধের মতো সেদিকে ছুটে গিয়েছিলাম, আজ তা কেবলই একটা আর্থিক লেনদেনের ব্যাপার, কেবলি একটা ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক।

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

জাতীয় জীবনের অবক্ষয়

১

ঘটনাটা ষাট দশকের গোড়ার দিকের। ষাটের দশকের কথাটা বললাম একটা বিশেষ কারণে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলেও আমাদের সমাজে বিত্তের বিকাশ শুরু হয় এই দশকে। একালের কাঁচা পয়সায় ফুলে-ওঠা আমাদের দেশের আজকের নব্য-ধনপতিদের যাত্রা এই দশক থেকেই। ষাটের দশকের আগে এই দুর্বিনীত ও অদমিত বাবুরাম বাবুরা আমাদের সমাজে ছিল না। ঐ সময় থেকে আজ অব্দি আমাদের সমাজের এই বিত্ত অবারিতভাবে কেবল বেড়েই চলেছে।

আমাদের দেশে বিত্তর প্রথম বিকাশ শুরু হয় ষাটের দশকের আইয়ুবি আমল থেকে। পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান জাতির সামনে তাঁর অশুভ ভাবমূর্তিকে প্রিয়তা দেবার চেষ্টায় বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে দেশের সমৃদ্ধি ঘটানোর পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন এই দশকের শুরুতে। তাঁর এই উদ্যোগের ফলে এই সময় প্রথমবারের মতো আমাদের সমাজ-জীবনের বন্দরে বিপুল অবাধ বৈদেশিক মুদ্রা এসে ভিড়তে শুরু করে। এই চালানের বড় অংশটা পশ্চিম পাকিস্তান পেত ঠিকই কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যে ছিটেফোঁটা যা এসে পড়ত তাও এই জাতির সে-কালের জীবনে ছিল অভাবিত। এই জাতির জীবনে বিত্তের পদপাত এর আগে এভাবে আর কখনো ঘটেনি। কাঁচা পয়সার এই অতর্কিত আগমনে সারাটা দেশ যেন নড়েচড়ে উঠে বসল। সম্ভাবনার অনেক অপরিচিত দরোজা খুলে যাওয়ায় নতুন আশায় উজ্জীবিত সমস্ত জাতি এই বিপুল বৈষয়িক সুযোগের ওপর দিগ্বিদিকহীনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গোটা ষাটের দশক এই নতুন-পাওয়া বিত্তের আস্বাদে ও উত্তেজনায়, রোমাঞ্চে ও শিহরণে সচকিত ও স্পন্দমান। ষাটের দশকের সূচনা থেকে আমাদের দেশে যে নব্য ধনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব শুরু হয়েছিল সেই বিকাশমান শক্তি নিজেদের আত্মপ্রসারের স্বার্থে, এক দশক যেতে-না-যেতেই, অপ্রতিহত ও অদমিত নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়ে নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় বিকাশের এই সম্ভাবনাকে একটা স্থায়ী ও সার্বিক রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। তাদের সেই অগ্রযাত্রার নদী আজকের মোহনার বিপুল পরিসরে

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এসে প্রায় সমুদ্রের বিশালতাকে ধারণ করছে। বিত্তের এই নবাস্বাদিত জয়োল্লাসে সারা ষাটের দশক উচ্চকিত ছিল। এই দশকের রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্পের মতো জাতীয় জীবনের প্রতিটা অঙ্গন উদ্দীপনার এই সজীব ও রক্তিম জীবনস্পন্দনে ছিল উন্মুখর। বস্তুত বহু বহু শতাব্দীর পদানত, একঘেয়ে, প্রাণহীন, বন্ধ্যা ও ঊষর অধ্যায় পেরিয়ে এই ষাটের দশকেই আমাদের জাতীয় জীবন নতুন সম্ভাবনা ও উদ্ভাবনের আগ্রহে জেগে ওঠে প্রথমবারের মতো। ষাটের দশক থেকে আধুনিক বাংলাদেশের শুরু। ষাটের আগের বাংলাদেশ আর ষাট-পরবর্তী বাংলাদেশ প্রায় পুরো আলাদা।

ষাটের দশক আমাদের জাতির জীবনে প্রথম অর্থপূর্ণ সুযোগের কাল। এই দশকের শুরু থেকেই আমাদের দেশের বিত্ত, পুঁজি, ব্যবসা, বাণিজ্য থেকে শুরু করে শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য—এককথায় আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি আলাদা প্রদীপ দেশের প্রতিটি সম্ভাব্য চত্বরে একে একে জ্বলে উঠতে শুরু করে। জাতীয় জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রের এই অভূতপূর্ব জেগে-ওঠার শব্দ, দেশের প্রতিটা সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যায়। আমি বলছি না এই উন্নয়ন আজ অব্দি কোনো অর্থপূর্ণ বা বলীয়ান সফলতাকে ছুঁয়েছে। আমার বক্তব্য, পরবর্তী চার দশক ধরে এই জাতির জীবনের নানান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্যম বহুরকম সংঘাত ও সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যে-সমৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয়ে চলেছে, যত অস্ফুট ও প্রাথমিকভাবেই হোক-না কেন, এর আসল সূচনা এই সময় থেকেই। জাতীয় জীবনের এই অভাবিত বিকাশ ধারার পাশাপাশি এই সময় সমাজজীবনে দেখা দেয় আরেকটি উপসর্গ। ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে এই সমৃদ্ধির পুরোপুরি বিরুদ্ধ চরিত্রের। বিষয়টা বস্তুজাগতিক নয়, আত্মজাগতিক। তা হল সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। অবক্ষয় : ব্যাপক, গভীর, চক্ষুহীন ও সর্বগ্রাসী। এত সর্বগ্রাসী যে সেই কথিত জাতীয় উজ্জীবন এই অবক্ষয়ের অশুভ কালো বিশাল পাখার নিচে আজও উদ্ধারহীন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। সারাজাতির যাবতীয় সমৃদ্ধি-পিপাসা আজও এই পতনের পায়ের কাছে বেদনাদায়কভাবে অশ্রুপাতরত।

এই পতন কেন ঘটল ভেবে বের করা দুরূহ নয়। বিশ শতকের সূচনা থেকে শুরু করে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত আমাদের দেশে যে ছোট্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়টি ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল তার আকার ছিল একেবারেই সীমিত। দেশের ভেতর যে অল্পবিস্তর সুযোগ-সুবিধা কদাচিত সম্ভাবনার মুখ দেখিয়ে চকিতে মিলিয়ে যেত, তার মূল ভোক্তা বা প্রাপক ছিল মোটামুটি এঁরাই। এইসব টুকিটাকি সুবিধার অল্প অংশই এদের হাত গলিয়ে দেশের ব্যাপক জনমানুষের হাতে পৌঁছানোর সুযোগ পেত।

দেশের ছোট-বড় শহরগুলোকে কেন্দ্র করে সীমিত স্বপ্ন ও সুযোগের ভেতর

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বেড়ে-ওঠা এই মধ্যবিত্তের চেহারা ছিল মোটামুটি শান্ত, সুস্থিত ও আত্মসন্তুষ্ট। ব্রিটিশ আমলের দীর্ঘ-পরিবর্তনহীন, নিস্তরঙ্গ ও সনাতন আবহাওয়ায় লালিত হবার ফলে এরা একধরনের সুশীল ও চিরায়ত মূল্যবোধে যেমন ছিল জাগ্রত তেমনি নিজেদের ভঙ্গুর ও পরজীবী অস্তিত্বের কারণে ভেতরে ভেতরে ছিল মেরুদণ্ডহীন।

ষাটের দশকের সূচনায় বিত্তের এই অপ্রত্যাশিত পদপাত আমাদের সামাজিক জীবনের পুরো পরিস্থিতিটাকে ওলটপালট করে দেয়। স্বাধীনতার পর বিত্তের এই সুযোগের পরিমাণ ও বিস্তৃতি হয়ে ওঠে লক্ষকোটি গুণ। এই পুঁজি উল্লেখিত মধ্যবিত্তের সম্ভাবনাময় চোখের সামনে কোটি কোটি সুযোগের লুব্ধ দরজা উন্মোচিত করে দিতে শুরু করে। সুযোগ—অপ্রতিহত, গণনাহীন দুর্বার—সমস্ত সামাজিক চত্বরকে উচ্চকিত করে তোলে। টাকাই হোক, সম্ভাবনাই হোক, স্বপ্নের কাম্য গোলাপই হোক—উড়ে বেড়াচ্ছে বাতাসে। কেবল শক্তি আর সাহস থাকলেই যে-কেউ তা ছিনিয়ে নিতে পারে, কেড়ে নিতে পারে। এও একধরনের গোল্ড রাশ। না, মালিকানা নেই কোনোকিছুর। অনর্জিত সুলভ মালিকহীন বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অনুষ্ঠিত এই লুণ্ঠন, দরিদ্র জনগণের জন্যে আসা ভিক্ষা-লুঠ চলতে থাকে অপ্রতিহত উল্লাসের সঙ্গে। এই দস্যুদের বাধা দেবার কেউ ছিল না। এই লুণ্ঠনের সুযোগ শেষ পর্যন্ত কেবল মধ্যবিত্তের মধ্যেও আর সীমাবদ্ধ থাকে নি, ঐ গণ্ডী ছাপিয়ে তা আপামর জনসাধারণের ভেতর তথা সারাজাতির ভেতর একসময় চারিয়ে গেছে। আপামর জাতি নির্বিচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এর ওপর। অনাদিকাল থেকে অনাহারী উপবাসক্লিষ্ট খাদ্য-স্বাস্থ্য-বাসস্থানহীন একটি দরিদ্র জাতি হিংস্র লুব্ধভাবে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যের মতো এই অপ্রতাশিত বিশাল সুযোগ-যজ্ঞের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ন্যায়নীতি মূল্যবোধ, আদর্শ কিছুরই দরকার নেই। প্রয়োজনও নেই। ওসব থাকাটাই বরং অযোগ্যতা, মূঢ়তা। লুণ্ঠনের অবাধ লুব্ধ পৃথিবী পড়ে আছে সামনে। শক্তি, উদ্যম, বুদ্ধি, বা বর্বরতা দিয়ে যে যা ছিনিয়ে বা কেড়ে নিতে পারবে তা তারই সাতপুরুষের সম্পদ।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

লুণ্ঠনের সে-যুগে, ঐ ধরনের বোধশক্তিবর্জিত, স্থূল ও পাশবিক আক্রমণের সামনে সম্পন্ন মানবিক মূল্যবোধের টিকে থাকার কথা নয়। আমাদের দেশে তা থাকেও নি। আমাদের দেশের ছোট্ট মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়টি যে সুস্থিত, সুশীল মূল্যবোধের ধারাকে দীর্ঘকাল ধরে সমুন্নত রেখে আসছিল তা এই সর্বাত্মক লুণ্ঠনের উচ্ছ্রিত অন্ধ জলোচ্ছ্বাসের মুখে প্রায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জাতির এই অনিয়ন্ত্রিত দ্রুত বিপুল সমৃদ্ধিই এই জাতির আজকের বহু আক্ষেপিত মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মূল কারণ।

গত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে যাকে আমরা সমাজ-জীবনের অবক্ষয় বলে চিহ্নিত করে আসছি, তার আসল উৎস আমার ধারণা, এটাই।

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কিছুক্ষণ আগে আমার গল্পে আমি যে-মানুষটির কথা তুলে ধরেছি তিনি আমাদের জাতির এই লুণ্ঠন-যুগের প্রথম মানুষদের একজন। অন্যের অধিকারকে বাহুবলে কেড়ে নিতে চাওয়া বোধশক্তিবর্জিত একজন আকর্ষিত মানুষ। আধুনিক বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের একজন অদমিত প্রতিনিধি। ঐ সময়কার বিত্তের অগ্রযাত্রা এবং নৈতিক অধঃপতনের চিত্র তিনি দুই হাতে ধারণ করে আছেন। এইসব শক্তিমান অদমিত জাতীয় লুণ্ঠনকারীতে আজ বাংলাদেশ আকীর্ণ।

২

আজকের পৃথিবীর প্রায় সব উন্নয়নশীল দেশের বিত্তের সমৃদ্ধি এবং নৈতিক অধঃপতনের চিত্র মোটামুটি এমনি। তবে এটিই আমাদের আজকের জাতীয় অবক্ষয়ের একমাত্র কারণ নয়। আমাদের দেশে আর-একটি কারণে এই অবক্ষয় আরও এক গভীর বিশাল ও আত্মঘাতী হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেটি হল : দীর্ঘ তিরিশ বছরের একটানা সামরিক শাসন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৯০ এই বত্রিশ বছর আমাদের জাতির জীবনে একনায়কতন্ত্রের যুগ, এরমধ্যে ১৯৭২ থেকে ৭৫ ছাড়া বাকি সময়টা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামরিক একনায়কতন্ত্রের। গণতন্ত্রের সঙ্গে একনায়কতন্ত্রের একটা জায়গায় বড় ধরনের একটা পার্থক্য আছে। গণতন্ত্র নিজের অসম্পূর্ণতা এবং অসহায়তা সম্বন্ধে সজাগ, সসংকোচ এবং বিনীত। সে জানে একটা বিশাল জাতির বিচিত্র, জটিল, সুবিশাল ও অন্তহীন সমস্যাকে এককভাবে সমাধান করা তার ক্ষমতার বাইরে। তাই সে তা সমাধানের জন্য মিলিতভাবে সবকিছু করতে চায়। এইজন্যে মিলনের মধ্যেই গণতন্ত্রের সম্পূর্ণতা। তাই সেখানে বিরোধীদল কেবল সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত নয়, জাতি পরিচালনার অনিবার্য অংশ হিসেবে শ্রদ্ধেয়, এমনকি ক্ষমতাপ্রাপ্ত। জাতির কল্যাণ কামনা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত বলে প্রতিটি মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপকে গণতন্ত্র প্রশ্ন করে, দেশের কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে তার যৌক্তিকতার হিসাব চায়। এজন্যে গণতন্ত্রে জবাবদিহিতার ব্যাপারটি এত গুরুত্বপূর্ণ।

একনায়কতন্ত্রের বক্তব্য আলাদা। সে মনে করে একাই তার পক্ষে সব পারা সম্ভব। কাউকে তার দরকার নেই। নিজের অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা থেকে তার এটা মনে হয়। তাই একনায়কতন্ত্রে কোনোরকমের বিরোধিতা অবাঞ্ছিত কেবল নয়, পুরোপুরি নিষিদ্ধ। নিজেদের ভাগ্য নির্মাণের দায় থেকে জাতির আপামর মানুষকে অব্যাহতি দিয়ে তা সীমিত করে ফেলা হয় একটি শ্রেণী বা দলের গুটিকয় মানুষের ছোট্ট একটি সঙ্ঘের হাতে। ফলে দুর্বৃত্তরা তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। তার জবাবদিহির দায়িত্ব চলে যায়

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

শুধুমাত্র প্রশাসন-যন্ত্রের কাছে। এই প্রশাসনব্যবস্থা একটি যন্ত্র বলে এবং আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে তা খুবই অযোগ্য ধরনের বলে, তার চোখ এড়িয়ে কোনো ব্যক্তির পক্ষে নিরন্তর অপরাধ করে যাওয়া অনেক সময়ই দুরূহ হয় না।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সবরকম একনায়কতন্ত্রের ভেতর সামরিক একনায়কতন্ত্রই সম্ভবত সবচেয়ে অসহায়। অস্ত্রের জোরে জনগণের হক সে কেড়ে নেয় বলে সে সবসময়ই দেশের বিপুল বৈরী জনগণের দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকে। গণবিরোধিতার এই বিপদ তার নিজের কাছেও অস্পষ্ট নয়। সেই কারণেই নিজের অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রতিমুহূর্তে তাকে কাল কাটাতে হয় বিপন্ন ও আতঙ্কিত অবস্থায়। তাই কাউকে মুহূর্তের জন্যেও সে বিশ্বাস করতে পারে না। তাছাড়া সামরিক অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে উঠে আসতে হয় বলে তার সারা অবয়বে রক্ত আর অবৈধতার একধরনের অকর্ষিত ছাপ থেকে যায়। এই অবৈধতাকে বৈধ করার চেষ্টায় তাই তাকে দেশের ভেতরকার প্রতিটি শক্তিকে সুনিয়মিতভাবে ছাড় ও সুবিধা দিয়ে যেতে হয়। তাকে হয়ে উঠতে হয় রাষ্ট্রের প্রধান উৎকোচদাতা। লোভনীয় উপঢৌকনে ভেতরের ও বাইরের সবাইকে প্রীত ও বশীভূত করার সাফল্যের ওপরেই তার স্থায়িত্ব। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রে কিছুসংখ্যক স্থূল ও ক্ষমতাবান মানুষ জনগণের ভাগ্য লুণ্ঠনের অপ্রতিহত সুযোগ পেয়ে বসে। রাষ্ট্রের রক্ষকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত এই লুণ্ঠন হয়ে পড়ে পুরোপুরি সর্বগ্রাসী এবং নীতিবোধহীন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

রাষ্ট্রের অভিভাবকদের কাছ থেকে ন্যায়, আদর্শ, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির পরিবর্তে তাদের হাতে এই সময় জাতির যে-দুঃখজনক দুর্গতি চলতে থাকে, জনগণের নাগরিক অধিকার যেভাবে লঙ্ঘিত ও নিষ্পেষিত হতে থাকে তাতে একসময় তারা স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানের পথে সামরিক একনায়কতন্ত্রের পতন ঘটাতে বাধ্য হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে হয়েছিলও তাই। কিন্তু অল্পকিছু লোককে দিয়ে সারাজাতির ভাগ্য লুণ্ঠন করানোর ফলশ্রুতিতে এই জাতির সবার মধ্যে যে-নিরাপত্তাহীনতা, বিশৃঙ্খলতা, সংশয় ও নৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল, রাজনীতি-অর্থনীতি-সামাজিক ক্ষেত্রের সেই মূল্যবোধের অবক্ষয় চুঁয়ে চুঁয়ে জাতীয় জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে চারিয়ে গিয়েছিল। শিক্ষাঙ্গনও এই থেকে বাইরে থাকতে পারে নি।

কী করে গত পঁয়ত্রিশ বছরে আমাদের জাতীয় জীবনে জমজমাট বিত্তশালিতার পাশাপাশি রুগ্‌ণ অবক্ষয় প্রকট থেকে প্রকটতর হয়েছে, তার মূল দুটো কারণ সংক্ষেপে তুলে ধরলাম। এই কারণদুটো জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাঙ্গনকেও অবক্ষয়ী করে নিঃস্বতার শেষপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। বৈষয়িক সমৃদ্ধির হাত ধরে গত তিন দশকে কলকারখানা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি এদেশে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

Scan & Upload by Tusin ahmed

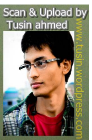

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এগুলোতে ঠাঁই পেয়ে শিক্ষা এমনকি উচ্চশিক্ষার দরজায় পা রাখার সুযোগ পেয়েছে। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগের তুলনায় আজকের বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনের আয়তন বহুগুণ বেড়েছে। এতসব উন্নতির পরেও শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানগুলো জাতিকে আসলে কিছুই প্রায় দেয় নি। এগুলোর সংখ্যা ও বাইরের জাঁকজমকের আড়াল দিয়ে এগুলো থেকে হারিয়ে গেছে শিক্ষার উচ্চায়ত আদর্শ ও মূল্যবোধ, শিক্ষালয়সুলভ সুশীল পরিবেশ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপহীন স্বাধীন ও মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা, যোগ্য শিক্ষক ও নিবিষ্ট ছাত্র। আমার ধারণা আমি ইতিমধ্যেই আমাদের সমাজের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও এর অবক্ষয়ের তত্ত্ব নিয়ে পাঠকদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছি, তাই কোন্ কোন্ পথ ধরে শিক্ষাঙ্গন এভাবে অবক্ষয়ী হয়ে পড়েছিল তার অভিসন্দর্ভমার্কা আলোচনা তুলে আর সবার ধৈর্যচ্যুতি করতে চাই না। আমি এ-প্রসঙ্গের আপাতত ইতি টানব ঐ নব্য ধনপতির কথা শেষবারের মতো উল্লেখ করে। যাটের দশকের শুরু থেকেই, হঠাৎ ফুলে-ফেঁপে ওঠা দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধি, স্থূল অকর্ষিত আবেগে জেগে উঠে সেকালের আত্মসন্তুষ্ট ও সুস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধীন সত্তার ওপর কীভাবে আক্রমণ চালাতে শুরু করেছিল তা বোঝাবার জন্যেই গল্পটাকে এত গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছি। ষাটের দশকের আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর বহিরাগতের এই ধরনের অবাঞ্ছিত হামলা ছিল একেবারেই কম।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৩

এদেশের ছাত্রসমাজের অবক্ষয়ের ইতিহাসও ঐ দশকের ঐ ঘটনাদুটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ছাত্র সমাজের অবক্ষয়ের চেহারা দেখার প্রথম বড় সুযোগ আমি পেয়ে যাই ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেবার কিছুদিনের মধ্যেই। ঘটনাটা ১৯৬৩ সালের মে-জুন মাসের। তখন অন্য সব কলেজের মতো ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র হিশেবে কাজ করছে। ঐ বছরের আগে পর্যন্ত, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রত্যেক কলেজের ছাত্রেরা নিজ নিজ কলেজেই তাদের নিজেদের পরীক্ষা দিত। কাজেই সুষ্ঠু পরীক্ষা চালিয়ে যেতে শিক্ষকদের অসুবিধা হত না। কিন্তু বছর কয় ধরে দেশের কয়েকটি চিহ্নিত কলেজে নকলের প্রবণতা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঐবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, কোনো কলেজের ছাত্ররাই আর নিজেদের পরীক্ষা নিজেদের কলেজে দিতে পারবে না। তাদের পরীক্ষা দিতে হবে অন্য কলেজে গিয়ে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের আশা ছিল ভিন্ন কলেজে প্রশ্রয়-বর্জিত নিয়ন্ত্রণের ভেতর পরীক্ষা হলে দুর্নীতি আশাব্যঞ্জকভাবে কমে আসবে। কাজেই আগের

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বছরের মতো সেবারও ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে আমাদের ছাত্রেরা পরীক্ষা দিতে যাবে অন্য কলেজের পরীক্ষা-কেন্দ্রে, অন্য কলেজের ছাত্রেরা আসবে আমাদের কলেজে।

দেখতে দেখতে পরীক্ষার নির্ধারিত সময় এগিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু পরীক্ষার মাসখানেক আগে দুয়েকজন ভগ্নদূতের মুখে গুজব হিশেবে এমন একটা উদ্বেগজনক খবর আমাদের কানে এসে পৌঁছোতে লাগল যা শুনে ভয়ে আমাদের বুক শুকিয়ে গেল। কয়েকদিনের মধ্যে শিক্ষা বোর্ডের চিঠি থেকে খবরটার সত্যতা মিলল। খবরটা আতঙ্ককর। কায়দে আজম কলেজের (এখনকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ) সিট পড়েছে আমাদের কেন্দ্রে। তারা এখানে পরীক্ষা দিতে আসছে। কায়দে আজম কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে ঢাকার আশেপাশের ছোটখাটো দুয়েকটা কলেজের গুটিকয় ছাত্রও অবশ্য আসবে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম। অকারণে আমরা ভয় পাই নি। সে-সময় সারা পূর্ব পাকিস্তানে বিশৃঙ্খলতা সন্ত্রাস, নকল—এসবের জন্য যে-দুটো কলেজ সবিশেষ প্রসিদ্ধি পেয়েছিল, কায়দে আজম কলেজ ছিল একটি। অন্যটি জগন্নাথ কলেজ। দুটি কলেজই বেসরকারি। কলেজ দুটোয় ছাত্রসংখ্যা যে-পরিমাণে বিপুল সে-পরিমাণে সেগুলোতে উচ্ছৃঙ্খল আর দুষ্কৃতকারী ছাত্রের ভিড়। এই বিপুল আর অরাজক ছাত্রসম্প্রদায়ের ওপর কলেজ-কর্তৃপক্ষের প্রায় কোনো নিয়ন্ত্রণই ছিল না। হয়ত নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহও ছিল না। বেশি ছাত্র ভর্তি হলে বেশি বেতন উঠবে, কলেজের সচ্ছলতা বাড়বে, এতেই তাঁরা খুশি। ছাত্রসমাজ পরিচালিত হত মূলত সন্ত্রাসী ছাত্রনেতাদের নির্দেশে। আজকে সারাদেশের প্রতিটি কলেজের যে অরাজক অবস্থা, সে-সময় পর্যন্ত দেশের ঐ কলেজ দুটোই ছিল কেবল সে-রকম।

দেশের বাকি কলেজগুলো ছিল মোটামুটি শান্ত—এদের তুলনায় একেবারেই নিরীহ ও গোবেচারা। সেগুলোতে কোথাও কোথাও সামান্য সমস্যা থাকলেও তার পরিমাণ ছিল অণুবীক্ষণিক। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম বিশেষভাবে এই ভেবে যে নিজেদের কলেজ-কেন্দ্রে এতকাল প্রকাশ্যে বই খুলে যারা বেধড়ক নকল করতে অভ্যস্ত হয়ে আছে, এখানেও সন্ত্রাস করে তারা হয়ত তাই করতে চেষ্টা করবে। এটা তাদের দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত অধিকার ও ঐতিহ্য। এতে কেউ বাদ সাধলে তাকে তারা ছেড়ে দেবে, এমন আশা করা উচিত নয়। কেন যে বোর্ড কর্তৃপক্ষ আমাদের ওপর এই মর্মান্তিক পরীক্ষা চাপিয়ে দিলেন তা ভাবতে গিয়েও আমরা ঘেমে উঠলাম। হয়ত তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন শহরের একপ্রান্তের একটি অপরিচিত কলেজের নিরিবিলি কোণে যদি চুপেচাপে নকলের কিছু দৌরাত্ম্য চলেও তবু তা থেকে যাবে জনদৃষ্টির বাইরে, কেউ এ নিয়ে পত্রিকায় শোরগোল তুলবে না। দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা নিতে পারার জন্যে বোর্ডের চেষ্টা প্রশংসিত হবে। ঢাকা কলেজ বা নটরডেম কলেজে নকলের কোনো সুবিধা ছিল না। ওগুলোতে পরীক্ষাব্যবস্থা ছিল

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com
খুবই কঠোর। তাই ঐসব কলেজে কায়দে আজম কলেজের সিট ফেলা হয়নি, ফেলা হয়েছে আমাদের মতো সহায় সম্বলহীন একটা কলেজের ঘাড়ে যার এসব কাজে বাধা দেওয়ার কোনো শক্তিই প্রায় নেই। খবরটায় কলেজের সবাই আঁতকে উঠল। বিশাল আকারের কায়েদে আজম কলেজের ছাত্রেরা তখন ঢাকা শহরের ত্রাস, যেমন অরাজক তেমনি দুর্দান্ত।

শিক্ষকমণ্ডলীর সভায় আমরা ঠিক করলাম সন্ত্রাসের ভয়ে আমরা নৈতিক দায়িত্ব এড়াতে পারব না। আবার অকারণে দুর্দৈব ডেকে আনাও নির্বুদ্ধিতা। আমরা শেষপর্যন্ত নকল ঠেকানোর চেষ্টা করব। পরীক্ষা হল থেকে কাউকে যেমন বহিষ্কার করব না, তেমনি কাউকে নকল করতেও দেব না। সতর্ক-চোখে পর্যবেক্ষকরা সারাক্ষণ হলের ভেতর পাহারা দেবেন। কাউকে নকল করতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে নকলের কাগজ কেড়ে নেবেন। এটুকুতে কোনো আপোষ নেই। তাতে যা হবার হবে।

পরীক্ষা শুরু হবার আধঘণ্টা আগেই কায়দে আজম কলেজের ছাত্রে সারা কেন্দ্র গিজগিজ করতে লাগল। পরীক্ষার্থীর চেয়ে সমব্যথীর সংখ্যাই বেশি। একসময় কলেজের ছাত্রনেতারা এসে পৌঁছালে পরীক্ষার্থীদের ভেতর একটা উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাসের ভাব ছড়িয়ে পড়ল। ছাত্রনেতারা এসেই মন্ত্রীদের মতো ভারিক্কি চালে পরীক্ষাকেন্দ্রের ঘরগুলো এক এক করে পরিদর্শন করতে লাগল। উদ্দেশ্য ঘরগুলো তাদের ছাত্রদের পরীক্ষার পক্ষে 'সুবিধাজনক' কিনা সেটা খতিয়ে দেখা। পরিদর্শন-শেষে একজন বলিষ্ঠ ছাত্রনেতা, কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক হাতের ইশারায় ছাত্রদের সামনে এসে জড়ো হতে ইশারা করল। ছাত্রেরা তার ইঙ্গিতমতো হুড়মুড় করে তার সামনে এসে দাঁড়াল। এই অপরিচিত কলেজে কদ্দুর নিরাপদে পরীক্ষা দেওয়া যাবে তা নিয়ে তাদের সবার মধ্যেই উৎকণ্ঠা ছিল। তাই তারা ত্রাণকর্তাদের আশ্বাসের জন্য তখন উৎকর্ণ। তাদের দেখতে পেয়ে তাদের বুকে যেন সাহস ফিরে এসেছে। ছোটখাটো একটা জনসভার মতো হয়ে উঠল কলেজের বাগানটা। দলপতির ভঙ্গিতেই নেতৃত্ব। সে গম্ভীর স্বরে প্রথমেই ভিন্ন কলেজের বৈরী পরিবেশে নানান অসহযোগিতার ভেতর তাদের প্রাণপ্রিয় ছাত্রভাইবোনদের যে এভাবে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে, সেজন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে এবং শিক্ষা বোর্ডের এই হঠকারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাদের আপ্রাণ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার উচ্চারণ করে বলল : তবে যত কষ্ট বা অসুবিধার মধ্যেই তাদের পরীক্ষা দিতে হোক, তারা যেন না ভোলে যে কায়দে আজম কলেজের জাগ্রত ছাত্রসম্প্রদায় সবসময় তাদের সঙ্গে আছে এবং থাকবে।

হুবহু আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মতো কথাবার্তা। যেমন ক্ষিপ্র তেমনি চতুর। তার কথার ইঙ্গিতও স্পষ্ট। যাবার আগে ছাত্রনেতারা আমার সঙ্গে দেখা করে আপাত নিরীহভাবে বলে গেল, তাদের ছাত্রছাত্রীদের 'সুযোগ-সুবিধার দিকে' আমি

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

যেন একটু বিশেষভাবে নজর রাখি। সুযোগ-সুবিধা বলতে তারা কী বোঝাতে চাইল, আমি ঠিক ভেবে উঠতে না-পারলেও ঘনঘন শিরশ্চালন করে আমি তাদের যদ্দুর সম্ভব আশ্বস্ত করলাম। আজকাল পরীক্ষার হলে যে-সব শিক্ষকেরা ছাত্রদের নকলের ব্যাপারে আগ বেড়ে সাহায্য করে বা প্রশ্নোত্তর বলে দেয় ছাত্রেরা তাদের খুব প্রশংসা করে। বলে, 'এই স্যারটা খুব ভালো। খুব হেল্প করে।' 'নকলে হেল্প' এখন শিক্ষকসুলভ মহানুভবতার একটি নাম। আমাদের সময় এইসব হেল্প করা 'ভালো স্যার' ছিল না। তাই 'সুযোগ-সুবিধা' ব্যাপারটা ঠিক কী বুঝতে আমার এত দেরি হয়েছিল।

পরীক্ষা শুরুর আধঘণ্টার মধ্যেই পূর্ণোদ্যমে নকলের উৎসব জমে উঠতে শুরু করল। আমরাও আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কঠোর অবস্থান নিলাম। কাউকে নকল করতে দেওয়া হল না। কাউকে কাউকে সরাসরি শরীর তল্লাশি করে নকলের কাগজ কেড়ে নেওয়া হল। সারা পরীক্ষাহলে হতাশা, উত্তেজনা এবং চাপা আক্রোশ ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আমি দুজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষাহল ঘুরে ঘুরে অবস্থা দেখছিলাম। কলেজের মিলনায়তনের সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতেই ছ-সাত সারি পেছনে একজনের ওপর চোখ পড়ল। ছেলেটার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবভঙ্গি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার চেহারায় জগৎ-সংসারের প্রতি দার্শনিকসুলভ উদাসীনতা। দেখে মনে হবে গভীর কোনো অধ্যাত্মচিন্তার ভেতর অথবা মানবজাতির মুক্তির কোনো আসন্ন পথের সন্ধানে নিমজ্জিত থেকে উদাস-চোখে এদিক-ওদিক দেখে চলেছে। কিন্তু ভেতরে ঘটছে তার অন্য ঘটনা। ঐ উদাস দৃষ্টির ফাঁক দিয়ে সে থেকে-থেকে দেখে নিচ্ছে কেউ তাকে লক্ষ করছে কি না। কয়েক মিনিট পর্যবেক্ষণ করেই বুঝলাম ছেলেটা অসম্ভব ধূর্ত এবং নকলবাজ। তার দার্শনিকসুলভ মুখোশটাকে পরিদর্শকরা যেইমাত্র নিরপরাধ ভেবে অন্যদের দিকে চোখ ফেরাচ্ছে অমনি সে ঐ ভাবুক চেহারা বজায় রেখেই কোলের ওপর রাখা বাঁ-হাতের কাগজ থেকে খাতায় টুকে চলেছে। সহকর্মীদের নিয়ে আমি তার কাছে গিয়ে নকল চাইতেই সে হঠাৎ এমন এক কাজ করে বসল যে আমরা সবাই বোকা হয়ে গেলাম। হাতের মুঠোর নকলের কাগজটাকে গোল করে মুখে ঢুকিয়ে সোজা গিলে ফেলতে শুরু করল সে। আমরা অসহায়ভাবে চোখের সামনে দিয়ে শিকার হাতছাড়া হবার দৃশ্য দেখতে লাগলাম। চারপাশের ছাত্রেরা দাঁত বের করে আমাদের লক্ষ করে বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগল। ছাত্রটির মুখেও বিজয়ের মৃদু হাসি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমাদের উদ্দেশ্য নকল প্রতিরোধ, পরীক্ষার হল থেকে ছাত্রদের বহিষ্কার করে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা নয়। যত হাস্যকরভাবেই হোক, তার নকল রোধ করতে আমরা সফল হয়েছি। কাজেই আমাদের দুঃখ থাকার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আমার সহকর্মীদের মধ্যে একজন ছিলেন উৎকট আর তেড়িয়া গোছের মানুষ।

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

গাট্টাগোট্টা আর মজবুত গড়নের এই মানুষটির শরীরের শক্তির মতো তাঁর সবকিছুই ছিল বেয়াড়া আর বিরক্তিকর। সবকিছুতেই একটা না-হক বাড়াবাড়ি। একসময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন তিনি। কাজেই পরাজয় স্বীকার করতে কিছুতেই রাজি নন। হঠাৎ দেখলাম ছেলেটার মুখের ভেতর সাঁড়াশির মতো আঙুল ঢুকিয়ে নকলটা সজোরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। না, পাওনা জিনিশ তিনি কিছুতেই হাতছাড়া হতে দিতে পারেন না। দুর্ধর্ষ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটু সম্মান তো অন্তত রাখতেই হবে তাঁকে। ভদ্রলোক সত্যি সত্যি আঙুল বাঁকা করে তাঁর গলার ভেতর থেকে আধ-গেলা নকলের দলাটা টেনে বের করে তবে ছাড়লেন। ছেলেটা ওয়াক ওয়াক শব্দ তুলে বমি না করলেও অবসন্নের মতো খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তার গলার ভেতরটা কিছুটা আহত হয়েছে বলেই মনে হল।

সারা পরীক্ষাকেন্দ্র ছাত্রদের নকল করার আর মাস্টারদের নকল ছিনিয়ে নেবার ধস্তাধস্তিতে ক্লেদাক্ত হয়ে উঠল। পরীক্ষা দুই-আড়াই ঘণ্টা চলতে-না-চলতেই অধিকাংশ ছাত্রের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এই কেন্দ্রে পরীক্ষা চললে তারা কিছুতেই পাস করতে পারবে না। আজকের বাংলা প্রথম পেপারে তাদের ফেল নিশ্চিত হয়ে গেছে। পরেরগুলোতেও তা অনিবার্য।

তখনো শিক্ষাঙ্গন আজকের মতো স্টেনগান, পাইপগান, কাটা রাইফেল, গ্রেনেড আর পিস্তলে ছয়লাব হয়ে যায় নি। হয়ত এইজন্যেই নকলের বিরুদ্ধে এতটা কঠোর পদক্ষেপ আমরা নিতে পেরেছিলাম। কিন্তু পরীক্ষা শেষপর্যায়ে পৌঁছোবার আগেই ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পরীক্ষা শেষের আগেই হট্টগোল করে পরীক্ষাহলগুলোর চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর শুরু করল তারা। হঠাৎ করে ব্যাপারটা শুরু হওয়ায় আমরা খানিকক্ষণের জন্যে বোকা হয়ে গেলাম। কেউ বাধা দিচ্ছে না দেখে তাদের সাহস আর হিংস্রতা যেন আরও বেড়ে গেল। পরীক্ষার সময় তাদের সহযোগীদের পুলিশ গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। দুঃসংবাদ বাইরে যেতেই তারাও খেপে ঢুকে পড়ল কলেজে। পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে জোট বেঁধে তারাও কলেজ আক্রমণ করল।

সারা কলেজে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলতে লাগল। আমরা কলেজময় ছোটাছুটি করে তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। তারা দোকান থেকে লুট করে আনা টিনভর্তি কেরোসিন ঢেলে আমার কামরায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। জানালা দিয়ে আগুনের লাল জিহ্বা দাউ দাউ করে কলেজ গ্রাস করতে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি তখন কিছুক্ষণের জন্য ঐ ঘরের বাইরে ছিলাম। থাকলে আলখেল্লার ভেতরকার হোজ্জার মতোন ঘরের সঙ্গে আমার পতনও হয়ত অনিবার্য হয়ে উঠত। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে পুলিশ একসময় গুলি চালাল। গুলিতে কয়েকজন আহত এবং একজন ছাত্র চোখের সামনেই রাস্তার ওপর মারা গেল। মুহূর্তে সারা এলাকায় এক ভূতুড়ে নিঃশব্দতা নেমে এল। চারদিক জনমানবশূন্য, খাঁ খাঁ। হঠাৎ এক ফরসা

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

লম্বা শক্তসমর্থ মাঝবয়সী উর্দুভাষী ভদ্রলোক ছুটে এসে এলোমেলোভাবে উর্দু-বাংলা মিশিয়ে বলতে লাগলেন, 'আমার ছেলের কি জাঙ্গমে গুলি লেগেছে। ও কাঁহা !' তাঁর চেহারা পুরো উদভ্রান্ত। সবাই হাসপাতালের কথা বললে, তিনি সেদিকে অপ্রকৃতিস্থের মতো ছুটে চলে গেলেন। পরে জেনেছিলাম ঐ ভদ্রলোকটিই ছিলেন মারা-যাওয়া ছেলেটির বাবা। পুলিশের ডি.এস.পি. ছিলেন তিনি। ছেলেটির গুলি লেগেছিল তলপেটে। ছেলেটি ছিল বলিষ্ঠ আর সুদর্শন, উচ্চতায় ছ-ফুটের মতো। হিন্দি ছবির সুদর্শন রোমান্টিক নায়কদের মতো যৌবনদৃপ্ত চেহারা নিয়ে ছাত্রদের নেতৃত্ব দিতে দিতে সবার আগে সে এগিয়ে আসছিল। তার চেহারা আমার চোখের সামনে আজও স্পষ্ট ভাসে। যে-পুলিশের গুলিতে ছেলেটা মারা গিয়েছিল, তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল যে সে ছেলেটিকে বিশেষভাবে নিশানা করে গুলি করেছিল কিনা, সে তখন রূঢ়স্বরে জবাব দিয়েছিল যে সে তাই করেছে। সে জানাল সারা কলেজ জ্বালিয়ে দিচ্ছে এটা সহ্য করতে না পেরেই সে তাকে গুলি করেছে এবং সে ঠিকই করেছে। সদ্য খুনের উত্তেজনায় তার চোখদুটো তখন ভাটার মতো লাল টকটকে।

কঠোর পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে পরের পরীক্ষাগুলো নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু বিবেকের আঘাত থেকে আমি মুক্তি পেলাম না। সন্তান-হারানো সেই ভদ্রলোকের বেসামাল ছোটছুটি, তাঁর বিভ্রান্ত উৎকণ্ঠিত মুখ, তাঁর পরিবার-পরিজনের আহাজারি সারাক্ষণ যেন আমার চারপাশে কেঁদে বেড়াতে লাগল। কর্তব্যবোধ আর নমনীয় আপোষকামিতার মধ্যে কোন্ পথে যাব ভেবে উঠতে পারলাম না, কিন্তু আমার তেইশ বছরের স্পর্শকাতর তরুণ-হৃদয় ধীরে ধীরে শিথিল আর নিষ্ক্রিয় হয়ে আসতে লাগল। আট-দশ মাস পরে কলেজের অধ্যক্ষ ফিরে এলে আমি তাড়াতাড়ি সব দায়িত্ব তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে ছাত্র-পড়ানো ছাড়া আর সবকিছু থেকে বিদায় নিলাম। কিছুদিন আগের সেই নব্য ধনপতির আচরণে নৈরাজ্য ও অবৈধতার যে-রূপ দেখেছিলাম তা ছিল আমাদের সামাজিক জীবনের অবক্ষয়ের বাইরের দিকের প্রকাশ। নতুন ফেঁপে-ওঠা অবৈধ বিত্তের মদমত্ততার ভেতর থেকে জেগে উঠে তা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রের মতো শিক্ষাঙ্গনকেও তখন আক্রমণ করতে শুরু করেছে। কায়দে আজম কলেজের ছাত্রদের ভেতর উচ্ছৃঙ্খলতার যে ভয়াবহ চেহারা চোখে পড়েছিল, তা সে-সময়কার শিক্ষাঙ্গনের আর একটা দিক : এটা ছিল শিক্ষাঙ্গনের ভেতরের নৈরাজ্যের চেহারা। দুটোই আমাদের সমাজে তখন নতুন পা রাখতে শুরু করেছে। ষাটের দশকেই এদেশে প্রথম এসবের সূচনা। পরে তা ক্রমাগতভাবে বেড়ে বেড়ে আজ সারা জাতির প্রতিটি সম্ভাব্য চত্বরকে গ্রাস করেছে। আজ পরীক্ষাহলে নকল করে না এমন ছাত্র বা ছাত্রী খুবই বিরল। এর আগে এই দেশে এই অবক্ষয়ের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য।

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ঢাকা কলেজ

১

শরৎচন্দ্রের কোনো একটা উপন্যাসের, কোন্‌টার ঠিক মনে নেই, শুরুতে এ-রকম একটা বাক্য পড়েছিলাম : কৃষ্ণ ঠাকুরানী দুই কানের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে নদীতে বার দুই ডুব দিয়েই উঠে বললেন, 'কপাল যখন পোড়ে, তখন অমনি করেই পোড়ে।' আমার চাকরি-জীবনের কপালও পুড়ে উঠল অমনি অনিবার্যভাবে। ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজের শান্ত পরিবেশে আজীবন প্রভাষকের নিরুপদ্রব জীবন কাটানোর পরিকল্পনা নিয়ে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলাম। তখন সরকারি কলেজের শিক্ষকদের চাকরির পর্যায় ছিল তিনটি: প্রভাষক, কনিষ্ঠ অধ্যাপক, অধ্যাপক। আগেই বলেছি সারাদেশে সরকারি কলেজ ছিল তখন ছ-সাতটি। কাজেই ওপরের দিকের পদ-দুটোর সংখ্যা ছিল নেহাতই হাতে-গোনা। ঐ পদগুলোতে যাওয়া সোজা ছিল না। কালেভদ্রে কখনো কোনো পদ খালি হলে কর্মকমিশন প্রথমে ঐসব পদে লোক চেয়ে বিজ্ঞাপন করত। বিভিন্ন কলেজ থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা আবেদন করলে তাদের প্রত্যেকের শক্তমতো ইন্টারভিউ নেওয়া হত এক এক করে। কর্মকমিশনের সদস্য-সভার সেই ইন্টারভিউতে নির্বাচিত হতে পারলে তবেই হত পদোন্নতি।

১৯৬৪-এর প্রথম দিকে হঠাৎ দেখা গেল, কাগজে কর্মকমিশনের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে : কনিষ্ঠ অধ্যাপকের পদে লোক নেওয়া হবে। প্রভাষকরা উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে দরখাস্ত করতে লেগে গেলেন। প্রভাষক হিশেবে জীবন কাটিয়ে দেবার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত অটল। কাজেই বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা আমার নজরেই আসে নি। কিন্তু একজনমাত্র ব্যক্তির কারণে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হল আমাকে। কেবল ভাবতে নয়, আমার আজীবন প্রভাষক হয়ে থাকার পুরো পরিকল্পনাটাই ভণ্ডুল করে দিলেন তিনি। তাঁর পরিপক্বতা ও পরিণত অভিজ্ঞতার কাছে আমি অবোধ শিশুর মতো হেরে গেলাম। তিনি ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক। বড় কোনো

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

স্বপ্নতাড়না না-থাকলেও অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি ছিলেন বেশ ভালো। অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক আমাকে গভীর স্নেহের চোখে দেখতেন। বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর মতো বস্তুজাগতিক মানুষেরা জানেন আমাদের মতো তুবড়ি-ওঠা তরুণেরা উঠতি বয়সের ঝোঁকে জীবন নিয়ে উল্টোপাল্টা অনেক অভাবনীয় কিছু করার কথা ভাবে। অনেকে অনেক সময় অনেক অসম্ভব কাণ্ডকারখানা ঘটিয়েও বসে। কিন্তু কায়দা করে একবার বাস্তবের জোয়াল ঘাড়ের সঙ্গে ঠিকমতো জুড়ে দিতে পারলে কিছুদিন দাপাদাপি লাফালাফি করে একসময় শান্তও হয়ে যায়। অভিজ্ঞতা থেকে এঁরা আরও জানেন যে, বড় বড় কপচানো বুলির মোহে এ বয়সে একবার বড় ধরনের বৈষয়িক ভুল করে বসলে জীবনভর চোখের পানিতেও তার প্রতিকার হয় না। তিনি আমাকে পদোন্নতির জন্য দরখাস্ত করার ব্যাপারে প্ররোচিত করতে লাগলেন। একদিন বললেন, 'না, চাকরি করতে বলছি না আপনাকে। শুধু ইন্টারভিউটা দিন। নিজের যোগ্যতাটা পরখ করে দেখুন। ইন্টারভিউ দিলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে, পরিস্থিতি মোকাবেলার সাহস হয়। কী ক্ষতি এটুকু করলে।' আমার গড়িমসি টের পেয়ে বলে যেতে লাগলেন, ' ইন্টারভিউতে এ্যালাও হলেই চাকরি করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। ইচ্ছা হলে চাকরি করবেন, না হলে ছুড়ে ফেলে দেবেন। সবই তো আপনার হাতে। কেউ তো আপনাকে বাধ্য করতে পারছে না। দরখাস্তটা করেই দিন।'

অধ্যক্ষ রাজ্জাকের সাথে প্রতিদিন একসঙ্গে বসে নানা বিষয়ে গল্প হত আমার। আমার প্রতি তাঁর একধরনের সস্নেহ গুণগ্রহিতা ছিল। তাঁর অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। দরখাস্ত করেই দিলাম। কী আর এমন অসুবিধা? একটা ইন্টারভিউ দেওয়াই তো। নাহয় দিলামই একবার। প্রোমোশন তো আর নিচ্ছি না।

কোথায় কারও কাছে হেরে যেতে আমার চিরকাল অসম্ভব আত্মমর্যাদায় বাধে। যেখানে কোনোভাবে হারার সম্ভাবনা থাকে, সেখান থেকে আগেভাগেই আমি নিঃশব্দে কেটে পড়ি। মর্যাদার সঙ্কটে পড়ে আমি ইন্টারভিউতে ভালো করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলাম। ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে অনুপ্রাণিত কবিদের মতো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম আমি। তরুণ বয়সে ঐ শক্তিটা আমার মধ্যে অফুরন্তরকমে সক্রিয় ছিল। ইন্টারভিউ খুবই প্রাণবন্ত হল। সাক্ষাৎকারের সময় আমার ভেতরকার জ্বলজ্বলে আবেগ সদস্যদের ভেতরেও ছড়িয়ে পড়ল। সবাই উৎসুকভাবে আমাকে নিয়ে লোফালুফি বাধিয়ে দিলেন। নানা প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চাইলেন। আমি তাঁদের সবার চোখে সপ্রশংস উৎসাহ দেখে আশ্বস্ত বোধ করলাম।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

২

সদস্যদের মধ্যে দুজনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। একজন বারী সাহেব, কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান, আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি। দ্বিতীয়জন জালালউদ্দীন আহমদ, সে-সময়কার ঢাকা কলেজের দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রিন্সিপাল। জালাল সাহেব আমাকে কোনো প্রশ্ন করেন নি, একপাশে চুপ করে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। সেকালের ছোট্ট ঢাকা শহরে অধ্যক্ষ জালালউদ্দীন আহমদকে চিনতেন না এমন শিক্ষিত মানুষ খুব কমই ছিল। নিজের যোগ্যতা দিয়েই এটা তিনি অর্জন করেছিলেন। ঢাকা কলেজ এই শহরের সবচেয়ে পুরোনো কলেজ। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৪ সালে। শহরের প্রথম সরকারি কলেজও এটি। ভালো কলেজ হিশেবে ঢাকা কলেজের খ্যাতি সবসময়ের। একসময় ভালো কলেজ হিসেবে জগন্নাথ কলেজেরও বেশ নামডাক ছিল। আগের খবর বলতে পারব না, তবে উনিশশো সাতচল্লিশের পর থেকে তখন পর্যন্ত ঢাকা কলেজ এই প্রাদেশিক রাজধানীটির সেরা কলেজ হিসেবে ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে অল্পদিনের জন্যে এই কলেজের একটি শক্তিমান নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর উত্থান ঘটতে শুরু করে। এ প্রতিদ্বন্দ্বী বহিরাগত উৎসের—খ্রিস্টান মিশনারিদের। নাম নটরডেম কলেজ। পঞ্চাশের দশকের শেষ আর ষাট দশকের শুরুর দিকে হাল আমলের আমেরিকান স্থাপত্যের ঝকঝকে জৌলুশ, ব্রাদার-ফাদারদের ছিমছাম ডরমিটরি আর অচেনা গাছের সুদৃশ্য ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে মতিঝিলের উত্তরপাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যায় এই কলেজ। কেবল দাঁড়ায় না, আমেরিকান ফাদার আর ব্রাদারদের উদয়াস্ত নিষ্ঠায় আর পরিশ্রমের কারণে দেখতে দেখতে তা সুনাম এবং যোগ্যতায় ঢাকা কলেজকেও যেন ছাড়িয়ে যায়। নটরডেম কলেজ আর ঢাকা কলেজ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কলেজ হিশেবে প্রতিযোগিতা করে যেতে থাকে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সেকালে সেন্ট গ্রেগারিজ স্কুলের তিরিশ দশকী ব্রিটিশ-খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের হাওয়া-লাগা মেধাবী ছাত্রেরা আর ঢাকার পশ্চিমমুখী নব্য বিত্তবান ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেরা ছিল নটরডেম কলেজের মূল সম্পদ। ফাদার-ব্রাদারদের শাদা চামড়া, কলেজের আপোষহীন পশ্চিম-ঘেঁষা কঠোর নিয়মনিষ্ঠা, ছাত্রদের নাকউঁচু মনোভঙ্গি—যে-কোনো কারণেই হোক—নটরডেম কলেজের সামগ্রিক পরিবেশে একটা জনবিচ্ছিন্নতার ছাপ ছিল। অন্যদিকে ঢাকা কলেজ ছিল ঢাকা সহ সারাদেশের মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের 'ভালো ছাত্রদের' কলেজ। ঢাকা কলেজ ঐতিহ্যবাহী সরকারি কলেজ, সেখানে ছাত্রদের বেতন কম, পড়াশোনার পরিবেশ উন্নত, এর সাথে রয়েছে পর্যাপ্ত আবাসিক সুবিধা যা নটরডেম কলেজে ছিল না। ঢাকা সহ দেশের বড় বড় শহর থেকে তো বটেই, এমনকি দেশের দূর-দূরান্ত থেকে ভালো ছাত্রেরা তাই ঢাকা কলেজে এসে জুটত।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সেকালে দেশের বড় বড় শহরের ভালো স্কুলগুলো থেকে কেবল নয়, সুদূর মফস্বলের অনেক অখ্যাত স্কুল-কলেজ থেকেও ছাত্রদের ম্যাট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েট (এখানকার এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি.) পরীক্ষায় অসাধারণ ফল করতে দেখা যেত। (পঞ্চাশ থেকে সত্তর দশকের মধ্যে যারা এদেশের জাতীয় জীবনের নানান ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন—পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, চিকিৎসা-প্রকৌশল থেকে শুরু করে পেশা-জগতের প্রতিটি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে—তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দেশের ছোট-বড় মফস্বল শহর ও গ্রাম থেকে উঠে আসা এইসব মেধাবী ছাত্র)। তখন এটা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ, সে-সময়ে দেশের দূর-দূরান্তের স্কুল-কলেজগুলোতেও এমন সব অনুপ্রাণিত ও আদর্শবান শিক্ষক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন, এমন সব সুযোগ্য আত্মোৎসর্গিত হেডমাস্টার বা অধ্যক্ষ যা আজ অভাবনীয়। এদের আপ্রাণ পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার ফলে ঐসব স্কুল-কলেজগুলোর পক্ষে ঐ সাফল্য সম্ভব হত। এঁদের অনেকেই ছাত্রদের বড় করে তোলার ভেতর দিয়ে দেশকে জাতিকে বড় করার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এই ভাবনা ছড়িয়ে যেত। তারাও সেই শ্রেয়োবোধের স্বপ্নে প্রজ্বলিত হয়ে উঠত। এখন শিক্ষকদের এই প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। দেশের দূর-দূরন্তের স্কুল-কলেজ থেকে এখন আর এ-ধরনের অসাধারণ সাফল্যের খবর আসে না। আজ গ্রামবাংলার অজ পাড়াগাঁর কোনো স্কুলে শিক্ষার জন্যে জীবন উৎসর্গ করা কোনো ওয়ালিউল্লাহ পাটোয়ারি, এমদাদ মাস্টার বা হাসান আলী বি.এ.বি.টি.-র মতো আসাধারণ শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যাবে না। শিক্ষা এখন হয়ে পড়েছে পুরোপুরি অর্থভিত্তিক একটি ক্রয়যোগ্য সামগ্রী। পরীক্ষার সাফল্য এখন ঢাকা মহানগরীর মতো দেশের বড় বড় শহর ও জেলাশহরের হাতে-গোনা গুটিকয় বিত্তবান আর সচ্ছল পরিবারের হাতে জিম্মি হয়ে গেছে। এর বাইরে সব অন্ধকার। দেশের সুবিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল এখন সুশিক্ষার সামান্যতম সুযোগেরও বাইরে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৩

ষাটের দশকের শুরুতে যাঁর সুযোগ্য অধ্যক্ষতায় নটরডেম কলেজের দীপ্তি ঢাকা কলেজকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে তিনি ফাদার নোভাক। ঢাকা কলেজের এই বিপজ্জনক সময়ে এই কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন জালালউদ্দীন আহমদ। অধ্যক্ষ হিসেবে জালালউদ্দীন আহমদ ছিলেন অসাধারণরকমে যোগ্য, অধ্যাপক হিশেবে অসামান্য এবং ব্যক্তিগতভাবে সুরসিক। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা কার্যকর করার স্বার্থে যে-কোনো কঠোর ও দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেবার জন্মান্ধ

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

শক্তি ছিল তাঁর মধ্যে। কলেজের ভেতর সর্বোচ্চ শিক্ষা-পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিরাপোষ যোদ্ধা। এর জন্যে বহুরকম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তিনি। কলেজের তুচ্ছ-বড় কোনোকিছুই তাঁর সজাগ উৎকর্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারত না। কোনো শিক্ষক তাঁর নির্ধারিত ক্লাস নিচ্ছেন না—যা আজকের ঢাকা কলেজের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার—তাঁর আমলে অকল্পনীয় ছিল। নিঃশব্দ বেড়ালের মতো কলেজের শূন্য করিডোর দিয়ে তিনি একা একা ভীতিকরভাবে হেঁটে বেড়াতেন। কলেজে রাউন্ড দেবার জন্যে তিনি নিজের ঘরের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন বা ঘর থেকে বেরিয়েছেন কি সারা কলেজে অদ্ভুতভাবে সে-খবর কী করে যেন ছড়িয়ে পড়ত। মুহূর্তে সবগুলো করিডোর নীরব আর জনশূন্য হয়ে যেত। অধ্যক্ষ জালালউদ্দীন আহমদ বিভিন্ন ক্লাসের পাশে নিঃশব্দভাবে দাঁড়িয়ে শিক্ষকদের পড়ানো একা একা শুনতেন।

ঢাকা কলেজে যোগ দেবার কিছুদিনের মধ্যেই নিজেকে পরাক্রান্ত অধ্যক্ষ হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। পরীক্ষায় কলেজের ফল যাতে গৌরবজনক হয়ে ওঠে সেজন্যে তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। দুয়েক সময় কথা উঠেছে যে কলেজের ফল ভালো করানোর জন্যে তিনি শিক্ষা বোর্ডের ওপর তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব ব্যবহার করেছেন। আমার ধারণা সেটা হয়ে থাকলেও তার পরিমাণ খুব একটা বেশি নয়। অবিরাম উৎসাহ দিয়ে মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান দখলের জন্য কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তিনি ব্যাপক উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। তিনি ঐ কলেজে আসার আগে পর্যন্ত মেধা-তালিকায় ঢাকা কলেজ আর নটরডম কলেজের ফল ছিল কাছাকাছি। কিন্তু তাঁর যোগদানের পর থেকেই বিভিন্ন পরীক্ষায় ঢাকা কলেজ অভাবিত সাফল্য দেখাতে শুরু করে এবং নটরডেম কলেজের খ্যাতিকে ছাড়িয়ে যেতে থাকে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এই সময় এমন একটা মর্মান্তিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যা নটরডেম কলেজকে বেশকিছুটা দুর্বল করে ফেলে। তা হল : নটরডেম কলেজের সূচনাযুগের মহান পুরুষ, আত্মোৎসর্গিত ও কর্মোদ্যোগী ফাদার মার্টিনের আকস্মিক ও দুঃখজনক অকালমৃত্যু। তাঁর মৃত্যু কেবল দুঃখজনক নয়, নির্মম। ১৯৬৪ সালে ঢাকা শহরের আশেপাশের এলাকাসহ দেশের অনেকখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডবলীলা শুরু হয়। ভারতের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার রেশ ধরে ধূমায়িত হয়ে ওঠা বিস্ফোরণোন্মুখ ঐ দাঙ্গাটি সে-সময়কার পূর্ব পাকিস্তানের মোনায়েম খানের মুসলিম লীগ সরকারের সুপরিকল্পিত উসকানিতে দেশের কিছু কিছু এলাকায় ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এই বিপদের মুহূর্তে নির্ভীক ও মানবদরদী ফাদার মার্টিন ডেমরা এলাকার উপদ্রুত সংখ্যালঘুদের সাহায্য করার জন্য ছুটে গেলে সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সশস্ত্র সদস্যেরা তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। একই সঙ্গে ফাদার মার্টিনের

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তিরোধান ও জালালউদ্দিন আহমেদ-এর সুযোগ্য পরিচালনা—এই দুই মিলে ঢাকা কলেজ আবারও দেশের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফাদার মার্টিনকে হারানোর ক্ষতি নটরডেম কলেজ কখনোই কাটিয়ে উঠতে পারে নি। নটরডেম কলেজের সম্ভাবনাময় অগ্রযাত্রা আজও সেই উদ্ধারহীন অবস্থার মধ্যে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কলেজের শিক্ষা-পরিবেশকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার চেষ্টায় অধ্যক্ষ জালাল ছিলেন সংশপ্তক। তিনি ছিলেন এক নতুন গৌরবোজ্জ্বল ঢাকা কলেজের স্রষ্টা, সেই গৌরবকে সবদিক থেকে সমুন্নত রাখার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাপোষ। দেশের অন্যসব সরকারি কলেজের মতো ঢাকা কলেজও ছিল সরকারি কলেজ। সরকারি চাকরির নিয়ম অনুযায়ী দেশের অন্যান্য সরকারি কলেজ থেকে অধ্যাপকেরা বদলি হয়ে ঢাকা কলেজে আসতেন। অধ্যক্ষ জালাল এই নিয়মকে সরাসরি উপেক্ষা করতে শুরু করেছিলেন। বদলি হয়ে আসা অধ্যাপকদের শিক্ষাগত মান বা অন্যান্য যোগ্যতা ঢাকা কলেজে শিক্ষকতার উপযুক্ত কিনা তা খতিয়ে দেখেই কেবল তিনি তাঁদের তাঁর কলেজে যোগ দিতে দিতেন। এক পর্যায়ে ঢাকা কলেজে কোনো শিক্ষকের যোগদানকে তিনি প্রায় পুরোপুরি তাঁর অনুমোদন-সাপেক্ষ ব্যাপার করে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন পুরোপুরি ব্রিটিশ আমলের সামন্তবাদী মনোভাবসম্পন্ন মানুষ। তাঁর চাকরি-জীবনের একটা বড় অংশ কেটেছিল ঐ আমলে। ঐ সময়কার অনুগত বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদের মতোই তিনি ছাত্র-রাজনীতিকে শিক্ষাবিরোধী একটা ব্যাপার বলে মনে করতেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি কলেজ থেকে ছাত্র-রাজনীতি পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেন এবং খুদে একনায়কের দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে ঢাকা কলেজের ওপর তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হিশেবে তাঁর নয়-দশ বছরের সময়-পর্বে ভালো-মন্দ দুই-ই ঘটেছিল। তাঁর বাড়ি ছিল ভৈরব-এ। ছাত্রহৃদয়ে আতঙ্ক জাগানোর জন্যে অট্টহাসির সঙ্গে রসিকতা করে তিনি বলতেন—'জানস, আমার নাম জালালউদ্দীন ভৈরবী। আমার থেইকা কারো রেহাই নাই।' তাঁর সেই দুর্ধর্ষ কর্তৃত্বের নিষ্ঠুর ত্রাসের নিচে কলেজের ছাত্রদের মুক্তচিন্তা, গণতান্ত্রিক বোধ সবকিছুই দলিত হয়ে পড়ে। কলেজের সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর নেমে আসে কালো রাত্রির অন্ধকার। কিন্তু অন্য একটা জায়গায় কলেজ হয়ে ওঠে অপরাজেয়। প্রতিটা পরীক্ষায় অবিশ্বাস্য ভালো ফল করতে শুরু করে কলেজের ছাত্রেরা। সম্মিলিত মেধা-তালিকাসহ বিজ্ঞান, মানবিক আর বাণিজ্য শাখায় প্রথম বিশটি শীর্ষস্থানের মধ্যে আট-দশটি তো তারা পেতই, উপরন্তু তিন শাখা মিলে প্রথম ষাটটি শীর্ষাসনের মধ্যে প্রায়ই পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশটি স্থান অধিকার করে নিত। ঢাকা কলেজের ইতিহাসে এমন অবিশ্বাস্য সাফল্য, এর আগে কখনো ঘটেনি। অধ্যক্ষ জালাল কলেজের সামগ্রিক শিক্ষা

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পরিবেশের ভেতর যে-শৃঙ্খলা, মূল্যবোধ এবং আদর্শের বীজ বুনে দিয়েছিলেন, তিন দশক ধরে ঢাকা কলেজে সেই ধারা বহমান ছিল।

তাঁর চরিত্রের কঠোরতা, দুঃসাহস এবং কর্তৃত্বের অকর্ষিত শক্তি দিয়ে তিনি নিজেকে ঢাকা কলেজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। একটা সদ্য-স্বাধীন-হওয়া দেশের আবহাওয়ায় তাঁর মতো একজন সামন্ত মূল্যবোধসম্পন্ন স্বৈরাচারীর কোনোভাবেই সফল হবার কথা নয়। কিন্তু নিয়তি ছিল তাঁর অনুকূলে। অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর ঢাকা কলেজে যোগদানের দু-তিন বছর আগে পাকিস্তানে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ একনায়কতন্ত্রের ছত্রচ্ছায়ায় রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান—বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের সহযোগিতা নিয়ে তাঁর ভেতরকার ক্ষুদ্র স্বৈরাচারীটি পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ পেয়ে যায়।

তাঁর সৌভাগ্য যে তাঁর চাকরি-জীবনের সমাপ্তি ঘটে ১৯৬৯ সালে, আইয়ুব খানের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই। ফলে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব থেকে তাঁর পতনের অধ্যায়টি তাঁকে দেখে যেতে হয়নি।

৪

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ইন্টারভিউয়ের দুদিন পর দুপুরের দিকে ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজের হোস্টেল থেকে কলেজ-ভবনে ঢুকছি, হঠাৎ দেখি বেতের মতো ছিপছিপে ঢ্যাঙা শরীর নিয়ে জালালউদ্দীন আহমদ কলেজের ফাঁকা বারান্দা দিয়ে একা একা হেঁটে বেড়াচ্ছেন আর প্রতিটি ক্লাসে উঁকি দিয়ে কিছু একটা খুঁজছেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই মানুষটিকে আমাদের কলেজের বারান্দায় এভাবে একা ঘুরতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এগিয়ে গিয়ে বললাম, কাউকে খুঁজছেন? জালাল সাহেব কথা বলতেন ভৈরবের বিশুদ্ধ আঞ্চলিক উচ্চারণে। প্রায় ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গে নির্বিকারে ঐ ভাষায় কথা বলতেন তিনি। হঠাৎ আমাকে সামনে দেখেই ফোকলা দাঁতের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, এই তো পাইয়া গেছি!'

আমার হতবিহ্বলতা আর বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই বললেন, 'বাইরে আসেন, কথা আছে।' ঢিপঢিপ-করা বুকে তাঁর পাশাপাশি কলেজের গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। বুঝতে পারলাম না আমার মতন অখ্যাত কলেজের একজন তুচ্ছ প্রভাষকের সঙ্গে ঢাকা কলেজের এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ অধ্যক্ষের কী কথা থাকতে পারে। শঙ্কিতভাবে তাঁর সঙ্গে পায়ে পায়ে হেঁটে কলেজের গেটের ওপার পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম।

গেট পার হয়ে রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধ ভৈরবের ভাষায় কথা শুরু করলেন তিনি। 'এইখানে কী খুচুর-খুচুর করতাছেন। আইয়া পড়েন আমার

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কলেজে।' উপচানো হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে বললেন তিনি। বুঝতে বাকি রইল না, এই কলেজ থেকে আমাকে তাঁর কলেজে নিয়ে যাবার কথা বলতেই আসলে তাঁর এখানে আসা। ব্যাপারটা দুদিন আগের সেই ইন্টারভিউয়ের সরাসরি ফলশ্রুতি। ভেতরে ভেতরে নিজেকে কেউকেটা ভেবে খুশি লাগতে লাগল।

যাটের নবীন সাহিত্য আন্দোলনের ভেতর আমি তখন প্রায় বুঁদ হয়ে আছি। আমতা আমতা করে আমি তাঁকে সত্যি কথাটাই বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম। বললাম, 'লেখক, লেখা আর লেখা-সম্পাদনার ভেতর ডুবে আছি। এসবের স্বার্থে অল্প-দায়িত্বের এই অপরিচিত কলেজে থাকাই আমার পক্ষে সুবিধাজনক। অন্য কোথাও গেলে...' ইত্যাদি ইত্যাদি। জালাল সাহেব আমার কথাবার্তা আদৌ শুনলেন বলে মনে হল না। কারো কথাই তিনি কখনো শুনতেন না। আমাকে মাঝপথে জোর করে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'আইয়া পড়েন। দেশের শ্যারা ছাত্র পড়াইতে পারবেন। এইখানে থাইকা করবেনডা কী? ভালো মাস্টার তো ভালো ছাত্রই খুঁজে—যারা বুঝে, মনে রাখে।' আমি তাঁর কাছে ব্যাপারটা ভেবে দেখার সময় চাইলাম। উনি বললেন, 'যাইতে চাইলে আমারে জানাইয়েন। ডি.পি.আই. ফজলুর রহমান আমার ছাত্র। ইচ্ছা করলে একদিনেই লইয়া যাইতে পারুম।' বলে, কলেজের সামনে দাঁড়-করিয়ে-রাখা তাঁর রিকশায় উঠে রওনা হয়ে গেলেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এই ছিলেন অধ্যক্ষ জালালউদ্দীন আহমদ। কলেজকে সমস্ত দিক থেকে ভালো করে তুলতে তিনি যে কতখানি অতন্দ্র ছিলেন এই ছোট্ট গল্পটা তার প্রমাণ। ছাত্রদের জন্যে ভালো হবে মনে হয়েছিল বলে আমার মতো একটা সামান্য শিক্ষককে তাঁর কলেজে নেবার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে এসে কথা বলতেও তাঁর সম্মানে বাধে নি।

৫

অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক আমার ইন্টারভিউ দেওয়াটাকে যতটা নিরীহ আর নিরপরাধ হিসেবে চিত্রিত করেছিলেন, আসলে আদৌ তা ততটা নিরীহ ছিল না। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশে মাস-দুয়েকের মধ্যেই প্রমোশন হয়ে গিয়েছিল আমার। ফলে আমাকে কনিষ্ঠ অধ্যাপক পদে কোথাও যোগদান করানোই ডি.পি.আই. অফিসের একটা মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঢাকায় কনিষ্ঠ অধ্যাপকের কোনো পদ খালি ছিল না। তাই ডি.পি.আই. কিছুদিন পরপরই আমাকে পদোন্নতি দিয়ে ঢাকার বাইরে—একেকবার একেক জায়গায় বদলি করতে লাগলেন—আর ঢাকার বাইরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় বলে আমিও সব

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

শক্তি একখানে করে সেই বদলির আদেশ রদ করার জন্য তদবির করে যেতে লাগলাম। এভাবে বদলি করা ও সেই বদলির আদেশ বাতিলের জন্যে তদবির করাটাই আমার ও ডি.পি.আই. অফিসের একটা চাকরি হয়ে দাঁড়াল। কোনোকিছু পাওয়ার জন্য তদবির করা অবমাননাকর ব্যাপার। কিন্তু কোনো দামি প্রাপ্তি প্রত্যাখ্যানের জন্য তদবির ততটা অবমাননাকর নয়। বরং কোথায় এর মধ্যে যেন একটা মর্যাদার ব্যাপারই আছে। তদবিরের সময়েও বুক টান করে কথা বলা যায়। তাই বিরতিহীনভাবে এই তদবির করে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল আমার পক্ষে। বহু বছর পর্যন্ত এই ইন্টারভিউ আমাকে ভুগিয়েছে। তবু একটা কারণে ঐ ইন্টারভিউর কাছে আজও আমি ঋণী। তা হল এর সূত্র ধরে অধ্যক্ষ জালাল আহমদের সংস্পর্শে আসা এবং পরবর্তীতে ঢাকা কলেজে আমার বদলি।

জালাল সাহেবের আমন্ত্রণ আমাকে এক বিরাট দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিল। জীবনকে ফলবান বা অর্থপূর্ণ মনে হতে পারে এমন কিছু একটা কাজের ভেতর ব্যস্ত থেকে জীবনটা পার করার কথা মনে মনে আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলাম। সেজন্যেই টেকনিক্যাল কলেজের চাকরিটা আমার জন্যে ছিল ভালো। এখানে অবকাশ বিস্তর। সেই সময়টা আমার নিজের কাজের জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার একই সঙ্গে এর উল্টো আর একটা দিকও আছে। যেসব 'অর্থপূর্ণ' কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখার কথা ভেবেছি, শিক্ষকতাও তো সে-সবেরই একটা। সেরা ছাত্র না-পেলে তার পুরোপুরি বিকাশের পথই বা কী? তাছাড়া জালাল সাহেবের কথাটাও তো একেবারে ফেলনা নয়। একজন শিক্ষক তো অনুভূতিময় মেধাবী আর স্বপ্নবান ছাত্রকেই খুঁজে বেড়ায়—যারা অনুভব করবে, বুঝবে। যাদের ভেতর দিয়ে শিক্ষকের জীবনসত্তা শক্তিমন্তভাবে প্রসারিত হবে ভবিষ্যতের অদেখা পৃথিবীতে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ঢাকা কলেজের উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রদের জমজমাট সজীব পৃথিবী আমাকে অবিশ্রান্তভাবে টানতে লাগল।

একদিন আমি দুর্বলতাতাড়িত হয়ে প্রায় নিজের অজান্তেই ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগে গিয়ে হাজির হলাম। উদ্দেশ্য, ভালো করে খতিয়ে দেখা ঐ কলেজের প্রভাষকেরা সপ্তাহে কটা করে ক্লাস নেন। আমরা আমাদের কলেজে সপ্তাহে ক্লাস নিতাম মোট বারোটা—প্রতিদিন দুটো করে। ঠিক করলাম, ঢাকা কলেজে প্রভাষকদের ক্লাসের সংখ্যা যদি এর চেয়ে খুব বেশি না হয় তবে বাস তুলে ঢাকা কলেজেই উঠে যাব। কিন্তু ঢাকা কলেজের রুটিন দেখে আমার চোখ আকাশে উঠে গেল। গুণে দেখি প্রভাষকদের ওখানে ক্লাস নিতে হয় সপ্তাহে ২২টা। না, এত ক্লাস নেওয়া অসম্ভব। দিনে চারটা করে ক্লাস নিতে হলে, ক্লাস নিতে নিতেই ঝরে যাবে জীবনের তাবৎ শক্তি, নিঃস্ব হয়ে যাবে। যেমন নিঃশব্দে গিয়েছিলাম তেমনি নিঃশব্দে ফিরে এলাম। সপ্তাহে বাইশটা ক্লাসের আসল গুমর ধরা পড়ল কয়েক বছর পর,

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

১৯৬৭ সালের প্রথম দিকে। ঢাকা কলেজের এক প্রভাষকের সঙ্গে হঠাৎ করেই দেখা। খানিকটা সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে তাঁকে বললাম, 'সপ্তাহে বাইশটা ক্লাস! কী করে যে নেন আপনারা? এ তো শরীর-মনের ওপর রীতিমতো অত্যাচার!'

প্রভাষক সাহেব একগাল হেসে, শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'ধীরে রজনী, ধীরে। যা শুনেছেন ওসব আসলে কিছু নয়। আমাদের ওই বাইশটা ক্লাস হচ্ছে কাজির গরু। খাতায় আছে, গোয়ালে নেই। আসলে আমাদের ক্লাস কতগুলো জানেন? সাকুল্যে বারো কি তেরোটা। বাকিগুলো সব টিউটোরিয়াল। তাও আবার বছরে মাত্র মাস-দুয়েক। ওই দুমাসের প্রথম একমাস ছাত্রদের চলে যায় স্যারদের খুঁজে বের করতেই। এই হাঁটাহাঁটিতেই বাছাধনদের শখের সলতে প্রায় নিভে আসে। এরপরেও যারা ঘোরাফেরা করে, তাদের বাড়ি থেকে পেল্লাই সাইজের দুয়েকটা প্রশ্ন মুখস্থ করে আসার টাস্ক দিলেই খেল খতম। বাছাধনেরা পালানোর জায়গা পায় না। এই হয়ে থাকে কলেজে বুঝলেন, সবাই এটা করে।' আমাকে অবাক হতে দেখে তিনি বললেন, 'আরে ভাই বুদ্ধি করে চলতে পারলে দুনিয়াটা শেষমেশ খুব একটা খারাপ জায়গা নয়।' বলে হা হা করে হাসতে লাগলেন। তাঁর কথার ভেতর থেকে একটা ব্যাপার বেরিয়ে এল—ঢাকা কলেজের ক্লাসের সংখ্যা আসলে আমাদেরই মতো। রুটিনে যে-দশটা টিউটোরিয়ালের উল্লেখ আছে সেগুলো নেহাতই দ্বাদশ শ্রেণীর, টেস্ট পরীক্ষার আগে সপ্তাহ-কয়েকের জন্যে করতে হয়। তখন ছাত্রেরা পরীক্ষা নিয়েই থাকে দিশেহারা। তাই অধিকাংশ সময়ই সেগুলো হয় না। খানিকটা শিক্ষকদের সক্রিয় উদাসীনতায়, খানিকটা ছাত্রদের অনুৎসাহে এগুলোর প্রাকৃতিক মৃত্যু ঘটে যায়। তাছাড়া সদিচ্ছা থাকলে এই সামান্য কটা ক্লাস নেওয়া আদৌ কঠিন নয়। জেনারেল ক্লাসের মতো চেঁচিয়ে গলা ফাটাতে তো আর হয় না। বসে বসে অল্পকিছু কথা বলে বা খাতা দেখে শেষ করে দেওয়া যায়। আমার মনে হল এটুকু বাড়তি কাজের জন্য দেশের সেরা ছাত্রদের থেকে দূরে থাকার মানে হয় না। টেকনিক্যাল কলেজের ছোট্ট অপরিসর পরিবেশের সংকীর্ণতা আর একঘেয়েমি এমনিতেই ভেতরে আমাকে ক্লান্ত করে এনেছিল। দেরি করলাম না। বদলির চেষ্টায় লেগে গেলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, একজন প্রভাষক পদোন্নতি পেয়ে চলে যাচ্ছিলেন ঢাকা কলেজ থেকে। ডি. পি. আই-এর কাছে আবেদন জানাতেই ঢাকা কলেজের ঐ পদে বদলির আদেশ জারি হয়ে গেল।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

টেকনিক্যাল কলেজ ছাড়তে গিয়ে টের পেলাম কত গভীরভাবে এই কলেজের প্রতিটা শিরা-ধমনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছি এই কয় বছরে। সে-সব থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে গিয়ে সারা অস্তিত্বে বৃক্ষপতনের আর্তনাদ অনুভব করলাম। শিক্ষকমণ্ডলীর অনেকেই আমার 'আপন ভোলা' স্বভাবের উল্লেখ করে আমার প্রতি তাঁদের গাঢ় অনুরাগের কথা জানালেন। অধ্যক্ষ আবদুর

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

রাজ্জাক তাঁর অনেক কথার মাঝখানে আমার ভেতর একজন খুদে দার্শনিকের অস্তিত্বের কথা ফিরে ফিরে উল্লেখ করতে ভুললেন না। অধ্যক্ষ রাজ্জাক থেকে শুরু করে কলেজের দারোয়ান পিয়ন পর্যন্ত সবাই আমাকে ভালোবেসেছিল। তাদের চোখে আমি নিঃশব্দ বিষণ্ণতা দেখতে পেলাম।

অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক ঐ কলেজে ছিলেন আরও বছর-দশেক। এরপর তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের যুগ্ম-মহাপরিচালক হয়ে যান। তিনি ছিলেন ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এবং দীর্ঘদিন এর প্রধান ধারক। অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি যে মূল্যবোধ এবং শৃঙ্খলা এই কলেজে জাগরূক রেখেছিলেন, তাঁর বিদায়ের পর, অযোগ্য ও অনৈতিক অধ্যক্ষদের হাতে, তা প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। কলেজ এখন প্রায় এক মূর্তিমান অরাজকতার প্রতীক।

৬

সোজা অধ্যক্ষ জালালের কাছে গিয়ে তাঁর হাতে বদলির আদেশনামা দিলাম। কাগজটার দিকে তাকিয়ে খুশিতে প্রায় হৈ চৈ করে উঠলেন তিনি, 'আরে আইয়া পড়ছেন দেখি। বসেন, বসেন।' তারপর খানিকটা খেদের সুরেই বললেন, 'আইলেনই যদি, আগে আইলেই তো হইত।'

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অধ্যক্ষ জালালের কাছ থেকে অযাচিত আদর পেয়েছিলাম। কলেজ লাইব্রেরির উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা ছোট্ট ঘর ছিল। দিন-দুয়েকের মধ্যে পড়াশোনার জন্যে ঘরটা আমাকে বরাদ্দ করে দিলেন তিনি। মাঝে মাঝে শওকত ওসমান গল্প করতে আসতেন সেখানে। এখন ওটা কলেজ লাইব্রেরির টয়লেট।

আশ্চর্য গুণগ্রাহিতা ছিল অধ্যক্ষ জালালের মধ্যে। যাঁদের তিনি শ্রদ্ধা বা আদরের যোগ্য মনে করতেন, সামন্ত-প্রভুদের মতো হাতের তালু উপুড় করে তাঁদের সবকিছু ঢেলে দিতেন। আমার নাম ছিল তাঁর আদরের খাতায়। সীমাহীন স্বাধীনতার ভেতর রেখেছিলেন তিনি আমাকে। একদিন তাঁর কাছে একটা ছুটির দরখাস্ত নিয়ে গিয়েছিলাম। দরখাস্ত দেখে তিনি খেপে উঠেছিলেন, 'দরখাস্ত আনছেন ক্যান? আপনারা জাত মাস্টার, ছাত্র ছাড়া বুঝেন না। আপনাগো আবার দরখাস্ত কী?—দরকার হইলে অন্যেগো ক্লাস বুঝাইয়া চইলা যাইবেন। দরখাস্ত দিব অরা, ঐ অযুইগ্য শার্কারগুলা।'

অদ্ভুত গর্বে সারাটা বুক ভরে গিয়েছিল। শিক্ষক হিসেবে এই মর্যাদাটুকুই তো আমরা চাই পৃথিবীর কাছ থেকে—কেবল এই নিঃশর্ত সম্মানটুকু। এটুকুর বিনিময়ে আমরা জীবনের সব বৈভবকে শিশুর মতো বিলিয়ে দিতে পারি। একটা

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

জাতি যখন তার শিক্ষকদের এই মর্যাদাটুকু দেয়, তখনই সেই জাতির ভেতর বড় শিক্ষক জন্মায়। শওকত ওসমানের মতো বলতে ইচ্ছা করে, 'দৌলত দিরহাম দিয়ে গোলাম কেনা যায়, ক্রীতদাস কেনা যায়, কিন্তু তার হাসি কেনা যায় না।' সামাজিক সম্মান বড় শিক্ষকের জন্মভূমি। এটুকু পেলে খেয়ে-না-খেয়ে সে জীবন দিয়ে দিতে পারে। আমাদের কালে যে বড় শিক্ষক জন্ম নিল না, তার একটা কারণ জাতির অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষককে এমনি মর্যাদা দেবার মতো মানুষ এদেশে ছিল না। দেশের প্রতিটা শক্তিমান মানুষ শিক্ষককে কেবল টাকায় কেনা চাকরই মনে করছেন। এমনি উজাড়-করা সম্মান সারা শিক্ষক-জীবনে কেবল তাঁর কাছ থেকেই আমি পেয়েছিলাম। আমার জানা ছিল এই সম্মান বা বাইরের এই আপাত-স্বাধীনতা কী কঠিন অধীনতার অন্য নাম। কিন্তু সে অধীনতা নিজের অধীনতা। নিজের বিবেকের, নিজের শ্রেয়োচেতনার অধীনতা। অধ্যক্ষ জালাল আমাকে ছুটি নেবার অমন নিঃশর্ত স্বাধীনতা দিয়েছিলেন বলেই শিক্ষকতার পরবর্তী পঁচিশ বছরে কলেজ থেকে ছুটি নেওয়া একরকম সম্ভবই হয় নি আমার পক্ষে। নিজের অন্তরের গৌরব ও আনন্দ—এই স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বলে এই কষ্ট বয়ে চলতে কষ্ট হয় না। কঠিন দায়িত্ব দিয়ে অধ্যক্ষ জালাল ভালো শিক্ষক হয়ে ওঠার দিকে আমাকে প্ররোচিত করেছিলেন। তাঁর প্রতি এজন্যে আজও আমার অনেক কৃতজ্ঞতা।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আরেকটা ঘটনার কথা মনে পড়েছে। সেবার কলেজ ম্যাগাজিনের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাদের বিভাগেরই একজন শিক্ষককে। আমি তখন 'কণ্ঠস্বর' সম্পাদনা করে চলেছি। ভদ্রলোকের পত্রিকা প্রকাশের অভিজ্ঞতা না-থাকায়, ঐ দায়িত্বটা তাঁকে না দিয়ে যেন আমাকে দেওয়া হয়, সেটা উত্থাপন করতে গিয়েছিলেন তিনি অধ্যক্ষের কাছে। তাঁর প্রস্তাবনা শুনে খেঁকিয়ে উঠেছিলেন অধ্যক্ষ জালাল, 'সায়ীদ তো একটা পত্রিকা বাইর করে। তুমি করডা কী'—বলে তিনি কী করেন এটা বোঝাবার জন্যে এমন দুটো অশ্রাব্য শব্দ ব্যবহার করেছিলেন যে কান লাল করে ফিরে আসা আমার সহকর্মীটির কাছ থেকে সেই শব্দদুটো বের করতে আমার বেশ কয়েকদিন লেগেছিল।

জালাল সাহেবের কথাবার্তার কোনো দরজা-জানালা ছিল না। কোনোকিছুই আটকাত না তাঁর মুখে। অশ্লীল ও আদিরসাত্মক কথাবার্তা অসংকোচে অনর্গলভাবে প্রায় মুড়ি-মুড়কির মতো বলে যেতেন। এসব বলতে তাঁর যেন একধরনের স্বর্গীয় আনন্দ ছিল। কারো উপর খেঁকিয়ে ওঠার সময় এ-ব্যাপারে প্রায় প্রতিভাবান হয়ে উঠতেন তিনি। নিরপরাধ আর নির্বিকারভাবে কথাগুলো এমন করে বলে যেতেন যে হাসিতে ফেটে পড়তে হত।

আমি যখন ঢাকা কলেজে যাই, শওকত ওসমান তখন ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। আমাদের যুগের বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান কথাসাহিত্যিক ও

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

গদ্য–লেখকদের মধ্যে শওকত ওসমান অন্যতম। অবিরল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখে যাবার এমন অতিপ্রজ ক্ষমতা আমার চারপাশে আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি। ছিপছিপে টানটান শরীরের শওকত ওসমান ছিলেন চিন্তা আর উৎসাহে ঝকঝক-করা ছুরির মতো ক্ষিপ্র। উচ্ছ্বিত আবেগ আর অস্থিরতায় তাঁর সারা অস্তিত্ব সারাক্ষণ অস্বস্তভাবে কাঁপত। এখনও, এই আশি বছর বয়সেও, তাঁর সেই অস্থির স্বভাব ও চৈতন্যের ক্ষিপ্রতা একইরকম সজীব। শিক্ষকতা এবং পড়ালেখার জগতের ভেতর শওকত ওসমান আত্মবিস্মৃতভাবে জীবন কাটিয়েছেন। মানসিকভাবে তিনি ছিলেন ইউরোপীয় রেনেসাঁর সম্পন্ন উত্তরাধিকারী, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের যুক্তিবাদী ধারার সন্তান। কলেজের পরিবেশে তাঁকে একটুকরো মূর্তিমান রেনেসাঁ বলে মনে হত আমাদের কাছে। জ্ঞানের জন্য তাঁর পিপাসা ছিল প্রজ্বলন্ত, সেই নিরন্তর পিপাসায় মশালের মতো তিনি জ্বলতেন।

শওকত ওসমানের প্রসঙ্গ তুললাম জালাল সাহেবের মধ্যে গুণগ্রাহিতা–যে কোন্ পর্যায়ের ছিল তা বোঝানোর জন্যে। অধ্যক্ষ জালাল শওকত ওসমানকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন। ধর্মের ব্যাপারে শওকত ওসমানের অসহনীয়রকম বিরূপতা ছিল। তাঁর প্রকাশ্য নাস্তিকতা আমাদের সময়কার অন্যতম বিখ্যাত ব্যাপার। ভলতেয়রের যোগ্য শিষ্য হিসেবে ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীলতার যে–কোনো বিকৃতি, ভণ্ডামি এবং অন্ধতার ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ছিল তিক্ত এবং আক্রমণ ছিল নৃশংস। ক্লাসে প্রায়ই ধর্ম নিয়ে তীব্র সমালোচনা করতেন। এসব ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠা ইসলামী ছাত্র সংঘের মৌলবাদী সদস্যেরা তার বিরুদ্ধে অধ্যক্ষের কাছে নালিশ করার অজুহাত খুঁজছিল। তাঁর দুর্বল জায়গা বের করা কঠিন ছিল না। ক্লাসে কখনোই সিলেবাস ধরে পড়াতেন না তিনি। জীবন, শিল্প, সমাজ, দর্শন, বিজ্ঞান—জ্ঞানের এমনিতরো যে বিষয় যেদিন তার মনে আসত তা নিয়ে ছাত্রদের বলে যেতেন। তার পড়াশোনা ছিল বিস্তর, সেইসঙ্গে ছিল তীব্র উজ্জ্বল রসোপলব্ধি ও মৌলিকতা। কাজেই বাচনভঙ্গিতে কিছুটা শ্রুতিমধুরতার ঘাটতি থাকলেও অগ্রসর ছাত্রদের স্বপ্নজগত বিকাশের জন্যে তার ক্লাসগুলো ছিল খুবই অনুপ্রেরণা–সজীব। কিন্তু এইসব দার্শনিক ও শৈল্পিক চিন্তাভাবনা যে সাধারণ ছাত্রদের পরীক্ষার ব্যাপারে কোনোরকম সাহায্য করে না তা প্রমাণ করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ইসলামী ছাত্রসংঘের ছাত্রেরা পরিকল্পনা করেছিল তারা অভিযোগ তুলবে দুই পর্বে। প্রথম পর্বে শওকত ওসমান যে ক্লাসে সিলেবাসের গল্পকবিতাগুলো পড়ান না এই কথা দিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তারা তাঁর ধর্মবিরোধিতার কথাটি অধ্যক্ষ জালালের কাছে তুলে ধরে তাঁর ন্যায্য বিচার দাবি করবে। পরিকল্পনামতো একদিন সাত–আটজন ছাত্র কয়েকজন অভিভাবককে সঙ্গে নিয়ে অধ্যক্ষ জালালের কামরায় গিয়ে নালিশ রুজু করতে শুরু করল। কিন্তু 'শওকত ওসমান ক্লাসে পড়ান না' কথাটা কানে যেতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন অধ্যক্ষ জালাল। তীক্ষ্ণ

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কণ্ঠে বলে চললেন, 'না, শওকত ওসমান তো ছাত্র পড়াইবার জন্য এই কলেজে নাই। হি ইজ দ্যা ডেকোরেশন অফ দ্য কলেজ। উনি হইল কলেজের শোভা। হারামজাদারা, প্রত্যেকদিন সকালে উইঠা এমন একজন মানুষরে যে চোখের সামনে দেখতে পারস এই তোগো সাতপুরুষের ভাইগ্য—আবার আইছস নালিশ করতে?' বলে এমন ভয়ংকর চেহারা নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে ছাত্রদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন যে, অভিযোগকারী আর তাদের অভিভাবকেরা কোথায় যে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল খুঁজেও পাওয়া গেল না।

যে আইয়ুব-মোনায়েম চক্রের সঙ্গে যোগসাজশের শক্তিই ছিল কলেজের ওপর অধ্যক্ষ জালালের একনায়কতন্ত্রী কর্তৃত্বের মূল উৎস, ১৯৬৯-এর দিকে সেই চক্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই কলেজের ওপর তাঁর কর্তৃত্বের অবসান নিশ্চিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য যে, ঐ সময়টাই ছিল তাঁর চাকরি থেকে অবসরের বছর। ফলে খেসারতহীনভাবেই তিনি চাকরি থেকে বিদায় নিতে পেরেছিলেন। যাবার সময় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'আল্লাহ মানে মানে সারাইছে।'

তিনি কলেজ থেকে চলে গেলেন, কিন্তু শিক্ষা-পরিবেশের যে উন্নত মানদণ্ড তিনি এতদিন কলেজের চত্বরে উঁচু করে রেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন কলেজ থেকে বিদায় নিল না। উল্টে তা কলেজের একটা বৈভবময় ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়াল। কলেজের প্রতিটি শিক্ষক-ছাত্র ঐ সম্পন্ন মূল্যবোধের জন্য গর্ববোধ করতে লাগল এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট হয়ে রইল। একটা গৌরবময় ঐতিহ্যের শক্তি যে কী পরিমাণ তা নিজেদের দিকে তাকিয়েও ঐসময় আমরা বুঝতে পারতাম। চারপাশের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখেও আমরা, কলেজের শিক্ষকেরা, ঐ ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার জন্যে প্রাণপাণে চেষ্ট করে গিয়েছি। কেবল আমরা নই, দেশের বিভিন্ন জাতীয়করণকৃত নিম্নমানের কলেজের বিশৃঙ্খল এবং অকর্ষিত পরিবেশ থেকে আপদমস্তক অনৈতিকতা ও অশিক্ষার ছাপ নিয়ে যে-সব শিক্ষক আমাদের কলেজে বদলি হয়ে আসতেন, তাঁরাও এক অদ্ভুত ও ব্যাখ্যাতীত প্রভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই ঐ ঐতিহ্যকে ভালোবেসে ফেলতেন এবং তাকে উঁচু করে রাখতে আমাদের মতোই জীবনপণ লড়াই করতে থাকতেন। এ দেখে আমার সেই পুরোনো আপ্তবাক্যটাই মনে হত : মানুষ আসলে ভালো কিছুকেই খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু সে খারাপ হয়ে যায় পরিবেশের বৈরিতায়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

জালালউদ্দীন আহমদের পরের অধ্যক্ষগণ

১

জালালউদ্দীন আহমেদের পর ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হন ড. হাফেজ আহমেদ। শারীরিকভাবে বলিষ্ঠ অধ্যক্ষ হাফেজ আহমেদ ছিলেন কর্মঠ, মজবুত ও খাটুয়ে মানুষ। তাঁর ওপর যখন যে দায়িত্ব আসত পাহাড়–পর্বত উপড়ে তা তিনি সমাধা করতে পারতেন। এ–ব্যাপারে তিনি ছিলেন বুলডোজারের মতো অপ্রতিরোধ্য। সবাইকে নিয়ে সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি উনসত্তুরের অভ্যুত্থান– বিধ্বস্ত কলেজের ব্যবস্থাপনাকে মোটামুটি সুস্থ করে তুলেছিলেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অধ্যক্ষ জালাল সাহেবের নয় বৎসরের কর্তৃত্বপরায়ণ প্রশাসন, ভালোবাসা ও ভয়ের পরিবেশ কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে একটা প্রশ্নহীন আনুগত্যের ঐতিহ্য তৈরি করেছিল। অধ্যক্ষের যাবতীয় আদেশ–নির্দেশ কলেজের সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে করা হচ্ছে মনে করা হত বলে অধ্যাপকেরা সেইসব নির্দেশকে সশ্রদ্ধভাবে পালন করতে পেরে নিজেদের কৃতার্থ মনে করতেন।

উত্তরাধিকারসূত্রে অধ্যক্ষ হাফেজ ঢাকা কলেজের শিক্ষকদের কাছ থেকে এই সহযোগিতা পেয়েছিলেন। কিন্তু ড. হাফেজের অনুকূলে শিক্ষকদের এই সহযোগিতা খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এটা হয়নি দুটো কারণে।

কিছুদিনের মধ্যেই অধিকাংশ শিক্ষক অনুভব করতে থাকেন যে শিক্ষকদের আনুগত্যের সুযোগে তাঁদের দিয়ে তিনি এমন অনেক কাজই করিয়ে নিচ্ছেন যা আপাত–চোখে ঢাকা কলেজের উন্নতির জন্যে করা হচ্ছে মনে হলেও যার আসল লক্ষ্য কলেজ পরিচালনায় তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে প্রদর্শন করা ও তা দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেয়া। পেশাগতভাবে তিনি ছিলেন অদমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। শেষপর্যন্ত এই লক্ষ্যে তিনি সফলও হয়েছিলেন।

অধ্যক্ষ জালাল যে কখনো নিজের স্বার্থে শিক্ষকদের ব্যবহার করেন নি তা নয়, কিন্তু তার পরিমাণ ছিল কম। আগেই লিখেছি তিনি ছিলেন একগুঁয়ে, জেদি।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কর্তৃপক্ষকে তোয়াজ করা দূরে থাক, কর্তৃপক্ষকে দিয়ে নিজের তোয়াজ করাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। এর জন্যে চাকরি জীবনে তাঁকে খেসারত দিতে হয়েছিল মাত্রাতিরিক্তরকমে। চাকরিতে তাঁর পদোন্নতি একটা পর্যায়ের পর প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এম. এ.-তে তিনি ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেছিলেন কিছুদিন। কিন্তু এসব যোগ্যতাও তাঁর জন্যে খুব একটা কাজে আসে নি। তাঁর বহু জুনিয়র অফিসার তাঁকে ডিঙিয়ে ওপরে উঠে গিয়েছিল। উনি আমাকে যখন ইন্টামিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজ থেকে ঢাকা কলেজে নিয়ে আসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখনো পূর্ব পাকিস্তানের জনশিক্ষা পরিদপ্তরের বড়কর্তা ডি পি আই ফজলুর রহমান ছিলেন তাঁর ছাত্র। এ থেকেই বোঝা যায় পেশাগত জীবনে কতখানি ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল তাঁর। জালাল সাহেব পদোন্নতির আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, ছিলেন কর্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষী। তাই শিক্ষা বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ের চুনোপুঁটিদের তোয়াজ করার বদলে সরাসরি প্রদেশিক গভর্নরের সঙ্গেই আঁতাত গড়ে তুলেছিলেন। চাকরি-জীবনে উন্নতির আশা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকা কলেজকে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে গড়ে তুলে ঐ প্রতিষ্ঠানের গরিমার সঙ্গে নিজেকে স্মরণীয় করার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

ড. হাফেজের চরিত্রকে উচ্চাভিলাষী মনে হওয়ায় এবং কলেজের স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থ বেশি করে হাতিয়ে নিচ্ছেন বলে অনুভব করায় তাঁর প্রতি শিক্ষকদের সহানুভূতি কমে যেতে শুরু করে এবং শিক্ষকদের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তাঁর বেশকিছু পদক্ষেপ শিক্ষকদের অসম্ভব মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে শিক্ষকদের ঐ ক্রোধ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। শিক্ষক-সম্প্রদায় এককাট্টা হয়ে তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-বিরোধিতার অভিযোগ এনে তাঁর অপসারণ দাবি করে। কোনো অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের বিদ্রোহ ঢাকা কলেজে সম্ভবত ঐ প্রথম।

আমার ধারণা তাঁর এই বিপর্যয়ের জন্য তিনি যতটা দায়ী, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি তার চেয়ে কম দায়ী ছিল না। তাঁর কলেজে আসার কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয়েছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এই সময় যিনিই অধ্যক্ষের পদে থাকতেন তাঁকেই বাধ্য হয়ে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর পক্ষ হয়ে বাঙালিদের বিরুদ্ধে কাজ করতে হত। তাঁকেও তাই করতে হয়েছিল। তবে আমার ধারণা এই কাজটি হয়ত একটু বাড়াবাড়িরকমে করতে শুরু করেছিলেন তিনি। অযথাই কলেজের শিক্ষকদের ওপর দুর্বহ মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন। এটা বাড়তে বাড়তে এমন এক পর্যায়ে পৌছায় যে শিক্ষকমহলে রটে যায় যে একাত্তরের সেই ছাত্র-শূন্য কলেজ মিলনায়তনে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বাধ্যতামূলকভাবে জোহরের নামাজ পড়ানোর চেষ্টা করছেন তিনি। এছাড়া

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বিভিন্ন সময় তাঁর নানান ধরনের পাকিস্তানপন্থী কথাবার্তা এবং আরও অনেক কারণেই শিক্ষকেরা শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিজেদের লোক বলে বা স্বাধীনতার পক্ষের মানুষ বলে মনে করতে পারে নি।

রাতারাতি মানচিত্র বদলে দেবার জাদুকরি প্রতিভা ছিল ড. হাফেজ আহমদের। সবাই এ-রকম একটা কিছুই আশঙ্কাও করছিলেন। কিন্তু এবার, দেশের সেই উত্তাল পরিস্থিতির কারণে তার কোনো তৎপরতাই ঠিকমতো কাজে এল না। তাঁর পাওনা তিনি পেলেন। তাকে ও.এস.ডি. করে কলেজ থেকে অপসারণ করা হল।

২

এই সময় আমার জন্যে একটা ভারি বিব্রতকর ঘটনা ঘটে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই, খুব সম্ভব এপ্রিল মাসের কোনো-এক সময়ে শওকত ওসমান যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে যান। ফলে তাঁর ঢাকা কলেজের কনিষ্ঠ অধ্যাপকের পদটি শূন্য হয়ে পড়ে। ১৯৬৪ থেকে আমি নানা ওজর-আপত্তি তুলে ঢাকার বাইরে আমার বদলি ও পদোন্নতি ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। শিক্ষা পরিদপ্তর এই শূন্য-পদের সুযোগ পাওয়া মাত্র শওকত ওসমানের জায়গায় আমাকে পদোন্নতি দিয়ে বসল। তাদের বক্তব্য : 'এতদিন ঢাকায় পদোন্নতি চেয়েছ, এখন সেই ঢাকাতেই পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। এখন প্রোমোশন ফেরানোর কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।' আগেই বলেছি দুটো কারণে আমি চাকরিতে পদোন্নতি এড়িয়ে চলেছি। এক. ঢাকার বাইরে যেতে হবে এই ভয়ে। দুই. চাকরিতে বেশি দায়িত্বের মধ্যে জড়াতে হবে এই আশঙ্কায়। দুটোই নিজের ইচ্ছেমতো নিজের আনন্দের কাজগুলো করে যেতে পাবার স্বার্থে। পদোন্নতি নিলেও এ-ব্যাপারে বিপদের সম্ভাবনা। পদোন্নতি মানে বেশি কাজ, বেশি দায়িত্ব, বেশি উৎকণ্ঠার মধ্যে আস্তে আস্তে সেঁধিয়ে যাওয়া। নিজের আনন্দ আর তৃপ্তির জায়গাগুলো ফেলে অপ্রিয়, বিরুদ্ধ, আর আত্মক্ষয়কারী কাজ আর উত্তেজনার মধ্যে পুড়তে পুড়তে নিজেকে ছাই করে দেওয়া। আমি এমন একটা কর্মজীবন চেয়েছি, যা ভারমুক্ত, হালকা আর সুনীল। যেখানে আমার ইচ্ছামতো কাজ আমি প্রাণভরে করে যেতে পারব। আগেই ইঙ্গিত করেছি একজন কলেজ-শিক্ষক আমাদের যুগে একজন ঘর-জামাইয়ের মতো আয়েশি জীবন কাটিয়ে গেছে। ঘর-জামাইয়ের মতো একটি নিষ্কর্মা পেশা আমার জন্যে সারাজীবন সত্যি সত্যিই দরকার ছিল।

আমি নিজেও সে-সময় কলকাতা চলে যাবার জন্যে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, কিন্তু কারো সঙ্গে ঠিকমতো যোগাযোগ করে উঠতে পারছিলাম না। তাছাড়া একটি

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

গুরুতর পারিবারিক কারণেও ব্যাপারটা আরও বেশি কঠিন হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করতে না পেরে এমনিতেই আত্মগ্লানিতে ভুগছিলাম, ঠিক সে-সময় একজন মুক্তিযোদ্ধার জায়গায় বিশেষ করে শওকত ওসমানের মতো মানুষের জায়গায় আমার প্রোমোশন আমাকে অসম্ভব ছোট করে দিতে লাগল। আমি আমার পদোন্নতি বাতিল করে শওকত ওসমানের জায়গায় আর কাউকে নিয়োগ দেবার জন্য নানানভাবে তদবির করতে লাগলাম। প্রথমে ড. হাফেজের সঙ্গে কথা হল। ড. হাফেজ আমার নৈতিক সংকটটি ভালো করে ধরতে না পারলেও এই ভাবালুতা যে আমার চাকরির ক্ষতির কারণ হবে তা সহানুভূতি দিয়েই বুঝলেন। বললেন, 'এইসব অযথা সেন্টিমেন্ট দিয়ে ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন না। প্রমোশনটা নিয়ে নেন।'

আমি আমতা আমতা করছি দেখে তিনি বললেন, 'শওকত ওসমানের জায়গায় কেন প্রমোশন নিলেন, এটা তো কেউ কোনোদিন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে না। ওটাতো আপনি করেন নাই, করছে সরকার। আপনি আপনার মতো জয়েন করে ফেলেন।'

নিজের বিবেককে বুঝ দেওয়ার জন্যে যুক্তিটা খারাপ নয়। কিন্তু তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন আন্তরিক দরদের সঙ্গে। আমি তার গলায় ব্যক্তিগত মমতার ছোঁয়া অনুভব করলাম।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তাঁর সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়ে সেদিনই আমি দেখা করলাম জনশিক্ষা পরিচালক ফেরদৌস খানের সঙ্গে। সমস্ত ঢাকা তখন সন্ত্রস্ত এবং রাস্তাঘাট জনমানবশূন্য।

শওকত ওসমানের পদে আমার যোগদানের অনিচ্ছার কথা তাঁকে বললাম। জ্ঞানসাধনায় একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত ফেরদৌস খান লেখক এবং সফল অধ্যাপক হিসেবে সেকালে সবার কাছে সুপরিচিত ছিলেন। আমার আশা ছিল আমার অসুবিধা তিনি বুঝবেন। কিন্তু আমার অনুরোধ শুনে তিনি হঠাৎ করেই তিক্ত হয়ে উঠলেন। যে-উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তার আতঙ্ক একাত্তুরে এদেশের সব সরকারি কর্মকর্তার চেহারায় দেখা যেত তাঁর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চোখেমুখে আমি সেই একই নিরাপত্তাহীনতার আতঙ্ক দেখতে পেলাম। সে-সময় এঁরা সবাই ছিলেন নিজেদের সঙ্গে যুদ্ধরত এবং রক্তাক্ত। হৃদয়ের ভেতর এঁরা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু এঁদের কাজ করতে হত মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর পক্ষে। এঁদের সবারই তখন একদিকে ছিল বিবেকযন্ত্রণা অন্যদিকে অস্তিত্বের আতঙ্ক। এই পরিস্থিতিতে কারও মাথা সুস্থ থাকার কথা নয়। হয়ত তাঁরও তা ছিল না।

মিতভাষী ফেরদৌস খান ক্ষুব্ধস্বরে আমাকে বললেন, 'এভাবে বারবার আপনার পদোন্নতি প্রত্যাখ্যান সরকারের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আপনি যদি ঢাকা কলেজে পদোন্নতি নিতে রাজি না হন, তবে প্রভাষক হিসেবেই আপনাকে দিনাজপুরে বদলি করে দেওয়া হবে।'

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমি বুঝলাম তিনি ধমক দিয়ে ঝামেলা এড়াতে চাচ্ছেন। কিন্তু দিনাজপুরের নাম শুনতেই আমার বুক শুকিয়ে উঠল। না, দিনাজপুর কোনো খারাপ জায়গার নাম নয়। ভালো জাতের আম আর লিচু পাওয়া যায় সেখানে। ছেলেবেলায় ঐ আম-লিচুর মৌসুমে গিয়েছিলাম সেখানে। কিন্তু সেই সময় ঢাকায় দিনাজপুর সম্বন্ধে যে-সব খবর এসে পৌঁছোচ্ছিল তা ভয়াবহ।

স্বাধীনতাযুদ্ধের ঠিক শুরুতে দিনাজপুর ছিল মুক্তিবাহিনীর হাতে। সেই সময় বহু বিহারি সেখানে বাঙালিদের হাতে নিহত হয়েছে। পরবর্তীতে পাকিস্তানি সৈন্যরা শহর দখল করে নিলে শুরু হয় ঐ নৃশংসতার প্রতিশোধ-পর্ব—নির্বিচার বাঙালি নিধন। দিনাজপুর তখন জনমানবহীন এক ভূতুড়ে শহর। সেই শহরের উদ্দেশে রওনা হতে হবে আমাকে। এর চেয়ে সোজা বাঘের মুখে ঢুকে যাওয়া আমার পক্ষে অনেক সহজ। অর্থপূর্ণও।

কিন্তু কপাল ভালো হওয়ায় সেই দুর্যোগ থেকেও সে-যাত্রায় বেঁচে গেলাম। বাঁচিয়ে দিলেন আমার এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের কনিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন তিনি। ঢাকা কলেজের গর্বিত অধ্যাপক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর বহুদিনের। পদ না-থাকায় আসতে পারছিলেন না। ১৯৬৪ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ইন্টারভিউ দিয়ে আমরা একইসঙ্গে কনিষ্ঠ অধ্যাপক হয়েছিলাম। তিনি পদোন্নতি নেওয়ায় এবং আমি না-নেওয়ায় তিনি তখন আমার সাত বছরের সিনিয়র। শওকত ওসমান চলে যাচ্ছেন গন্ধ পেয়েই তিনি ঐ পদটি ছোঁ মেরে নেবার চেষ্টায় নেমেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ঐ পদে আমার নিয়োগ হয়ে যাওয়ায় তিনি পড়েছিলেন মহা ফাঁপরে। এসবের কিছুই আমি জানতাম না। আমি শওকত ওসমানের পদে যোগ দিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁর অসুবিধা কেটে গেল। যেদিন থেকে আমি শওকত ওসমানের পদে যোগ না-দেবার জন্যে তদবির শুরু করেছিলাম ঠিক সেদিন থেকে তিনিও নিঃশব্দে ঐ পদে যোগ দেবার জন্যে একইভাবে তদবির করে যাচ্ছিলেন। এমন নিঃশব্দ বেড়ালের মতো কাজটা তিনি করছিলেন যে, ব্যাপারটা আমি জানতেও পারি নি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

জনশিক্ষা পরিচালক তাঁর প্রস্তাব পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। তাঁকে ঢাকা কলেজে শওকত ওসমানের পদে আর আমাকে জগন্নাথ কলেজে তাঁর পদে পাঠিয়ে দিয়ে নিপুণ-শিকারির মতো এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছিলেন তিনি—সাপ মেরে এবং লাঠি না ভেঙে। হঠাৎ একদিন দেখলাম আমার সেই শ্রদ্ধেয় সহকর্মী ঢাকা কলেজে শওকত ওসমানের পদে যোগ দিতে এসেছেন। বৈষয়িকভাবে আমি চির-নির্বোধ মানুষ। চিরদিন অর্থহীন সেন্টিমেন্টের জন্য ঠকেছি। এবারেও ঠকতে হল। প্রিয় ঢাকা কলেজের দিকে বিষণ্ন-দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে পদোন্নতি নিয়ে জগন্নাথ কলেজে যোগ দিতে রওনা হয়ে গেলাম।

জগন্নাথ কলেজে আমি ছিলাম দু-বছর। সে-প্রসঙ্গে পরে সংক্ষেপে দুয়েক কথা বলব। আপাতত ঢাকা কলেজের প্রসঙ্গেই থাকি।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৩

জগন্নাথ কলেজ থেকে আমি ঢাকা কলেজে ফিরে আসি ১৯৭৩ এর প্রথম দিকে। শিক্ষক হিসেবে আমার পরবর্তী বিশ বছর কেটেছে এই কলেজে। এই সময়ের মধ্যে বেশকিছু সুযোগ্য অধ্যক্ষ এখানে এসেছেন। উজ্জ্বল শিক্ষকও একেবারে কম ছিলেন না। তবু এই কলেজ ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আমার চোখের সামনেই একসময় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। এর ভেতরকার উচ্চায়ত মূল্যবোধ এবং শ্রেয়োবাধের পিপাসা নিঃশব্দ মৃত্যুর সংক্রমণে ধীরে ধীরে রুগ্‌ণ ও অবসিত হয়েছে।

কীভাবে এই কলেজের জীবনে অবক্ষয়ের সংক্রমণ ঘটল এবং তা কলেজের সম্পন্ন ঐতিহ্যকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে আনল, এই বইয়ের অনেকখানি জুড়ে আমি তা তুলে ধরতে চেষ্টা করব। কেবল এই কলেজ নয়, এদেশের গোটা শিক্ষাঙ্গনই কী করে ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দ্বারা আমুণ্ডুপদনখ কবলিত হল আমার এই বইয়ের পরবর্তী পৃষ্ঠগুলোর তা-ই হবে মূল প্রতিপাদ্য।

ড. হাফেজের পর ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন ড. আজহার হোসেন। ইনি সেই ইংরেজির অধ্যাপক যিনি আর আমি রাজশাহী কলেজ লাইব্রেরিতে পাশাপাশি টেবিলে বসে ঘনিষ্ঠতা এবং অপরিচয়ের ভেতর একান্তে বসে অনেকদিন পড়াশোনা করেছি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আজহার হোসেন ছিলেন অভিজাত মেজাজের মানুষ। কিন্তু যে-সময় তিনি অধ্যক্ষ হয়ে এলেন সে-সময় জাতীয় জীবনের মতো কলেজ-জীবনেও অরাজকতার অপ্রতিহত প্রতাপ চলছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে মূল ভূমিকা নিয়েছিল ছাত্রেরা। স্বাধীনতাযুদ্ধের পর ছাত্রনেতারাই তখন হয়ে দাঁড়িয়েছে সারাদেশের মতো শিক্ষাঙ্গনগুলোরও হর্তাকর্তা। তাদের আদেশ-নির্দেশই তখন আইন। মন্ত্রীরাও তাঁদের কথায় ওঠে বসে। সারাদেশটাই তখন নীতি আদর্শশূন্য একদল অরাজক তরুণের হাতে জিম্মি। আজহার হোসেন প্রথম অস্বস্তিতে পড়লেন একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি নিয়ে। সবসময়ই ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ঢাকা কলেজের ছাত্র ভর্তি করা হয়। এই পরীক্ষা যেমন কঠিন তেমনি নিশ্ছিদ্র ও নিরপেক্ষ। হস্তক্ষেপহীন এই ভর্তি পরীক্ষার সুষ্ঠুতা ও স্বচ্ছতাই ছিল ঢাকা কলেজের শিক্ষা-পরিবেশ ও ন্যায়নীতির প্রাণ। এতে যারা সেরা ফল করত, কেবল তারাই হত ঢাকা কলেজের ছাত্র। আমি এ-সময়ে ঢাকা কলেজে ছিলাম না। শুনেছি ছাত্রনেতারা দলীয় কারণে এমন বেশকিছু ছাত্রকে ভর্তি করার জন্য অধ্যক্ষ আজাহার হোসেনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল যাদের অধিকাংশই হয় ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করা, নয়ত পরীক্ষা পর্যন্ত দেয় নি। আগেই বলেছি আজাহার হোসেন ছিলেন উচ্চমূল্যবোধসম্পন্ন বিদগ্ধ মানুষ। এই শ্রেণীর অপোগণ্ড ছাত্রনেতাদের সঙ্গে ঐ অনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে তাঁর রুচিতে বাধছে অথচ ছাত্রনেতাদের অকর্ষিত চাপের মুখে তিনি দড়ি ঢিলে না দিয়েও পারছেন না। শুনেছি এসব নিয়মবহির্ভূত ছাত্রদের ভর্তি

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

করতে গিয়ে তিনি তাঁর বিবেক বাঁচিয়েছিলেন একটা অদ্ভুত উপায়ে। প্রতিটা ভর্তিপত্র সই করার আগে 'বাস্টার্ড' শব্দটি উচ্চারণ করে তারপর নাকি তিনি সেটাতে সই করতেন। ঐ অসম্মানজনক শব্দটা উচ্চারণ করলেও তিনি-যে ভর্তি-ফরমে শেষপর্যন্ত সই করছেন এজন্যেই নাকি ভর্তিচ্ছু ছাত্র ও ছাত্রনেতারা আনন্দে গদগদ হয়ে পরিতৃপ্ত ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে তাঁর সামনে থেকে বিদায় নিত।

একটা রক্ষকহীন যুগের একজন অসহায় বিবেকবান মানুষ যেভাবে নিজের লুণ্ঠিত বিবেককে রক্ষা করতে পারেন, তিনি তারই চেষ্টা করেছিলেন। এই ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির প্রতি দুরপনেয় ঘৃণায়, না ভালো চাকরি পাবার ফলে ঠিক জানি না—আজাহার হোসেন কিছুদিনের মধ্যে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

৪

আজাহার হোসেনের পর ঢাকা কলেজের অধ্যাপক হয়ে আসেন পঞ্চাশের দশকের খ্যাতিমান কথাশিল্পী আলাউদ্দীন আল আজাদ। আলাউদ্দীন আল আজাদের নাম আমি প্রথম শুনি বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে পড়ার সময়, আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তরুণ প্রভাষক মোখলেসুর রহমানের মুখে। স্যার তখন সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসা তরতাজা তরুণ। তীব্র উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্য তাঁর সারা অবয়বে। সাহিত্য নিয়ে আমাদের মাতামাতিকে তিনি দূর থেকে সকৌতুকে লক্ষ করতেন। একদিন বিকেলে কলেজের ধার-ঘেঁষা রেললাইন ধরে আমরা কয়েকজন তাঁর সঙ্গে হাঁটছি, হঠাৎ করেই তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লেখার ব্যাপারে কাকে ফলো কর তুমি?' সেকালে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র হয়ে তারাশঙ্কর মানিক পর্যন্ত আমাদের সাকুল্য দৌড়। তাঁদের কথাই ভয়ে ভয়ে বলার চেষ্টা করলাম। শুনে তিনি হাতের এক ঝটকায় সবাইকে মাছির মতো তাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আলাউদ্দীন আল আজাদের মতো লিখবে। উনিই সবচেয়ে ভালো আজকাল।' তার গলায় আত্মপ্রত্যয়ের স্বর। তাঁর কথা শুনে মনে হল ঐ যুগের সাহিত্যের সর্বোচ্চ যে সম্পন্নতার কথা কল্পনা করা যেতে পারে তার নাম ঐ আলাউদ্দীন আল আজাদ। তার ওপরে আর কিছু নেই।

জানতে উৎসুক হলাম কে এই আলাউদ্দীন আল আজাদ যার মতো লিখতে পারাতেই লেখক-জীবন চরিতার্থ হবে। মনে মনে তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু ঢাকায় যিনি সবে গরম শিঙাড়ার মতো পিরিচে পিরিচে পরিবেশিত হচ্ছেন সেকালের বাগেরহাটের মতো সুদূর মহকুমা শহরে—ঢাকা থেকে রওনা দিয়ে

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তিনবার ট্রেন বদলে যেখানে পৌঁছোতে চব্বিশ-পঁচিশ ঘণ্টা সময় লাগে, সেখানে তাঁকে কী করে পাব? সেই সুদূর অঞ্চলে তিনি রাজধানী থেকে ভাগ্যদোষে ছিটকে পড়া এক-আধজন তরুণ বয়সী অধ্যাপকের উৎসাহী রটনা ছাড়া আর কী?

এই ঘটনার দেড়-দুই বছরের মধ্যে ঢাকায় এসে তাঁর তিনটি গল্পগ্রন্থ 'জেগে আছি', 'ধানকন্যা', 'মৃগনাভি' একে একে পড়ার সুযোগ হল। ধোঁয়া-ওঠা তাজা চায়ের মতো সীমিত পরিসরের একরাশ পরিপাটি গল্প সে-সব। স্বাদে উষ্ণতায় মনকে ফুরফুরে করে তোলে। সে-সময়কার পূর্ব পাকিস্তানের নতুন সাহিত্যের সূচনাপর্বে গল্পগুলো সম্ভাবনার আশা জাগানোর মতো। পরবর্তীতে তাঁর লেখা 'বৃষ্টি' গল্পটি আমার ধারণা, বিষয় ও পরিবেশনার অসামান্যতার জন্যে বাংলাভাষার স্মরণীয় গল্পগুলোর সারিতে জায়গা পাওয়ার দাবি রাখে।

১৯৫০ সালে আবদুর রশীদ খান সম্পাদিত 'নতুন কবিতা'য় তাঁর একগুচ্ছ কবিতা চোখে পড়েছিল আমার। সেগুলোর ভেতর 'মিউজিয়ামের সিঁড়ি' কবিতাটি পড়ার সময়কার শিহরণময় অনুভূতিগুলো আজও আমি ভুলতে পারিনি। সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পটার শেষ অনুচ্ছেদের মতো অনেক বিলুপ্ত সভ্যতার অপসৃয়মাণ বিমর্ষতা যেন ছড়িয়ে ছিল তার বিচূর্ণিত অবয়বে। সেকালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন, যূথবদ্ধ প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আদিম বলিষ্ঠতার স্মৃতি, উষ্ণ বলীয়ান জীবনের গন্ধ তাঁর লেখায় নতুনত্বের আস্বাদ এনেছিল।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ভালো কবিতা ও উপন্যাসও লিখেছেন তিনি। গল্প ছাড়াও বেশকিছু ভালো উপন্যাস আছে তাঁর। তাঁর 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসে শিল্পীদের বোহেমিয়ান জীবনধারা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাঁর সনেটগুলো নিটোল, সাবলীল ও কাব্যান্বিত। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় ছাত্রদের তৈরি করা শহীদ মিনার পুলিশ ভেঙে দেবার পর তাঁর লেখা কবিতা 'স্মৃতির মিনার'-এর কিছু লাইন এখনও মাদকতা জাগায় :

> স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার?
> ভয় কী বন্ধু, আমরা এখনো চার কোটি পরিবারে
> খাড়া রয়েছি তো।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর, ঢাকা-কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের যে-যাত্রা শুরু হয়, তাঁর প্রথম খ্যাতিমান লেখক আলাউদ্দীন আল আজাদ।

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে আলাউদ্দীন আল আজাদের সময়-পরিসর খুব দীর্ঘ হয় নি। অধ্যক্ষ আজাহার হোসেনের মতো দংশিত বিবেক নিয়ে অনৈতিকতাকে সহজ বিজয়ে ছেড়ে দিতে তাঁর আগ্রহ ছিল না। ছাত্রনেতাদের

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অযৌক্তিক দাবিদাওয়া আর খবরদারিকে তিনি সরাসরি প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেন। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষেরা সব কাজই শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে করতেন। এটাই ছিল এই কলেজের ঐতিহ্য। কিন্তু অধ্যক্ষ আজাদ ছাত্রনেতাদের মুখোমুখি হলেন একা। রক্ত-প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন শিল্পী, তাই হয়ত শিল্পীর একাকিত্বকেই নিয়তি হিসেবে গ্রহণ করেচিলেন। কাউকে ডাকেন নি, কারো সাহায্য নেন নি, ফল যা হবার তাই হয়েছিল। ছাত্রনেতাদের বিরোধীতার মুখে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে তাঁকে কলেজ থেকে বদলি হতে হয়েছিল।

৫

আলাউদ্দীন আল আজাদের পর ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হন খোরেশদ আলম চৌধুরী। অধ্যক্ষ জালালউদ্দীন আহমদের সময় থেকে জনাব আজাদের সময় পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই কলেজের উপাধ্যক্ষ। ঢাকা কলেজে আমার তেইশ বছরের শিক্ষকতা জীবনে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ জালালের প্রায় সবগুলো গুণ ছিল তাঁর মধ্যে, কিন্তু তাঁর দোষগুলোর কোনোটাই ছিলনা। জালালউদ্দীন আহমদের মতোই দুঃসাহসী, আপোষহীন এবং অনমনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। উন্নত শিক্ষা-আদর্শ এবং ন্যায়নীতির ব্যাপারে কঠোর ও অবিচল অবস্থান নিয়ে তিনি ছাত্রনেতাদের কেবল-যে নৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় করে ফেললেন তাই নয়, কলেজের শিক্ষাক্ষেত্রে ধ্রুপদী ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনে কিছুদিনের মধ্যেই কলেজকে আবার এর প্রাক্তন সম্পন্নতায় ফিরিয়ে আনলেন। উঁচু মূল্যবোধের অধিকারী, মানবিক, স্মিত বাক, নিম্নকণ্ঠ এবং অবিচল খোরশেদ আলাম চৌধুরী তাঁর মধুর ও কঠোর ব্যক্তিত্ব দিয়ে সবাইকে যেমন আপন করে নিতে পেরেছিলেন তেমনি পেয়েছিলেন সবার আস্থা ও শ্রদ্ধা। সে-সময়কার কলেজে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সবার ভরসাস্থল, শিক্ষকেরা তাঁকে ঘিরে কলেজের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। অধ্যক্ষ জালালের মতো তাঁর চরিত্র সামন্তবাদী ছিল না, ছিল বুর্জোয়া ও গণতান্ত্রিক। সবার সঙ্গে তিনি ছিলেন বন্ধুসুলভ ও সহৃদয়। অধ্যক্ষ জালাল যা গায়ের জোরে করতেন তিনি তা করতেন স্নিগ্ধ হাসির লেনদেন করে। কিছু দুর্বৃত্ত ছাত্রনেতাকে বাদ দিলে সাধারণ ছাত্র এবং শিক্ষকদের সমর্থন ও ভালোবাসা পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রীতি যে কতটা মমতাস্নিগ্ধ ছিল আমার একটা ঘটনায় একদিন তার পরিচয় পেয়েছিলাম।

১৯৭৭ সালে আমি টেলিভিশনের শ্রেষ্ঠ উপস্থাপক হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পাই। পুরস্কার গ্রহণের পরের দিন কলেজে ঢোকার পথে তাঁর সঙ্গে আমার

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

দেখা, সেখানে তিনি বাগানের মালীদের তদারকি করছিলেন।

দেখেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। অনেকক্ষণ তাঁর মুখে কথা নেই। খানিকটা সুস্থির হলে, ধরা-গলায় আক্ষেপ ফুটিয়ে তিনি বললেন, 'কাল টেলিভিশনে আপনাকে পুরস্কার নিতে দেখে আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল টেলিভিশন আপনাকে শ্রেষ্ঠ উপস্থাপকের পুরস্কার দিল, কিন্তু আমরা তো আপনাকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার দিতে পারলাম না।' দেখলাম তাঁর দুই চোখ বিষণ্ণতায় চিকচিক করছে।

আমি জানি তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভবও ছিল না। এজন্যে ওপরের মহলে দেন-দরবার লাগে, অনেক কাঠখড় পোড়ানোর ব্যাপার আছে। তাছাড়া বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হতে হলে সাধারণত কলেজের/স্কুলের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক হতে হয়। শিক্ষা-প্রশাসনকেই সাধারণত এদেশে শিক্ষক হিসেবে ধরা হয়, শুধু শিক্ষককে নয়। এইজন্যে শওকত ওসমান কোনোদিন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হন নি, কিন্তু আমাদের কলেজের অবিশ্বাস্য রকমের নির্বোধ এক আরবির অধ্যাপক ভাওয়াল বদরে আলম কলেজের অধ্যক্ষ হবার পর ধরপাকড়ের সুবাদে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তো শিক্ষক ছাড়া কিছুই নই। আর কিছু হতেও চাই না। কী করে ভালো শিক্ষকের স্বীকৃতি পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব?

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমাকে নিয়ে খোরশেদ আলম চৌধুরীর একটা সস্নেহ গর্ববোধ ছিল। এজন্যে তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ছিল অসীম। খোরশেদ আলম চৌধুরী ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে ছিলেন মাত্র দু-বছর। এর মধ্যে তাঁর আদর্শনিষ্ঠ, স্মিত কিন্তু আপোষহীন চরিত্র দিয়ে তিনি ছাত্রনেতাদের সব রকমের অনৈতিক দাবিদাওয়াকে স্তিমিত করে এনেছিলেন। তিনি যদি ছ-সাত বছর অধ্যক্ষ থাকতে পারতেন, তাহলে কলেজের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে তিনি হতেন এই কলেজের সেরা অধ্যক্ষ এবং তাঁর মৃত্যুর পর কলেজের ঐতিহ্য যেভাবে বিপ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তা হয়ত হতে পারত না।

কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত হন। কলেজের এককোণে অধ্যক্ষের বাসভবনে শুয়ে শুয়ে স্বেচ্ছাবিচ্ছিন্ন এই নিঃসঙ্গ অনন্য মানুষটির জীবনাবসান হয়।

৬

খোরশেদ আলম চৌধুরীর পর যাঁরা এই কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন, মোহাম্মদ নোমান তাদের মধ্যে ছিলেন সবচেয়ে আলোকিত মানুষ। অধ্যক্ষ হওয়ার আগে অনেকদিন তিনি ছিলেন এই কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক।

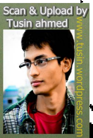

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কলেজের ছাত্র-সংসদের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপরে। প্রতিবছর কলেজের ছাত্রদের নবীন-বরণ উৎসবে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে তার দেওয়া অসাধারণ বক্তৃতা ছাত্রদের মতো আমাদেরও প্রাণিত করত। প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে তাঁর অবস্থান ছিল অধ্যক্ষের পরেই। অধ্যাপক হিসেবে তিনি ছিলেন কলেজের সেরা দুয়েকজন অধ্যাপকের মধ্যে। জীবন ও শিল্প সম্বন্ধে তাঁর হৃদয়ের গভীর ধ্বনিময় উচ্চারণ ছাত্রদের রক্তে রক্তে সঞ্চারিত হয়ে যেত।

অপরিসীম রকমের একটি শুভ হৃদয় ছিল তাঁর মধ্যে, যে-হৃদয় শিশুদের মতো নিষ্পাপ, সরল। এমন নির্জলা নিরপরাধ ভালো মানুষ আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি। তাঁর মধ্যে কোনো মিথ্যা ছিল না, লোভ ছিল না; অন্যায় করার বা ক্ষতি করার, মানুষকে ভালো না-বাসার কোনোরকম শক্তি ছিল না। শিক্ষকজীবন থেকে অবসর গ্রহণ অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, শুভত্বকে (গুডনেসকে) তিনি তাঁর অপরিবর্তনীয় ধর্ম বলে মনে করেন। আমার ধারণা তাঁর এই বক্তব্যে অতিশয়োক্তি ছিল না। তবু তাঁর দুয়েকটা ব্যাপারে আমার মনে প্রায়ই সপ্রেম অনুযোগ জাগত। সেটুকু উল্লেখ করেই তাঁর প্রসঙ্গের ইতি টানব।

একটা কলেজের অধ্যাপকরা সবাই ব্রাহ্মণ হলেও, অধ্যক্ষ কিন্তু তা নন। তাঁর দায়িত্ব মূলত ক্ষত্রিয়ের, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের, মনে রাজর্ষির। তাঁকে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করতে হয়, দণ্ডমুণ্ডের নিয়ন্তা হতে হয়, পরিচালকের কঠোর হাতে অবিচলভাবে ব্যবস্থাপনার লাগাম ধরে রাখতে হয়। কেবল মহত্ত্ব আর সাধুতা দিয়ে অধ্যাপকের মূল্যবোধকে উঁচু করে দাঁড় করিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু অধ্যক্ষ হতে গেলে ক্ষত্রিয়ের গুণ, কঠোরতা, আপোষহীনতা, আগ্রাসী মনোভঙ্গি, আঘাত করার শক্তি, দুঃসাহস —এসব কিছুই কমবেশি দরকার হয়। অন্যায়কারীকে নিরস্ত্র, ঠগকে পর্যুদস্ত, দুর্বৃত্তকে নিপাত—এসব করতে না পারলে অধ্যক্ষ হিসেবে সফল হওয়া কঠিন। তাঁর অবস্থান দৃঢ় হওয়া কঠিন। এই কারণে অধ্যাপক হিসেবে তিনি যতখানি পরিপূর্ণ ছিলেন, আমার ধারণা অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি ততটা সার্থক ছিলেন না।

তাঁর অসীম সাধুতার সামনে নতজানু শিক্ষকেরা তাঁর পেছনে একজোট হয়ে কাজ করেছেন, কিন্তু মমতার বশে, মানবিক দুর্বলতার বশে, অন্যায়কে ক্ষমা করে সবাইকে তিনি ফিরে ফিরে হতাশ করেছেন।

তিনি নিজে পাপী ছিলেন না, কিন্তু পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে অনেক সময় পাপের অংশভাক হয়েছেন। এজন্যে অনেক সময় নিজের বিবেককে তাঁর চোখ ঠারতে হয়েছে, নিজের অগোচরে নিজের সঙ্গে আত্মপ্রতারণা করে আত্মাকে বাঁচাতে হয়েছে। তবু অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর সময়কাল ঢাকা কলেজের অন্যতম সোনালি

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সময়। ছোটখাটো গড়নের হাসিখুশি ব্যক্তিত্ব দিয়ে শ্রেয়োবোধের যে আদর্শ তিনি সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন তাঁর সুফল বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ঢাকা কলেজে বেঁচে ছিল।

অধ্যক্ষ নোমানের পর যে ক'জন অধ্যক্ষ এই কলেজে এসেছেন তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিলেন জনাব আবুল হোসেন। এক সময়কার ছাত্রনেতা, পঞ্চাশ দশকের রাজশাহী কলেজ ছাত্র-সংসদের সহ-সভাপতি জনাব হোসেন ছিলেন সাহসী এবং অনমনীয় মানুষ। কলেজের জীবনকে কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে তিনি প্রজ্জ্বলিত করতে পেরেছেন কিংবা উচ্চতর কোনো নৈতিকতার দিকে সবাইকে ডেকে নিতে পেরেছেন এ-কথা বলব না, কিন্তু কলেজের ক্রমঅধঃপতনশীল দিনগুলোয় এই শালপ্রাংশু সুদর্শন মানুষটি তাঁর সাহস এবং অনমনীয়তা দিয়ে বেশকিছু পাপের হাত থেকে কলেজকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, এ-কথা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না।

১৯৬৭ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মোটামুটি এঁরাই। এঁদের অনেকের মধ্যে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। তবু এই সময় সারাদেশে অধ্যক্ষ হবার যোগ্যতায় যাঁরা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এঁদের অনেকেই ছিলেন এই দলে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আজ দেশ থেকে ক্রমাগতভাবে এই শিক্ষকদের বংশের বিলুপ্তি ঘটছে। যে-শিক্ষা, মূল্যবোধ, যোগ্যতা ও আত্মত্যাগ দিয়ে একজন শিক্ষক একটি বিদ্যায়তনের প্রধান হয়ে ওঠেন, শিক্ষাঙ্গনকে নেতৃত্ব দেন, সেই যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ ক্রমেই বিরল হয়ে উঠছে। দেশে যে আজ কেবল শিক্ষা বা শিক্ষাঙ্গনের পতন ঘটেছে তাই নয়, পতন ঘটেছে দেশের শিক্ষাঙ্গনের সবচেয়ে বড় স্তম্ভটির — সেই মূল মেরুদণ্ডটির—যার নাম শিক্ষক। আজ অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কলেজ বা স্কুলে যোগ্য অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। শিক্ষাঙ্গন কেবলি ভরে উঠছে অকর্ষিত, অনৈতিক ক্ষুদ্রচেতা শিক্ষক আর তাঁদের হাতে তৈরি-হওয়া লক্ষ লক্ষ ছাত্রে । এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাঙ্গনের ভবিষ্যৎ কী? শিক্ষকই তো শিক্ষাঙ্গনের মূল ভিত্তি, জীবন-সঞ্জীবনী। ভালো শিক্ষক হারালে শিক্ষাঙ্গন বাঁচবে কী করে? আমি আমার ছেলেবেলায় শিক্ষকতার একটা স্বর্ণযুগের শেষরশ্মিকে চোখের সামনে থেকে অপসৃত মতে দেখেছি। সেই সোনালি স্নিগ্ধ আলো আজও আমার চোখে লেগে আছে। আজকের শিক্ষকতার এই হতশ্রী চেহারা আমার স্নায়ুতে হয়ত একটু বেশি অত্যাচার করে।

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষদের গল্প সংক্ষেপে বললাম। এবার ছোট্ট করে কলেজের শিক্ষক সম্প্রদায়ের সামান্য একটি ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করি।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ছোট্ট ঘরটির গল্প

১

ঢাকা কলেজের এই ঘরটির ছবি দেখতে হলে চকিতের জন্যে উঁকি মেরে নিতে হবে ঢাকা কলেজের শিক্ষক-কক্ষের লাগোয়া একটি মাঝারি সাইজের ঘরের ভেতর—বিশাল শিক্ষক-কক্ষের উত্তরদিকের মাঝামাঝি জায়গার একটা দরজা দিয়ে ঢুকতে হয় তাতে।

ঘরটা আসলে মাঝারি নয়, একটা বড় ঘরকে পার্টিশন দিয়ে তৈরি করা বলে দেখতে মাঝারি লাগে। বড়ঘরটার মাঝ-বরাবর কাঠের ক্যাবিনেট আর আলমারি দিয়ে তৈরি পার্টিশনের ওধারে কলেজের পরীক্ষা-সংক্রান্ত কমিটির অফিস। অফিসের এ-পাশে এই ঘরটাতে একটা বড় গোল টেবিলের চারপাশে অনেকগুলো চেয়ার পাতা, সেগুলোতে বসে কলেজের বেশকিছু উৎসাহী অধ্যাপক আসর জমান।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অধ্যাপকদের এই আসর যাঁকে ঘিরে একসময় ঘরের একটা কোণে আস্তে আস্তে কেন্দ্রীভূত হয়, তিনি কিন্তু টেবিল ঘিরে বসে থাকা অধ্যাপকদের সঙ্গে বসেন না, তাঁকে দেখা যায় ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটা ইজিচেয়ারে, হাতে বই নিয়ে আধশোয়া হয়ে থাকতে। ঘরের অধ্যাপকেরা দরকারমতো যে-যার চেয়ার টেনে নিয়ে তাঁর ইজিচেয়ার ঘিরে আড্ডায় মেতে ওঠেন।

ইজিচেয়ারটা ঘরের বিশাল জানালার কাছাকাছি হওয়ায় বাইরের উপচানো আলো জানালা দিয়ে আছড়ে পড়ে তাঁদের ওপর। সেই আলো আড্ডারত উদ্দীপ্ত অধ্যাপকদের চেহারাকে যেন স্বাভাবিকের চেয়ে উৎফুল্ল আর সজীব করে তোলে।

যিনি আধশোয়া অবস্থায় বসে থাকেন তিনি অধ্যাপক শওকত ওসমান, তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম সেরা কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধকার এবং বহুমুখী উৎসাহসম্পন্ন তীক্ষ্ণধী মানুষ। কলেজে তাঁর আবস্থানের সময়টুকুর মধ্যে ক্লাসের অংশটুকু বাদ দিলে বাকি সময়টা তিনি ঐ চেয়ারেই কাটান। বছর-দুই আগে তাঁর 'ক্রীতদাসের হাসি' শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হিসেবে প্রেসিডেন্ট পুরস্কার

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পেয়েছে। শওকত ওসমানের বয়স পঞ্চাশ ছাড়ানো, তাঁর কথাবলা থেকে শুরু করে হাতনাড়া ও অন্যান্য অঙ্গভঙ্গির সবকিছুতে ঝাঁকুনি দেওয়া একটা তীব্র অস্থিরতা। আগেই বলেছি অসম্ভব পড়াশোনার নেশা ছিল শওকত ওসমানের। রাজারবাগ থেকে কলেজে আসার পথে বাসের হ্যান্ডেল ধরে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ঐ সময়টাও নষ্ট হতে দেন না তিনি। বাঁ হাতে ওপরের হ্যান্ডেল ধরে ডান হাতে ধরা বইয়ের পনের–বিশ পৃষ্ঠা পড়ে ফেলেন। তাঁর কথা অনর্গল, বিস্ময়কর রকমে তথ্যময় ও অত্যাধুনিক চিন্তা–চেতনায় প্রজ্জ্বলিত। বয়সে ছোট–বড় সবাইকে তিনি 'স্যার' বলে সম্বোধন করেন এবং পাশের ছোট্ট টেবিলের ওপর রাখা গ্লাস থেকে মিনিট পনের বিশ পরপর এক চুমুক পানি খান। এভাবে পানি পানের ব্যাখ্যা আছে তাঁর : আসলে তিনি হুইস্কির গ্লাসেই চুমুক দিতে চান, না–পাওয়ায় দুধের স্বাদ এভাবে ঘোলে মিটিয়ে নেন।

টেবিলের চারপাশ ঘিরে যাঁরা বসেন তাদের মধ্যে থাকেন অধ্যাপক নোমান, পরে যিনি ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। একসময় শারীরিক কামনায় রগরগে সনেট লিখেছিলেন তিনি বেশকিছু। বেশকিছু খ্যাতিমান পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল সে–সব। তাঁর মুখ স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল, মাঝেমধ্যে কিছু প্রাণবন্ত কথা বললেও বোঝা যায় এ–মুহূর্তে বলার চেয়ে শোনার ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ বেশি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সেখানে আরও যাঁদের দেখা তাদের অন্যতম হচ্ছে রাজশাহী কলেজে আমার ছাত্রপ্রতিম মোহাম্মদ রফিক, সে–সময়কার উঠতি তরুণ কবি। আমাদের কণ্ঠস্বর গোষ্ঠীর লেখক। কবিতা ও শিল্পের পড়াশোনায় আর জীবনের মদির আনন্দে থৈ থৈ করছে সে। আরও থাকে মোহাম্মদ হারুন-উর–রশিদ, ইংরেজির অধ্যাপক আর প্রবন্ধকার, আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠী। হারুন 'কণ্ঠস্বরে'র সঙ্গেও একসময় জড়িত ছিল। কিছুদিন আগে 'কণ্ঠস্বরে'র পৃষ্ঠায় অনূদিত ওর সাৎ বভ, ম্যালার্মে, আর আঁদ্রে জিদের তিনটি বিখ্যাত প্রবন্ধের অসাধারণ সংকলনটি প্রকাশিত হবার পর সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। রফিকের মতো হারুনও এখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কিছুদিন আগে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে হারুন সবার আস্থা কুড়িয়েছিল। এছাড়া তাঁকে ঘিরে আরও থাকেন রওশন আরা রহমান—বাংলার প্রিয়দর্শিনী অধ্যাপিকা, পরবর্তীকালে বাংলা বিভাগের প্রধান; থাকেন শাহানা খানম, বিদ্রোহী কবি নজরুলের প্রথমা স্ত্রী নার্গিস আরা ও তাঁর দ্বিতীয় স্বামী কবি আজিজুল হাকিমের কন্যা। এছাড়াও থাকেন বাংলার অধ্যাপিকা সুলতানা বেগম (এখন তিতুমীর কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান), বাণিজ্যের অধ্যাপক শাহজাহান মোল্লা, আমেরিকা প্রবাসী ; অর্থনীতির জহুরুল হক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), ভূগোলের মকসুদুস সালেহীন (এখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ডিন)—এমনি আরো প্রায় একডজন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী। কলেজের সামনের মিষ্টির দোকান থেকে মাঝেমাঝেই শিঙাড়া, নিমকি, সামুচার সঙ্গে রসগোল্লা বা রাজভোগের সরবরাহ আড্ডার ঝিমিয়ে পড়া আসরকে চাঙ্গা করে তোলার ব্যাপারে সহায়ক হয়। পরীক্ষা-কমিটির পিয়নের ধোঁয়া-ওঠা গরম কেটলির বিরতিহীন চা আসরে আমেজ আনে। যার সৌজন্যে ঐসব শিঙাড়া, নিমকি, সামুচা আর মিষ্টির সরবরাহ সপ্রতিভ থাকে তিনি শাহানা খানম। জমজমাট উদ্দাম ভরাট আর মুখর এই আসরকে নেতিয়ে পরতে দিতে তিনি কিছুতেই রাজি নন। বড় বড় চোখ আর গোলগাল চেহারার উৎসাহী ও চঞ্চল স্বভাবের শাহানা গুণগ্রাহী মানুষ। বীরপূজা তার রক্তে রয়েছে। এতজন উজ্জ্বল আর মেধাবী মানুষের এই উষ্ণ সম্মিলনকে রসনার প্রজ্জ্বলন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে তিনি যেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জেহাদী।

দৈনন্দিন পৃথিবীর লাভ-ক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশভাগ থেকে অনেক দূরে—পদোন্নতি, বেতনবৃদ্ধির জগত থেকে আলাদা এক জগতে, শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞানের বিমূর্ত চেতনা নিয়ে মুখর হয়ে থাকে এই আড্ডা আর আলোচনার আনন্দময় সময়। কত সামান্য বিষয় থেকে কত অসাধারণ পর্যায়ে চলে যায় এইসব আলোচনা সে আসর না দেখলে বোঝা কঠিন। মুহূর্তে ঢাকা কলেজের ছোট্ট ঐ ঘরটি পৃথিবীর যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষ আর চৈতন্যপ্রভার সমমানের হয়ে যায় যেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে এজন্যে যে, দেশে তখন এমন অনেক কলেজই ছিল যেখানে মেধাবী মানুষেরা মানব-সভ্যতার সর্বোচ্চ মাপের আলাপচারিতায় জীবনকে প্রজ্জ্বলিত করতে পারতেন। আজ দেশের কলেজের আলোহীন নিষ্প্রাণ শিক্ষক-কক্ষে এই প্রাণপ্রবাহ নীরক্ত হয়ে এসেছে।

ঢাকা কলেজের ঐ ছোট কক্ষটির এই প্রাণবন্ত জীবন ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বহমান ছিল। ১৯৭৫-এ শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর শওকত ওসমান দেশত্যাগ করলে, ঐ জলসার মূল আকর্ষণ হারিয়ে যায়। ফলে ঐ আসর ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে আসে।

আড্ডাটা হয়ত আরও বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু উঠে গেল আরও একটা দুঃখজনক কারণে। বড় বেশি তাড়াতাড়িই উঠে গেল। সত্তুরের দশকের মাঝামাঝিতে কলেজের প্রায় প্রতিটা প্রধান বিভাগে সম্মানশ্রেণী চালু হয়ে গেল। এর আগে পর্যন্ত কলেজের শিক্ষকেরা নিজ নিজ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম সম্পর্ক বজায় রাখলেও কলেজের সময়টা মূলত কাটাতেন শিক্ষক-কক্ষে আড্ডা দিয়েই। তাতে তাঁদের মধ্যে একটা উষ্ণ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হত। শিক্ষক-কক্ষের পাশের ঘরে গড়ে উঠেছিল এই অন্তরঙ্গতারই একটা আলোকিত রেখা। কিন্তু প্রতিটা বিভাগে আলাদা আলাদা অনার্স কোর্স চালু

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

হওয়ার ফলে শিক্ষকরা কলেজের মূল স্টাফরুম ছেড়ে নিজ নিজ বিভাগের ভেতর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকেন। কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর কক্ষ এবং তার পাশের ঐ ঘরটিকে কেন্দ্র করে, কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে যে-দেখাশোনা, যোগাযোগ, স্বপ্নের লেনদেন বা আনন্দের জগৎ গড়ে উঠেছিল, তা ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ে।

আর একটা বড় কারণে ঐ আড্ডাটা ক্ষয়ে আসে। হয়ত এটাই ছিল এই মৃত্যুর আসল কারণ। কারণটা সে-সময়কার শিক্ষাঙ্গনের সার্বিক অবক্ষয়ের গভীরে নিহিত। কলেজের শিক্ষকদের সামগ্রিক মানটাই আসলে এই সময় নেমে যেতে শুরু করেছিল। এরপর ঐ কলেজে আমার থাকা পর্যন্ত তা কেবলই নেমেছে। কাজেই ঐ ছোট ঘরের আড্ডার আলাপ-আলোচনা, পড়াশোনা আর চিন্তা-চেতনার যে-আলোকশিখাটি প্রদীপ্ত ছিল, পরের শিক্ষকদের পক্ষে তা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

২

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ঢাকা কলেজে ঐ সময় শিক্ষকদের মান নেমে যেতে শুরু করেছিল একটি দুঃখজনক কারণে। আমরা যখন সরকারি কলেজে যোগ দিই, সারাদেশে সরকারি কলেজের সংখ্যা তখন ছিল পাঁচটি বা ছটি। ফলে সরকারি কলেজে শিক্ষকের পদ ছিল কম। চাকরির বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকায় সবাই তখন সরকারি কলেজের চাকরি করতে চাইতেন। ফলে এই চাকরি তখন ছিল রীতিমতো প্রতিযোগিতামূলক। শিক্ষাগত যোগ্যতা যথেষ্ট ভালো না হলে ঐ চাকরি পাওয়া কঠিন ছিল। প্রথমে জনশিক্ষা পরিচালক সাময়িক ভিত্তিতে শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে পারলেও সরকারি কর্ম কমিশন পরে বাজিয়ে যাচিয়ে, সবরকম যোগ্যতা আগপাশতলা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে তবেই চাকরি দিত। সরকারি কলেজের শিক্ষকদের বেতনও তখন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি। মেধাবী ছাত্রদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে যোগ দিত সরকারি কলেজে। এসব কারণে সরকারি কলেজের শিক্ষকদের তখন একটা ন্যূনতম মান ছিল। ঐ ন্যূনতম মানটাও ছিল বেশ উঁচু। যাঁরা সরকারি কলেজে চাকরি পেতেন না সাধারণত তাঁরাই যেতেন বেসরকারি কলেজে।

এদেশে বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ (সরকারিকরণ) প্রথম শুরু হয় পাকিস্তানি আমলে—পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের উদ্যোগে। তখন এর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। দেশের প্রধান প্রধান কলেজ থেকে ছাত্র-রাজনীতি উচ্ছেদ করাই ছিল এর লক্ষ্য। ঢাকার জগন্নাথ কলেজ, বরিশালের বি এম কলেজ,

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

রংপুরের কারমাইকেল কলেজের মতো বড় বড় কলেজে ছাত্রসংখ্যা ছিল বিস্তর। আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনও এগুলোতে ছিল জোরদার। এইসব কলেজকে জাতীয়করণ করে ছাত্রসংখ্যা কমিয়ে একবার সরকারি নিয়মকানুনের আওতায় এনে দিতে পারলে কলেজগুলো থেকে ছাত্র-রাজনীতি চিরদিনের মতো বিদায় করা যেতে পারবে এই ছিল গভর্নর মোনায়েম খানের আশা। এই ধারণার ওপর নির্ভর করে মোনায়েম খান ঐসব কলেজ সরকারিকরণের পরিকল্পনা নেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও যাতে কোনোকালে ছাত্র-রাজনীতি জায়গা করে নিতে না পারে সেইজন্যে ঢাকার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে এমনকি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কেও গড়ে তোলা হয় শহরের উত্তপ্ত বিশৃঙ্খল পরিবেশ থেকে দূরে নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশের ভেতর যেখানে সীমিত সংখ্যক ছাত্র সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুনের আওতায় পড়াশোনায় নিমগ্ন থেকে রাজনীতি সম্পর্কহীন আবহাওয়ায় আগামী দিনের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠবে। পৃথিবীর সব স্বৈরাচারী শাসকের মতো আইয়ুব খান এবং মোনায়েম খানও হয়ত ভেবেছিলেন যে তাঁরা অনন্তকাল এদেশ শাসন করবেন। তাই সুদূরপ্রসারীভাবেই এসব বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের এই স্বপ্ন সফল হয় নি। তাঁদের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থানের মুখে তাঁদের বিলুপ্তি ঘটলে সব পুরোপুরি বানচাল হয়ে যায়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আবদুল মোনায়েম খান এই সরকারিকরণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন কেবল দেশের বড় বড় কলেজগুলোতে, সীমিত আকারে। কিন্তু স্বাধীনতার পর সমাজতন্ত্রী ধ্যানধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যাপকভিত্তিতে বেসরকারি কলেজগুলোকে জাতীয়করণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। দেখতে দেখতে সারাদেশের ছোট-বড় শহর থেকে শুরু করে গ্রাম-গ্রামান্তের বিপুলসংখ্যক কলেজের সরকারিকরণ সম্পন্ন হয়। নির্বিচারে, কোনোরকম বিচার বিবেচনা ছাড়াই চলতে থাকে এই সরকারিকরণের প্রক্রিয়া। যে যেদিক থেকে পারে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বা অন্যান্য অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে নিজ নিজ এলাকার কলেজকে সরকারিকরণের ব্যবস্থা করে নিতে থাকে। বর্তমানে সারাদেশে সরকারিকরণ করা কলেজের সংখ্যা আড়াই শ'র মতো। এই সময়কার ঢাকা কলেজের শিক্ষকদের মানের অবনতি সারাদেশের বেসরকারি কলেজের এই ব্যাপক জাতীয়করণের সঙ্গে যুক্ত। নির্বিচারে সরকারিকরণের ফলে দেশের এতদিনের ঐতিহ্যবাহী ও ভালো সরকারি কলেজের সঙ্গে নতুন, নামগোত্রহীন ও নিম্নমানের এইসব সরকারি কলেজের কোনো ব্যবধানই প্রায় থাকল না। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কলেজ ঢাকা কলেজও সরকারি কলেজ, আবার গাছবাড়িয়া বা ছাগলনাইয়া কলেজও সরকারি কলেজ। কাজেই এইসব কলেজ থেকে ঢাকা কলেজে বদলিতে বাধা নেই। মুরুব্বি ধরে একটা জুৎসই তদবির চালাতে পারলেই হল। গাছবাড়িয়া কলেজ থেকে এক ধাক্কায় ঢাকা কলেজ। দেশের শ্রেষ্ঠ

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আর কী চাই। জীবনের স্বপ্ন হাসিল। জাতীয়করণ করা কলেজ থেকে বন্যার স্রোতের মতো শিক্ষক বদলি হয়ে আসতে লাগল ঢাকা কলেজে। তাঁদের শিক্ষকতার যোগ্যতা বা শিক্ষাগত মান দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের শিক্ষকতার উপযুক্ত কিনা তা যাচিয়ে খতিয়ে দেখার কোনো ব্যবস্থা রইল না। এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে অকর্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠের চোখরাঙানির সামনে তা স্তব্ধ করে দেওয়া হল। বন্যার তোড়ে ভেসে গেল ঢাকা কলেজের ভালো যা ছিল প্রায় সবকিছু। দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রেরা ভালো শিক্ষকদের কাছে পড়তে পারার ন্যূনতম সুযোগটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়ে গেল। আমাদের সেই আলোকিত ছোট্ট স্পন্দমান ঘরটাও ধীরে ধীরে বিবর্ণ ও পদপাতবিরল হয়ে এল। ১৯৮০-র পর থেকে সেখানে বসার মতো কেউ আর কলেজে রইল না।

ঢাকা কলেজ যেমন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তেমনি পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা- প্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্সী কলেজ। ঢাকা কলেজের মতোই পশ্চিমবঙ্গের সেরা ছাত্ররা এসে ভর্তি হয় প্রেসিডেন্সী কলেজে। কিন্তু ঐসব ভালো ছাত্রেরা যাতে তাদের মেধা-লালনের উপযুক্ত যোগ্য শিক্ষকদের কাছে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে না পারে সেজন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের জন্য একটা পৃথক নিয়ম আছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যসব সরকারি কলেজের মতো প্রেসিডেন্সী কলেজ সরকারি কলেজ হলেও অন্যান্য কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলির ব্যাপারে কমবেশি বাঁধাবাঁধি আছে। দেশের সেরা ছাত্রদের পড়াবার মতো যোগ্যতা উপযুক্ততা আছে এমন ব্যক্তিদের বিশদভাবে খতিয়ে দেখার পর কর্তৃপক্ষ ঐ কলেজের শিক্ষকতায় তাদের নিয়োগ করেন এবং এইসব সুযোগ্য শিক্ষকেরা যাতে কলেজের মেধাবী ছাত্রদের বছরের পর বছর ধরে শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা দিয়ে যেতে পারেন সেজন্য তাদেরকে ঐ কলেজে রেখে দেবার চেষ্টা করেন। এ দিয়ে কতটা কী ভালো বা খারাপ হয় সে আলোচনা অর্থহীন। তবে এ থেকে একটা কথা অন্তত বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্বার্থের ব্যাপারটিকে মনোযোগ ও সহানুভূতির সঙ্গে দেখেন এবং তাদের রক্ষার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে মনোযোগ দেন। কিন্তু আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনের সেরা ছাত্রদের রক্ষার ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের এমন কোনো উৎকণ্ঠা বা সচেতনতা নেই। গত তিরিশ বছরে বাংলাদেশের সেরা ছাত্রদের অর্ধেকেরও বেশি ভর্তি হয়েছে ঢাকা কলেজে। যদি এই কলেজের শিক্ষার পরিবেশকে আরও উৎকর্ষময় ও আনন্দময় করে তোলা যেত, যোগ্য ও উপযুক্ত শিক্ষকদের উচ্চতর দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে তাদের সম্পন্ন মানুষ করে গড়ে তোলা যেত তবে বাংলাদশকে আজকের এই উদ্ধারহীন অচলায়তন থেকে টেনে তুলতে তারা হয়ত অর্থপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারত।

কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের জড়ত্বের কারণে তা সম্ভব হয় নি। ঢাকা কলেজে আমি যে পঁচিশ বছর ছিলাম সেই সময় একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বিভাগে প্রতিবছর যে পোনে চারশো ছাত্র ভর্তি হত তাঁদের নিকৃষ্টতম ছাত্রদের সমপরিমাণ নম্বর পাওয়া শিক্ষকও এই কলেজে দু-চারজনের বেশি ছিলেন না। মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষকও ছিলেন প্রায় একই মানের। অর্থাৎ বলা যায় দেশের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা শিক্ষাগতভাবে তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে এই কলেজে।

ব্যাপারটার ভয়াবহতা নিয়ে আমি ঐ সময়কার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি সচিব ও বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। একবার সুযোগ পেয়ে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকেও বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম ব্যাপারটা। বলেছিলাম : দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বা দেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎকে এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবার অধিকার আমাদের নেই। তাদের জন্য যেভাবেই হোক ভালো শিক্ষক নিশ্চিত করা উচিত। এই ভীতিকর পরিস্থিতি টের পেয়ে, প্রতিবারই তাঁরা চোখ বড় বড় করে, দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের অঙ্গনে এমন একটা বিপর্যয়কর ব্যাপারও যে ঘটছে তা উপলব্ধি করে আর্তকণ্ঠে বলে উঠেছেন, 'বলেন কী? তাই নাকি!' কিন্তু তারপর আবার সেই নিস্পৃহ, নিথর নৈঃশব্দ। তাঁদের হাবভাব মীর্জা গালিবের সেই শেরটির মতো হুবহু :

আপনার উদাসীনতা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে; হে মহিয়সী রাণী, আর কতদিন আমি শোনাব হৃদয়ের কথা, আর আপনি বলবেন, 'কী'।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অচেনা অপরিচিত মফস্বল কলেজ থেকে শিক্ষকদের ঢাকা কলেজে বদলি হয়ে আসার পর্ব বেশ জোরেশোরেই চলছিল। ভালো চাকরি পেয়ে কলেজের যোগ্য শিক্ষকদের ক্রমাগত বিদায় গ্রহণ চলতে থাকায় ও অন্যান্য ভালো শিক্ষকদের বদলি বা পদোন্নতি পেয়ে চলে যাওয়ার কারণে শূন্য হওয়া পদে প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে চলে আসছিল অনুপযুক্ত অক্ষম শিক্ষক। এটা চলছিল '৭০-এর দশকের শেষ পর্ব থেকে '৮০-এর দশকের শেষ পর্ব পর্যন্ত। এই জোয়ারের স্রোতে ভেসে যারা বেসরকারি কলেজ থেকে ভেসে আসা শিক্ষকদের সবাই যে অক্ষম ও দুর্বল ছিলেন তা নয়, দুয়েকজন বেশ ভালো ছিলেন এঁদের মধ্যে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষকদের মান ছিল অসম্ভব নীচু।

৩

আরও একভাবে বদলি হয়ে আসা শিক্ষকেরা এই কলেজের শিক্ষকদের মানকে অনেক নীচে নামিয়ে দেয়। সেটা হল নানান কলেজ থেকে খুবই সাধারণ মানের মহিলা-শিক্ষকদের ক্রমাগতভাবে এই কলেজে বদলি হয়ে আসা। দেশের প্রলম্বিত সামরিক শাসন এই পরিস্থিতির আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে চলে। সামরিক

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কর্মকর্তা, আমলা, সরকারপক্ষীয় রাজনৈতিক নেতা এবং অন্যান্য ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্ত্রীরা, স্বামীদের নানান অবৈধ প্রভাবের মাধ্যমে যোগ্যতরদের হটিয়ে দিয়ে এই কলেজে বদলি হয়ে আসতে শুরু করেন।

ব্যাপারটা এমন সর্বাত্মক হয়ে ওঠে যে, মনে হতে থাকে যে ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের শয্যাসঙ্গিনী হতে পারাটাই যেন ঢাকা কলেজের অধ্যাপক হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা। শিক্ষক হিশেবে এঁদের প্রায় সবাই অধিকাংশই ছিলেন খুবই নিম্নমানের। এদের অত্যধিক পরিমাণে বদলি হয়ে আসা কলেজের শিক্ষকতার মানকে একেবারে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেয়। শুধু ঢাকা কলেজে নয়, ঢাকার প্রতিটি সরকারি কলেজেই ঘটতে শুরু করে একই ঘটনা। ঢাকা শহরের কলেজগুলোয় মহিলা শিক্ষকের আজও এই প্রক্রিয়া একইভাবে চলছে।

১৯৯২ সালে আমি যখন ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান তখন এই বিভাগের এগারজন শিক্ষকের মধ্যে নয়জনই ছিলেন মহিলা। আজ ঢাকা শহরের সরকারি কলেজগুলোতে মহিলা-অধ্যাপিকার সংখ্যা শতকরা সত্তুর ভাগের ওপরে। এই দেশের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির স্ত্রী যে-পদে আসতে আগ্রহী, সেখানে যোগ্য হলেও কোনো অধ্যাপক এমনকি যোগ্যতর মহিলারও আসার কোনো উপায় ছিল না। সত্তুর দশকের মাঝামাঝি থেকে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের ঢাকা কলেজে বদলি হয়ে আসার এই-যে দুটি নতুন ধারা শুরু হল, এগুলোর মধ্যে কোন্‌টা বেশি পরিমাণে ক্ষতিকর হয়েছিল বলা মুশকিল তবে ঢাকা কলেজের শিক্ষকদের মান অসম্ভবরকম নিচে নেমে যায়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এইভাবে আশির দশকের শেষ পর্ব আসতে-না-আসতেই ঢাকা কলেজে ভালো শিক্ষকের সংখ্যা বেদনাদায়কভাবে কমে যায়, এবং দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের কলেজ হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষকের মানের দিক থেকে ঢাকা কলেজ ভেড়ামারা বা বাউফল কলেজের পর্যায়ে নেমে আসে। এসব কথা, এত করে বললাম, এই ব্যাপারটা পষ্ট করে তোলার জন্যে যে এই সময় সরকারি কলেজের বদলির ব্যাপারটা যোগ্যতানির্ভর না হয়ে কীভাবে পুরোপুরি প্রভাব ও তদবিরনির্ভর হয়ে পড়েছিল এবং ঢাকা কলেজের মতো দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনের সেরা ছাত্রদেরকে ন্যূনতম রক্ষার ব্যাপারে দেশের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ কী বেদনাদায়কভাবে উদাসীন ও নিস্পৃহ ছিলেন।

৪

ব্রিটিশ আমলে সরকারি স্কুল-কলেজগুলোকে গড়ে তোলা হয়েছিল মোটামুটিভাবে একেকটি আদর্শ শিক্ষায়তনের উদাহরণ হিসেবে। পড়াশোনা, শৃঙ্খলা, নিয়মকানুন এবং শিক্ষাদর্শের দিক থেকে এইসব স্কুল ও কলেজগুলো

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

দেশের মানুষের সামনে ভালো শিক্ষায়তনের মডেল তুলে ধরেছিল। নির্ভরযোগ্য বিদ্যায়তন হিসেবে অভিভাবকেরা বহুকাল ধরে এগুলোর ওপর আস্থা রেখে এসেছেন ও ছেলেমেয়েদেরকে এইসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার জন্যে উন্মুখ হয়েছেন। ব্রিটিশযুগে এ-দেশের মানুষের চোখে ব্রিটিশ-শাসনের ভাবমূর্তি ছিল খুবই উন্নত। তাঁদের বিবেচনায় এই প্রশাসন ছিল নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ, সমর্থ। এই শাসনব্যবস্থার নাম ছিল 'ব্রিটিশরাজ'। সেকালের সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ছিল সেই সুযোগ্য ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতীক। সুপরিকল্পিত এই স্কুল-কলেজগুলো জনসাধারণের কাছে এমনই উঁচুমাপের আস্থার সৃষ্টি করেছিল যে আজ এদের পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবার পরও সেই ভাবমূর্তি জনসাধারণের মন থেকে পুরোপুরি মুছে যেতে পারে নি। হয়ত অভ্যাসবশে, হয়ত কেবলি মোহের ঝোঁকে আজও এই সরকারি স্কুল-কলেজগুলো জনচক্ষে সম্পন্ন শিক্ষায়তনের প্রতীক হয়ে রয়েছে। এগুলোর সার্বিক বিশৃঙ্খলতা, অব্যবস্থা আর নিঃস্বতার সব খবর জানার পরও দেশের অভিভাবকেরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর দরজায় আজও হাজির হয়। এগুলোর ভেতর তাঁদের সন্তানদের সম্পন্ন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।

সত্তুর দশকে ব্যাপক হারে স্কুল-কলেজ সরকারিকরণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই স্কুল-কলেজগুলোর উন্নত শিক্ষাপরিবেশ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে শুরু করে। দুটো কারণে এটা ঘটে। আগে সরকারি স্কুল-কলেজের সংখ্যা ছিল কম—এদের নজরদারি এবং তত্ত্বাবধান করত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্কুল-কলেজ শাখা। ঐসব অল্পসংখ্যক স্কুল-কলেজের ব্যবস্থাপনা ঐ ছোট্ট পরিদপ্তরটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই পরিচালনা করে যেতে পারত। কিন্তু সত্তুর দশকের মাঝামাঝিতে দেশের প্রায় পঞ্চাশ হাজার প্রাথমিক স্কুলসহ বিপুল সংখ্যক মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজকে সরকারিকরণ করা হলে ঐ ছোট্ট পরিদপ্তরের পক্ষে গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঐ অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই বিরাট সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার জন্যে শিক্ষা পরিদপ্তরকে আয়তনে বাড়িয়ে একসময় শিক্ষা অধিদপ্তর বানানো হয়। কিন্তু এই বিপুল প্রয়োজনের তুলনায় তাও থেকে যায় একেবারেই অপ্রতুল। জাতীয়করণের বিপুল প্লাবনের উপর নূহের নৌকার মতো বিশৃঙ্খল ও অনিশ্চিত আবহাওয়ায় অসহায় হয়ে ছুটে বেড়াতে থাকে। তাছাড়া এমনিতেই জাতীয়করণ করা স্কুল-কলেজগুলোর শিক্ষাদর্শ এবং নিয়মশৃঙ্খলা, দু চারটি বিরল ব্যতিক্রম বাদে, ছিল সরকারি স্কুল-কলেজের চেয়ে অনেক নিম্নমানের। ফলে সেই মিলিত অব্যবস্থার বিপুল ঢেউ নানান দেখা-অদেখা পথে সরকারি স্কুল-কলেজগুলোর চত্বরে আছড়ে পড়তে শুরু করে। অধিদপ্তরের আওতাধীন স্কুল-কলেজের সংখ্যা বিপুল হওয়ায় এবং

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তার নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি অধিদপ্তরের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় তার অশুভ প্রভাব অধিদপ্তরকেও গ্রাস করে ফেলে। জাতীয়করণের এই বিশাল বিশৃঙ্খলতার ভেতর শিক্ষা অধিদপ্তর হয়ে পড়ে পুরোপুরি দুর্নীতিপরায়ণ। তত্ত্বাবধানকারী প্রতিষ্ঠানের এই অনৈতিকতা সারাদেশের স্কুল-কলেজগুলোকে ঠেলে দেয় এক বিপুল অনিয়ন্ত্রণ আর নৈরাজ্যের ভেতর। আজ পর্যন্ত দেশের মাধ্যমিকও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল-কলেজগুলো ঐ অবস্থানেই রয়েছে।

এইভাবে ব্রিটিশ আমল থেকে সরকারি স্কুল-কলেজগুলোকে আশ্রয় করে যে নিয়ম-শৃঙ্খলাসমৃদ্ধ ও শিক্ষকবহুল একধরনের ভালো মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল তার অবসান হয়। সারাদেশে কোনো মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয়করণ করা স্কুল-কলেজগুলোকে উদ্ধার না-করা পর্যন্ত, দেশে, কিছু আকস্মিক ব্যাতিক্রম বাদে, ভালো স্কুল পাওয়া সহজ হবে বলে মনে হয় না।

গত পঁচিশ বছর ধরে দেশে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ক্যাডেট কলেজ নামে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলাসম্পন্ন বেশকিছু ভালো আবাসিক স্কুল তৈরি করা হয়েছে। এই স্কুলগুলোর আসল লক্ষ্য সেনাবাহিনীর জন্য ভালো কর্মকর্তা গড়ে তোলা। স্কুলগুলোতে নিয়মনিষ্ঠা ও সুশীল মূল্যবোধের ভেতর দিয়ে ছেলেমেয়েদের এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যাতে তাদের মধ্যে সামরিক শৃঙ্খলা, কর্তব্যপরায়ণতা ও সৎমানুষের গুণাবলি বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। অভিভাবকেরা এগুলোতে তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠাতে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেন। তাদের নিরাপদ ছাত্রজীবন ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে স্বস্তিবোধ করেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অনেক ভালো ও অভিনন্দনযোগ্য দিক আছে এই স্কুল-কলেজগুলোয়। তবু স্কুলগুলোর ব্যর্থতার দিকও অনেক। এখানে সুশীল আদর্শ ও মূল্যবোধ রয়েছে কিন্তু তা কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে। দেশের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন এক জগতে এই স্কুল-কলেজগুলোর ছাত্রছাত্রীরা জীবনবিহীন অবস্থায় বড় হয়, চৌকশভাবে কিন্তু অতি সরল ও অসহায়ভাবে।

কাজেই দেশের আগামী দিনের সৃজনশীল এবং সম্ভাবনাপূর্ণ মানুষ এখান থেকে বেড়ে উঠবে এমন আশা করা কঠিন। এদের সর্বোচ্চ সাফল্য হতে পারে সামরিক অফিসারের পাশাপাশি কিছু সরকারি কর্মকর্তা বা সদাগরি অফিসের নির্বাহী উপহার দেওয়া।

গত দু-দশক ধরে পশ্চিমা ধাঁচের আধুনিক কেতাদুরস্ত বেশকিছু উন্নতমানের ব্যয়বহুল ইংরেজি-মাধ্যমের স্কুল গড়ে উঠেছে ঢাকায়। স্কুলগুলো ঝকঝকে, তকতকে। বিত্তশালী অভিভাবকেরা এ স্কুলগুলোতে ছেলেমেয়েদের পড়াতে পারাকে তাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ বলে মনে করেন। কিন্তু এই স্কুল-কলেজগুলোতে এদেশের ছেলেমেয়েদেরকে গড়ে তোলা হচ্ছে এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে। এই স্কুলগুলোর নাক-উঁচু বিজাতীয় ও

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

যান্ত্রিক শিক্ষা পরিবেশ প্রতিমুহূর্তে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিজেদের দেশ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ঘৃণা ও অসম্মানের অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়, এই দেশ নিকৃষ্ট। এই দেশ দরিদ্রহতশ্রী। এর শিক্ষা-সংস্কৃতি, রুচি পরিবেশ সব ঘৃণ্য, তোমার বসবাসের যোগ্য নয়। তুমি মানুষ হচ্ছ এর চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ ও উপভোগ্য এক সমাজে বসবাসের জন্যে।' ইয়োরোপ আমেরিকার আগামী দিনের নাগরিক হবার জন্য। সে সমাজ অনেক আনন্দময়। এই স্কুলের শিক্ষা তোমাকে সেইসব দেশের যোগ্য করে তুলছে। এই শিক্ষা হওয়া উচিত তোমার স্বর্গ, ধর্ম, মোক্ষ। তোমরা এই শিক্ষাকে রক্তে-মজ্জায় শুষে নাও। আগামীতে আমাদের জাতীয় জীবনের বিকাশে এই স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীদের কোনো ভূমিকা থাকবে এমন আশা না-করাই ভালো।

আজ একটা সত্যিকার ভালো স্কুল-কলেজ এদেশের একটা বিরলতম দৃশ্য। হাতেগোনা যে দু-চারটি স্কুল বা কলেজ ভালো বলে পরিচিত সেগুলো আসলে আলোহীন সৌন্দর্যহীন একধরনের দম-আটকানো শ্বাসরুদ্ধকর ও শিশুহৃদয়ের নিগ্রহশালা ছাড়া আর কিছু নয়। জীবনের পাখা মেলার ফুল ফোটানোর কোনো রঙিন আয়োজন নেই এসবের চৌহদ্দিতে। স্বপ্ন ও আলোর জগতে আনন্দময় জাগরণের বদলে আছে উদয়াস্ত শৃঙ্খলা, শাসন আর পাঠ্যপুস্তকের শ্বাসরুদ্ধকর চাপে অপচিত, ক্লিষ্ট ও নিপিষ্ট কৈশোরিক জীবন। তবু নিরুপায় হয়ে এসব বিদ্যায়তনের দরজাতেই লক্ষ লক্ষ উৎকণ্ঠিত অভিভাবককে এসে ভিড় করতে হয় তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার একমাত্র আশ্রয়ের জন্যে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তবু মন্দের ভালো এই স্কুল-কলেজগুলো। এইসব স্কুল-কলেজে শিশু-কিশোর জীবনের কোনো সম্ভাবনাময় বিকাশের স্বপ্নকে বিকশিত করতে না পারুক, অন্তত ন্যূনতম শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা আর পড়াশোনার নিশ্চয়তা এগুলোতে আছে। সে নিশ্চয়তাটুকু দেওয়াও আজকের এই নৈরাজ্যধৃত দেশে সত্যি সত্যিই অসম্ভব।

এসব স্কুল বা কলেজের বাইরে সারাদেশে আজ কয়েক কোটি ছাত্রছাত্রী, যেসব স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করছে সেগুলো অব্যবস্থায়, মূল্যবোধহীনতায় বিস্রস্ত—আজ দেশকে যারা রক্ষা করবে, সামনের দিকে এগিয়ে নেবে, স্বপ্ন দেখাবে, দিকনির্দেশনা দেবে।

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ঢাকা কলেজ ও আমার শিক্ষকতা

১

ঢাকা কলেজে আমার শিক্ষকতার দিনগুলো ছিল অপরিসীম খুশি আর পরিতৃপ্তিতে ভরা। ছাত্ররা ছিল অসম্ভব মেধাবী আর সপ্রতিভ, আমার কোনো কথাই তাদের হাত এড়িয়ে মাটিতে পড়তে পারত না। প্রতিটা শব্দ প্রতিটা ইশারাকে লুফে নিয়ে মুহূর্তে তার পুরো দাম তারা চুকিয়ে দিত। আমার প্রতিটি অনুভূতি, উজ্জ্বলতা, রস-রসিকতা এমনকি সূক্ষ্ম উপলব্ধিগুলোও তাদের ভেতর সামগ্রিক পরিপূর্ণতায় অনুভূত হত, সাড়া জাগাত। ছোট-বড় প্রতিটা রঙ্গরস মুহুর্মুহু উত্তাল হাসিতে অভিনন্দিত হতে থাকত। শিক্ষকতার এর চেয়ে আনন্দ আর কিসে? সামনে-বসা শত শত ছাত্রের বিস্মিত চোখে নিজের আবেগ-অনুভূতিময় অস্তিত্বকে প্রদীপ্ত হয়ে ফুটে থাকতে দেখার চেয়ে অপার্থিব তৃপ্তি আর কোথায়? অধ্যক্ষ জালাল ঠিকই বলেছিলেন, 'আইয়া পড়েন ঢাকা কলেজে। দ্যাশের শ্যারা পোলাপান পড়াইতে পারবেন। ভালো মাস্টার তো ভালো ছাত্রই খুঁজে—যারা বুঝে,মনে রাখে।'

হ্যাঁ, সেইসব ছাত্র যারা 'বুঝে, মনে রাখে'। তাদের জন্যেই তো একজন শিক্ষকের আজীবনের রোদিত আর্ত যাত্রা, আত্মার উন্মুখ ক্রন্দন। ঢাকা কলেজের ঐসব অনুভূতিময়, প্রত্যুৎপন্নমতি ও দীপান্বিত ছাত্রদের তরুণ হৃদয়ের আনন্দ-মথিত ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে ভেসে কখন যে এত দীর্ঘ একটা সময় শেষ করে দিয়েছি টের পাইনি।

ঢাকা কলেজে আমার শিক্ষকতার তৃপ্তি সত্যি সত্যিই ছিল অপরিমেয়। জীবনের এই দিনগুলোর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। শিক্ষকতার এই মাদকতা আমাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে পৃথিবীতে আর কোনোকিছু হওয়ার কথা এই দিনগুলোতে আমার মনেই আসেনি। আমি এবং আমার কলেজ—এই হয়ে উঠেছিল আমার বর্তমানের বৈভব ও ভবিষ্যতের নিয়তি।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ষাটের দশকে দুবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষকতায় যোগদানের ডাক পেয়েছিলাম আমি। প্রথমবারে ডেকেছিলেন সে-সময়কার বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই। কিন্তু তাঁর প্রতি আমার দীর্ঘদিনের ক্ষতজর্জর অভিমান থাকায় সে-ব্যাপারে আমার উৎসাহ আসেনি। এর পরে ডেকেছিলেন মুনীর চৌধুরী, ১৯৬৮-৬৯-এর দিকে,তখন তিনি বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ। কিন্তু ততদিনে ঢাকা কলেজে অধ্যাপনার আনন্দ আমি পেয়ে গেছি। অত প্রাণবন্ত, সপ্রতিভ, উজ্জ্বল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথায়? কোথায় পাব পড়ানোর সেই অনাস্বাদিত তৃপ্তি, শিক্ষক-জীবনের অনির্বচনীয়তম আস্বাদ? ঢাকা কলেজের একটা শাখায় যত ভালো ছাত্র আছে, সারা বিশ্ববিদ্যালয়েও তা নেই। তাছাড়া মানের দিক থেকে বাংলা বিভাগের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে নিচে। যারা আর কোনো বিভাগে কোনোভাবেই ভাগ্য সুপ্রসন্ন করতে পারে নি,তারাই মোটামুটি এই বিভাগের ছাত্র। (অবশ্য ঐ বিভাগের প্রতি ক্লাসে সবসময়েই দু-চারজন অসামান্য কিছু ছাত্র থাকে যারা এর ব্যতিক্রম। গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ এককভাবে যতবড় অবদান রেখেছে, এদেশের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোনো বিভাগ যে তা পারেনি তা এঁদের জন্যেই।) এই অবস্থায় ঢাকা কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যাওয়ার অর্থ সবচেয়ে ভালো ছাত্রদের ছেড়ে সবচেয়ে খারাপ ছাত্রদের পড়াতে যাওয়া। আমি এর কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ঢাকা কলেজে শিক্ষকতা করার পর কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, আর কোথাও কোনো চাকরিই হয়ত করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। শঙ্করাচার্য লিখেছিলেন : ধন জন যৌবন—কোনোকিছুই গর্ব করার মতো কিছু নয়, জীবনও তো পদ্মপাতার ওপরের চঞ্চল নীর (যে-কোনো সময় পড়ে হারিয়ে যাবে), কান্তা-পুত্র কোনোকিছুই ভবসমুদ্র পারাপারের তরণী হবার যোগ্য নয়, কেবল একটি জিনিশই এ পথের পাথেয় হতে পারে : সজ্জনের সঙ্গতি। ভালো মানুষের সাহচর্য। ভালো, মেধাবী আলোকোজ্জ্বল মানুষের সান্নিধ্য। বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের চেয়ে সুন্দর এই পৃথিবীতে আর কী?

ছেলেবেলায়, স্কুল থেকে কলেজে উঠে, অর্থনীতির বইয়ে পড়েছিলাম কেন একজন শিল্পপতি, কন্ট্রাক্টর বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীর চেয়ে একজন শিক্ষকের বেতন কম। যুক্তি হিশেবে সেখানে বলা ছিল একজন শিক্ষকের জীবন কাটে মার্জিত, পরিশীলিত পরিবেশে, বৈদগ্ধ্যময় ব্যক্তিদের সাহচর্যে, উচ্চতর জীবনচর্চার অবকাশময় আনন্দে। জীবনের সেই মর্যাদা, তৃপ্তি বা শান্তি ঐ ব্যবসায়ী বা নির্বাহীর জীবনে নেই। এই বাড়তি প্রাপ্তির মূল্য দিতে শিক্ষকের আয় তাদের তুলনায় হয় কম। ঢাকা কলেজের শিক্ষকতায় ঐ তৃপ্তি আমার এত অপরিমেয় হয়েছিল যে কেবল বেতন কম হওয়া নয়, বেতন না-থাকাই হয়ত উচিত হত

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমার সত্যিকারের বেতন। এই পাওয়া যে কতটা তা বুঝেছিলাম কিছুদিনের অন্য কলেজে গিয়ে।

আগেই বলেছি একাত্তুর সালে কী পরিস্থিতিতে আমাকে ঢাকা কলেজ থেকে জগন্নাথ কলেজে বদলি হয়ে চলে যেতে হয়েছিল। একাত্তুর সালে যুদ্ধের কারণে পড়ানো সম্ভব না হলেও বাহাত্তুরে কিছুদিন আমি পড়িয়েছিলাম ঐ কলেজে।

ঐ সময়ের মাত্র কয়েক বছর আগে জগন্নাথ কলেজ সরকারি কলেজ হয়েছে। কলেজের প্রশাসন থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের মান তখনো বেশ নিচু। সংস্কৃত কবি ভবভূতি দেবী সরস্বতীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন : হে দেবী, আমার কপালে যত দুর্ভাগ্য ইচ্ছা লিখো তুমি, কিন্তু অরসিকের কাছে রসের কথা বলার দুর্ভাগ্য কিছুতেই লিখো না। একজন শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রদের হৃদয়ে অনুভূত বা উপলব্ধ না হতে পারা যে কী দুঃসহ বেদনার তা বুঝতে পেরেছিলাম ওখানে পড়াতে গিয়ে। আমি পড়িয়ে যাচ্ছি, সামনে সার-সার ছাত্র বসে আছে, কিন্তু প্রায় সবার চোখ ভাবলেশশূন্য, নিষ্প্রভ। পৃথিবীর তুচ্ছতম থেকে মহত্তম কোনো কথাই যেন সেখানে কোনোদিন আলোড়ন তুলবে না। ঢাকা কলেজের ছাত্রদের মতো সে-সব চোখ উজ্জ্বলিত নয়, সামান্য টোকায় শিশুদের মতো খলখলিয়ে ওঠে না। কথার পর কথা বয়ে যাচ্ছে, আমি আবেগ আর উদ্দীপনার শিখর ছুঁতে চলেছি, কিন্তু কোথাও কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, কেবল শত শত অপলক চোখের শান্ত মৃত দৃষ্টি আমার মুখের দিকে একটানা নিবদ্ধ। কী হিম, কী প্রাণঘাতী! হতাশায় ব্যর্থতায় আমার সারা অস্তিত্ব মুচড়ে মুচড়ে যেতে থাকত। বিপদকালের সব বাঙালির মতো রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ত :

... সেদিন চৈত্রমাস
তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

২

যাকে বলে নিখাদ একেশ্বরবাদী আমি ঠিক তাই। একের বেশি প্রেম, একের বেশি ঈশ্বর, এমনকি একের বেশি কলম, জুতো, চশমা কোনোকিছুই আমার ধাতে সয় না। একের বেশি হলেই এদের নিয়ে বিপদে পড়ি আমি, কখন যে হারিয়ে যায় বুঝতে পারিনা । এই একেশ্বরবাদিতার কারণেই হয়ত সবকিছুর মতো আমার সারাজীবনের পোশাকও একটা—পাজামা-পাঞ্জাবি। অনেকদিন একটানা পরার ফলে পোশাকটা আমার চেহারার সঙ্গে এমন একাকার হয়ে গেছে যে আজ অনেকেরই হয়ত সন্দেহ হয় যে ঐ পোশাক-পরা অবস্থায় আমি এই পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলাম কিনা। আমার ছাত্রেরা আমার এই পোশাক দেখে সারাজীবনই

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমার কথা লুফে নিয়ে ও বলল : তুমি তাঁর স্যার হতে পার, আমার তো স্যার না!

একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জীবনে 'স্যার' এতখানিই গুরুত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক শিশুদের কাছে মুর্শিদ যেমন শিক্ষকও তার কাছে তেমনি—তার আশ্রয়, উদ্ধার,পথনির্দেশদাতা এবং তার মনোজগতের চিরন্তনতার প্রতীক। চারপাশের সবকিছুর মধ্যেই ঐ সময় সে তার ঐ আকাঙ্ক্ষিত ধ্রুবকে প্রত্যাশা করে, শিক্ষকের কাছে এই দাবি তার সবচেয়ে বেশি। শিক্ষককে সে একটা অবিচল অপরিবর্তনীয় সত্তা হিসেবে দেখতে চায়, এতে তার আত্মায় জোর আসে। এইজন্যে উক্তিতে, কাজে, আদর্শে, মূল্যবোধে শিক্ষক যদি কথায় কথায় পাল্টাতে থাকেন, ডিগবাজি খেতে থাকেন, তাহলে সে অসহায় বোধ করে, তার ভেতরটা ঝাঁকি খেয়ে এলোমেলো হয়ে যায়, যেমন আমাদের এলোমেলো হয়ে যায় রাজনীতিবিদদের কথায় কথায় ডিগবাজি খেতে দেখলে। শিক্ষক আদর্শ পাল্টাতে থাকলেই কেবল এমন হয় তা নয়, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ সবকিছু নিয়েই তার ভেতরে এটা ঘটে। একজন শিক্ষকের বাইরের চেহারাটা যদি ঘন ঘন পাল্টাতে থাকে,—আজ তিনি স্যুট পরলেন তো কাল পরলেন পাজামা-পাঞ্জাবি,আবার পরশু দুটোকেই বাদ দিয়ে ধুতি পরেই চলে এলেন ইশকুলে, একদিন দাড়ি রাখলেন তো আরেকদিন পুরো ক্লিনশেভ হয়ে এলেন, আবার আরেকদিন স্কুলে এলেন শুধু একগালে দাড়ি রেখে—তবে তা ছাত্রের মনকে মহা গোলমালে ফেলে। ছাত্র তখন শিক্ষককে ঠিকমতো চিনে উঠতে পারে না, তার আকাঙ্ক্ষিত ধ্রুব জগতের প্রতীক হিসেবে তাঁকে খুজে পায় না, শিক্ষককে নির্ভর করে শক্তিমন্ত ও চিরন্তন জগৎ রচনার তার যাবতীয় উদ্যোগের ওপর নৈরাশ্যের অন্ধকার নেমে আসে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

শিক্ষকদের এইসব ছোটখাটো পরিবর্তন ছাত্রদের মনোজগতকে যে কতখানি ওলটপালট করে দেয় আমার জীবনের একটা গল্প দিয়ে তার উদাহরণ দিই। ১৯৭৫ সাল। একটা জমজমাট বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান শুরু করেছি টেলিভিশনে। টেলিভিশনের বৈভবের জগতে আমি সবসময়েই চালচুলোহীন ভিখিরি, শাদামাঠা পাজামা-পাঞ্জাবি পরেই আজীবন অনুষ্ঠান করেছি। কিন্তু অনুষ্ঠানের জাঁকজমকের সঙ্গে তাল দিতে গিয়ে সেবার সত্যি সত্যি জমকালো পোশাক পরার দরকার হল। কিছু না হোক, নিদেনপক্ষে একটা আকর্ষণীয় পাঞ্জাবি না হলে যেন আর চলেই না। ফ্লোরের বর্ণাঢ্য জগৎ, বড়বড় তারকা আর সুন্দরীর পদপাতে চমকানো পৃথিবীতে নিজেকে সত্যি সত্যি নিষ্প্রভ মনে হবে। সবার সঙ্গে পরামর্শ করে একটা কারুকাজ-করা পাঞ্জাবি পরার সিদ্ধান্ত নিলাম। না, এমন কিছু কারুকাজ নয় ; নেহাতই বুক আর হাতের দুপাশে দেখা-যায় কি না-যায় এমনি কিছুটা হালকা নকশার অল্প আঁকিবুকি, যাতে শিক্ষকতার মানও বজায় থাকে, আবার টেলিভিশনও বেঁচে যায়। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটা-যে ছাত্রের হৃদয়কে কতটা অসহায় করে তুলতে পারে

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তা বোঝা গেল পরের দিন কলেজে পা দিয়ে। কলেজের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি, একটা নিরীহ গোছের ছেলে আমার কাছে এসে বিনীত স্বরে বলল, আমার সঙ্গে সে কিছু কথা বলতে চায়। আমি তাকে কিছুটা দূরে, একটা নিরালা জায়গায় নিয়ে তার কথা বলতে বললাম। সে সরাসরি আমাকে বলল, 'গতকাল টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে আপনি একটা রঙচঙা পাঞ্জাবি পরেছিলেন'—বলেই সে চুপ করে রইল। আমি তার গলার স্বর থেকে টের পেলাম ব্যাপারটা তাকে ব্যথিত করেছে। আমি অপরাধীর মতো তার অভিযোগ স্বীকার করে কৈফিয়তের সুরে বললাম, 'টেলিভিশনের ব্যাপার তো, একটু পড়তে হয়েছে আর কি।' সে খানিকটা চুপ করে থেকে ধরা-গলায় বলল, টেলিভিশন আপনার কাছে অত জরুরি হলে টেলিভিশনেই থেকে যাবেন, কলেজে আসবেন না।' আমি তার কথায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। সে আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনার জন্য আমাদের সবার একটা শ্রদ্ধার অনুভূতি আছে। সেটাকে অপমান করার অধিকার আপনার নেই।' দেখলাম সে কথা বলতে পারছে না, তার গলার স্বর আটকে আসছে।

আজ বুঝি শ্রদ্ধার অনুভূতি বলতে সে ধ্রুবত্বের অনুভূতি বুঝিয়েছিল—সেই ধ্রুবত্ব যাকে সে গভীরভাবে নির্ভরযোগ্য মনে করেছে। এসব থেকেই বোঝা যায় শিক্ষকের ভাবমূর্তিগত অপরিবর্তনীয়তার ব্যাপারে ছাত্রেরা কতখানি অনমনীয়। মায়ের প্রেমিকের ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের যে-মনোভাব, শিক্ষকের ওলটপালট খাওয়ার ব্যাপারেও ছাত্রদের মনোভাব তাই। এটা তারা সহ্য করতে পারে না। এর ভেতর তারা তাদের অস্তিত্বের আশঙ্কাজনক বিপর্যয় দেখতে পায়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এজন্যেই শিক্ষকতায় যোগ দেবার পর আর পোশাক পরিবর্তন করা সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে। ছাত্রদের অনুভূতির কথা ভাবতে হয়েছে বলেই পারি নি। কেবলি মনে হয়েছে আমার পোশাক ওলটপালটের কারণে তাদের ক্ষতি হতে পারে, আমার শিক্ষকতার মূল উদ্দেশ্যটাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

৩

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কটা ভারি অদ্ভুত। যেমন এ স্নিগ্ধ আর পবিত্র, তেমনি মধুর আর চিরদিনের। একবার ছাত্র মানে চিরদিনের জন্যে ছাত্র, একবার শিক্ষক মানেও চিরকালের জন্যে শিক্ষক। এই সম্পর্কের কোনোদিন মৃত্যু হয় না। যেখানে যতদিন পরেই ছাত্র-শিক্ষকের দেখা হোক-না কেন, সেই মুহূর্তটিতে তারা দুজন দুজনের কাছে প্রথমদিনের মতোই উজ্জ্বল আর আলোময়। এর কারণ সোজা। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রেরা শিক্ষকদের সামনে পায় তাদের জীবনের সবচেয়ে প্রাথমিক ও অনুভূতিময় দিনগুলোয়, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধায় ভরা জীবনের মহত্তম লগ্নে। অমলিন

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বিস্ময় আর স্বপ্নের অঞ্জন চোখে মেখে এইসময় তারা তাদের শিক্ষকদের দিকে তাকায়, শিক্ষক তাদের চোখে প্রতিভাত হয় স্বর্গের দুর্লভতম দেবতার চেহারায়। তাদের নিষ্পাপ চোখের পাতায় শিক্ষকের এই-যে দেবদুর্লভ ছবি একবার গাঁথা হয়ে যায়, সেই জ্যোতির্ময় ছবিটির কোনোদিন আর মৃত্যু হয় না। যেখানে যতদিন পরেই ঐ শিক্ষকের সাথে দেখা হোক সে তার সামনে অল্প বয়সের ঐ ছাত্র বা ছাত্রীটি হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আমার জীবনের একটা ছোট গল্প মনে পড়ছে।

একদিন মীরপুর থেকে বাংলামোটরের দিকে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। ১৯৮২ সাল। দেশে তখন সদ্য-আসা মার্শাল ল' চলছে, সেই সাথে ট্র্যাফিক সপ্তাহের কড়াকড়ি। যেখানে-সেখানে পুলিশ গাড়ি থামিয়ে কাগজপত্র চেক করছে, শাস্তিও দিচ্ছে এলোপাতাড়ি। আমার গাড়িতে দুয়েকটা কাগজপত্রের গোলমাল ছিল—রোড ট্যাক্স বা ফিটনেস এমনি কিছু একটা বাকি। এমনিতে ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে কোথায় ট্র্যাফিক পুলিশ ধরে বসে, লজ্জায় পড়তে হয়। দেখে বুঝে এগোচ্ছি, সামনে সার্জেন্ট-আকীর্ণ চৌমাথা দেখলে সাবধানে এড়িয়ে চলছি, কোনোমতে বাসায় পৌঁছোতে পারলে বাঁচি। ফার্মগেট দিয়ে শহরে আসার পথে খুব একটা ট্র্যাফিকের ঝামেলা নেই, তাই সেই পথ ধরলাম। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত্রি হয়। ফার্মগেটের কাছাকাছি হতেই দেখি সেখানেও ট্র্যাফিক সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর কপাল এমনি খারাপ যে মোড়ের কাছে আসতেই লাল বাতি জ্বলে উঠল। সব মিলে সোনায় সোহাগা। ঢিপঢিপ করা বুকে অপেক্ষা করছি, হঠাৎ দেখি রাস্তার উল্টোদিক থেকে যমদূতের মতো দেখতে একটা সার্জেন্ট আমার গাড়ি তাক করে এগিয়ে আসছে। অত কালো বিশাল দানবীয় সাইজের সার্জেন্ট আমি বাংলাদেশে আর দেখিনি। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। তবু এসব নিয়ে আমার যে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই সেটা দেখানোর জন্য মুখে নির্বিকার ভাব ফুটিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। একসময় টের পেলাম দৈত্যটা মচমচ করে ঠিক আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি কাঁধের ওপর তার নিশ্বাসের শব্দ যেন টের পাচ্ছি। এবার আর তার দিকে না-তাকিয়ে উপায় নেই। ভয়ে ভয়ে একটু একটু করে তার দিকে যেই মুখ ফেরাতে গেছি, অমনি ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সেই বিশাল অভ্রভেদী দৈত্যটা যেন হঠাৎ একতাল কাদার মতো বিধ্বস্ত হয়ে গেল সামনে। পুলিশি কায়দায় নয়, উপচানো খুশিতে দাঁতগুলো যথাসম্ভব উদ্ভাসিত করে, আকর্ণ হাসিতে বিস্ফারিত আনন্দ-বিকৃত গলায় কপালে হাত ঠেকিয়ে চিঁ হিহি করে উঠল: 'স্লামালইকুম স্যার'! হ্যাঁ, বিশ-পঁচিশ বছর আগে গ্রাম থেকে পড়তে আসা কলেজের একাদশ শ্রেণীর অসহায় অপ্রস্তুত চেহারার অবিকল সেই ছেলেটি।

কিন্তু কেন এমনভাবে এলিয়ে পড়ল সে? কারণ সোজা। যেদিন সে কলেজে পড়তে এসেছিল সেদিন সে কৈশোর-অতিক্রান্ত একজন অনুভূতি-কাঁপা তরুণ। তার দুই চোখে সেদিন শুধু আবেগ আর বিস্ময়! একটা নতুন, অপরিমেয় আর

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ঐশ্বর্যময় জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে সে তখন। সেদিন তার তুচ্ছ জীবনের সামনে আমরা, এই শিক্ষকরা, ছিলাম দেবতার আসনে আসীন। তার স্বপ্ন আর বিস্ময়ভরা জীবনের সবচেয়ে দেবদুর্লভ মানুষ। আজ অনেকদিন পর তার সামনে পড়তেই মাঝখানের এতগুলো দিন মুহূর্তে তার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেছে। সেই অসহায় করুণ ছেলেটি ভেঙে ভেঙেচুরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার জীবনের সূচনালগ্নের সেই পরাক্রান্ত কিংবদন্তিটির সামনে। সে যে আজ একজন ডাঁটপাট-ওয়ালা অফিসার,অনেক দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তা একমুহূর্তে মিথ্যা হয়ে গেছে তার কাছ থেকে। এর মধ্যেকার তার সব অগ্রগতি আর সাফল্য সব মিথ্যা হয়ে গেছে। বিশালকায় একটা দৈত্য একতাল কাদা হয়ে গেছে । এই হল শিক্ষকের সামনে একজন ছাত্র। শৈশবের অনুভূতিময় দিনগুলোয় যে-চোখে সে একবার শিক্ষককে দেখেছে এবং শিক্ষকের সামনে নিজেকে যা বলে অনুভব করেছে, তাঁর সামনে চিরদিন সে তাই। পরিণত বয়সের বিচার-বিশ্লেষণ দিয়ে সে তার চিন্তা-ভাবনার জগতে অনেক পরিবর্তন আনতে পারে, কিন্তু কিশোর-তরুণ বয়সের এই নায়কদের ব্যাপারে তার অনুভূতির খুব একটা পরিবর্তন হয় না। হাইকোর্টের জজ বা সরকারের সচিব যে ছেলেবেলার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষককে দেখলে আচমকা পায়ে হাত দিয়ে বসেন, এর কারণ এই। এ হল জীবনের প্রথম বিস্ময়ের সামনে মানুষের চিরকালের প্রণতি, জীবনের প্রগাঢ়তম প্রাপ্তির কাছে মানুষের সকৃতজ্ঞ ঋণস্বীকার।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটা সত্যি ভারি অদ্ভুত। আগেই বলেছি ছাত্রদের জীবনের প্রথম নায়ক শিক্ষকেরা। কিন্তু ছাত্রও কি শিক্ষকের জীবনে এমনি অর্থময় হয়ে বেঁচে থাকেন? একজন ছাত্র তাঁর জীবনের গুটিকয় শিক্ষককে হৃদয়ের ভেতর যতবড় জায়গা দেয় একজন শিক্ষক কি তার একটিমাত্র হৃদয়ে তাঁর সারাজীবনের এত ছাত্রকে আলাদা আলাদা করে সেই জায়গা দিতে পারেন? উত্তরটা কঠিন, তবু বলতে চাই : পারেন—সুহৃদয়সম্পন্ন শিক্ষক পারেন। হয়ত একটু আলাদাভাবে, আলাদা অর্থে পারেন, তবু পারেন। একজন সত্যিকার শিক্ষকের কাছে ছাত্র কী? ছাত্র তো তাঁর আত্মার সন্তান—অচেনা, অপরিচিত, রক্তসম্পর্কহীন—দূরদূরান্ত থেকে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে তাঁরই জীবন শোষণ করে বেড়ে ওঠা তারই অনিবার্য উত্তরাধিকারী। এই ছাত্রই তো তাঁর সম্ভাবনা, বিকাশ, পরিণতি—তাঁর জীবন, জীবনের অর্থময়তা ; জন্ম এবং জন্মান্তর। তবু এটা ঠিক যে, শিক্ষক এবং ছাত্রের অবস্থান এক নয়। একজন ছাত্রের জীবনে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি নয়, হৃদয়ের ওপর উজ্জ্বল আলো-ফেলা শিক্ষকের সংখ্যা আরও কম, কিন্তু শিক্ষকের জীবনে ছাত্রের সংখ্যা অগণিত। লেখকের যেমন পাঠক, গায়কের যেমন শ্রোতা, টিভি উপস্থাপকের যেমন দর্শক, রাজনীতিবিদের যেমন জনতা, শিক্ষকের তেমনি ছাত্র। একজন শিক্ষক আজীবন দাঁড়িয়ে থাকেন ছাত্র নামের এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সামনে। লেখক, গায়ক, রাজনীতিবিদ বা

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

টিভি উপস্থাপকের পক্ষে যেমন তার শ্রোতা-দর্শকদের আলাদাভাবে চিনে রাখা সম্ভব নয়, শিক্ষকের বেলায়ও প্রায় তাই। তবু কী করে যেন আমরা শিক্ষকেরা তাদের চিনে ফেলি। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্ক আছে তা টের পাই। ঘর-ভর্তি লোকের মধ্যে কোথাও একজন ছাত্র থাকলে মুহূর্তেই আমরা তাকে শনাক্ত করে ফেলি। কী করে যেন একটা গোপন অতিন্দ্রিয় ও রহস্যময় যোগাযোগ ঘটে যায়। বিশ-ত্রিশ-চল্লিশ বছর পরে হলেও দেখামাত্র আমরা তাকে অব্যর্থভাবেই টের পাই। মায়ের মতো তার গায়ের গন্ধ চিনে ফেলি। নিজের অজান্তে, চেতনার অগোচরে ফেলি। শিশু যেমন মাকে, পাখিরা যেমন শত্রুকে, মানুষ যেমন মৃত্যুকে—আমরা শিক্ষকরা তেমনি ছাত্রকে চিনি। এই চেনা জীবনের এক গভীর তলের চেনা। এই চেনা রহস্যময় আর অলীক। কেবল মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে এর পরিমাপ করা কঠিন।

না, একজন শিক্ষক সারাজীবনের সব ছাত্রকে চেনেন না। তবু-যে ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের এমন একটা সুগভীর হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার কারণ শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রকে আলাদাভাবে না চিনলেও তাঁর সারাজীবনের ছাত্র-পরিমণ্ডলটিকে চেনেন। এই ছাত্র-জগৎই তাঁর ঘর, তাঁর বসতবাড়ি, তাঁর দৈনন্দিন ঘরকন্নার আঙিনা। এইখানে আলোক-ভরা নীল আকাশের নিচে সুখে-দুঃখে, শীতে-গ্রীষ্মে তিনি বেড়ে ওঠেন, পূর্ণ হন। এই ছাত্র-জগৎ তার প্রথম জন্মস্থান এবং সর্বশেষ দেবালয়। এইখানে দিনের পর দিনের প্রার্থনা আর আত্মাহুতির ভেতর দিয়ে তিনি পূত হন, পাপহীন হন। এইখানে ঘটে তাঁর দ্বিজত্ব ও নির্বাণ। চারপাশে জড়ো হওয়া ছাত্রদের ভেতর সারাজীবন থাকতে থাকতে তাদের নিশ্বাস তাঁর চেনা হয়ে যায়; তাদের বুকের উত্থান-পতন, রক্তধারায় ছুটে চলা তাঁর নিজের প্রতিটি জীবকোষে তিনি অনুভব করেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তবে একজন সৎ শিক্ষকই কেবল এটা পারেন, অশিক্ষক নন। ছাত্ররাও সব শিক্ষককে মনে চিরজাগরূক করে রাখে না। মানুষ অত বোকা নয়। শিক্ষকের খাতায় নাম লেখালেই কেউ একজন শিক্ষক হয়ে যান না। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন : সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। শিক্ষকদের বেলাতেও কথাটা একই রকম খাটে। সকলেই শিক্ষক নয়, কেউ কেউ শিক্ষক। যে-মানুষ ছাত্রদের বিকাশের ভেতর নিজের নিয়তিকে রক্তমাখা ভবিতব্য হিশেবে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, ছাত্রদের জীবনের ভেতর শবেবরাত রাত্রের কোটি কোটি প্রদীপের মতো জ্বলে উঠতে পারেন, তিনিই তো শিক্ষক। তাঁর স্মৃতিই তো ছাত্রের আমৃত্যু স্মরণ, তাঁর ব্বাবার দিকেই তো ছাত্রের মর্ত্যকালের নিদ্রাহীন যাত্রা।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমার শিক্ষকতার টুকিটাকি

১

কাবুলিওয়ালা গল্পে ছোট্ট মিনির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি একখণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না।

মিনির শৈশবের সঙ্গে আমার খানিকটা মিল ছিল। মিনির প্রথম শৈশবের মতো বছর-দশেক পর্যন্ত আমিও ছিলাম প্রায় ভাষাহীন। বোবার মতো অবাক হয়ে সবকিছু কেবল দেখে গেছি। এরপর কথা বলতে শুরু করেছি। কিন্তু সেই-যে কথাবলা শুরু করেছি আজও তা থামেনি। সেই অফুরন্ত কথাবলার আনন্দিত অন্তহীন সমুদ্রে আমি আজও ভেসে চলেছি। চল্লিশ বছর ধরে আমার একটানা মাথাধরার রোগ, ক্ষয়-করা বার্ধক্য, মৃত্যু-আসন্নতার নিঃস্ব দিনগুলোতেও এর বিরতি হয় নি। চারপাশের জড়ো হওয়া মানুষদের কথার আনন্দে প্রাণবন্ত আর মুখর করে রাখাকে আমি আজীবন প্রায় আমার ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে এসেছি, জগতের প্রতি আমার কর্তব্য বলে ভেবেছি। এর মধ্যে জীবনের ও বেঁচে থাকার অর্থময়তা খুঁজতে চেয়েছি।

অফুরন্ত কথাবলার ও কথা বলে অন্যদের প্রাণবন্ত করে রাখার এই আবেগ আমার শিক্ষকতার ব্যাপারে খুবই কাজে এসেছিল। আমার ক্লাসগুলো হয়ে থাকত হাসিখুশি, প্রাণবন্ত এবং ছাত্রদের ঘন ঘন হাস্যরোলে ভরা। আমার ধারণা ক্লাসের কথাবার্তার ভেতর আমি কবিতা, দার্শনিকতা এবং নির্মল কৌতুকের সমবায় ঘটাতে পেরেছিলাম। কেবল আমি নই, আমাদের বাসার আব্বা থেকে আরম্ভ করে আমাদের সব ভাইবোনের মধ্যেই সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত কথাবলার উৎসাহ ছিল। আমাদের প্রায় সবারই কণ্ঠস্বর ছিল ভরাট ও আবেগময়। সবারই কথা ছিল প্রসাদগুণসম্পন্ন। আব্বার কথা আগেই বলেছি। আব্বা ছাড়া আমাদের

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ভাইবোনদের যে-চারজন শিক্ষকতায় গিয়েছিলাম তারা সবাই শিক্ষক হিসাবে কমবেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলাম। আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে আল-মনসুর টিভি-অভিনেতা হিসেবে খ্যাতিমান হয়েছিল। কিন্তু ওর কথা ছিল অসম্ভব রম্যতাগুণসম্পন্ন। আমার ধারণা আমাদের সবাই যদি শিক্ষক হতাম তবে সবাই জনপ্রিয় ও সফল হতাম।

মানুষের সামনে কথাবলার সুযোগ হয়েছে আমার চারভাবে—সভা-সমিতিতে, টেলিভিশনে, বন্ধুবান্ধবের আড্ডায়, ছাত্রদের সামনে।

ছেলেবেলা থেকেই একটা ব্যাপারে আমি খুব অসহায়। নিঃসঙ্গতার জিনিশটা আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। একা হলেই আমি কবরের শীতল অনুভূতিতে রুগ্‌ণ হয়ে উঠতে থাকি। এইজন্যে মানুষের মুখ না-দেখলে আমি বাঁচি না। প্রতিমুহূর্তে আমি আমার চারপাশে মানুষের প্রাণবন্ত ও আনন্দময় মুখ দেখতে চাই—সে মানুষ সুখী, দুঃখী, উৎফুল্ল, বীভৎস, ভয়ংকার বা আবিল যাই হোক-না কেন। তাদের সুখ, দুঃখ, রূঢ়তা, মহত্ত্ব, আনন্দ-বেদনার সঙ্গী হয়ে আমি বাঁচতে চাই। এজন্যে সারাজীবন আমি আমার চারপাশে কেবলই মানুষ খুঁজে বেড়িয়েছি। মানুষ সজীব—মুখর। বন্ধুবান্ধবের আসর, সভা-সমিতি, শিক্ষকতা, টেলিভিশনের পর্দা, এমনকি লেখা—সবখানে ঐ মানুষকে স্পর্শ করার দিকে এগিয়ে গেছি। এইজন্যে কথা—বিশেষ করে, প্রাণবন্ত আনন্দময় কথা এত বেশি করে দরকার হয়েছে আমার সারাজীবন। দরকার হয়েছে ঐ মানুষদের প্রমোদপূর্ণভাবে আমার চারপাশে জড়ো করে রাখার দরকারে। জীবনে আনন্দমধুরভাবে বাঁচে থাকার স্বার্থে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কিন্তু যে-সব মানুষের ভেতর আমি বেঁচে থাকতে চাই তারা একটা শর্ত পূরণ করলে আমি প্রাণে বাঁচি। এই মানুষ যেন হয় আমার পরিচিত মানুষ। পরিচিতদের ভেতর স্বচ্ছন্দ্যে আনন্দে উষ্ণ হয়ে বাঁচতে পারলেই আমি কেবল স্বস্তি অনুভব করি। আমার যত অসুবিধা অপরিচিত মানুষ নিয়ে। অপরিচিত অচেনা মানুষের পরিবেশে আমি অদ্ভুতভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি, একটা স্নায়বিক বিকলতায় রুগ্‌ণ হয়ে উঠতে থাকি। একটা তীব্র হীনমন্যতাবোধ আমাকে ক্লিষ্ট করতে থাকে। সভা-সমিতির বক্তৃতায় অচেনা অপরিচিত মানুষের সামনে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। সামনে বসে-থাকা সারস্বত সমাজ, বিদগ্ধ সুধীবৃন্দ আমাকে ভীত করে তোলে। মনে হয় সবাই যেন আমার বালখিল্য কথাবার্তা শুনে আমাকে ভেতরে ভেতরে উপহাস করে চলেছে। তাদের চোখমুখের সপ্রশংস উৎসাহকেও আমার কাছে বিদ্রূপের হাসি বলে মনে হতে থাকে। সভা-সমিতির বক্তৃতার মতো টেলিভিশনের অনুষ্ঠানও আমার অস্তিত্বকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলেছে সবসময়। মনে হয়েছে সারাদেশে টিভি-সেটের সামনে বসে-থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের দ্বিগুণ-সংখ্যক বিদ্রূপভরা চোখ দিয়ে আমাকে উপহাস করে চলেছে। আর আমি

Scan & Upload by Tusin ahmed

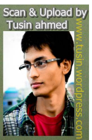

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ঝড়ের ঝাপটায় পথ-হারানো পাখির মতো বিষণ্ন চুপসানো চেহারায় ফ্লোরের উপর পড়ে আছি। এর মানে এই নয় যে সভা-সমিতির বক্তৃতা বা টিভি অনুষ্ঠান আমি খারাপ করেছি। না, খারাপ আমি করি নি। কিন্তু ভয় পেয়েছি। অসহ্য আতঙ্কে অসুস্থ অবস্থায় আমাকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হয়েছে।

কিন্তু ক্লাসের বক্তৃতা ছিল আমার কাছে খোলা মাঠের মতো অবারিত আর আলোময়। অলীক পাখির মতো হালকা পাখায় আমি সেখানে উড়ে বেড়িয়েছি। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের এক-একটা ক্লাসের অবলীল পরিসরে আমার শরীর হালকা হতে হতে যেন একসময় রেশমি পালকের চেয়ে হালকা হয়ে গেছে। টেলিভিশন অনুষ্ঠানের মতো সময়ের ছককাটা গৎ-বাঁধা দম-আটকানো চাপ ছিল না সেখানে। ছিল না মঞ্চের বক্তৃতার প্রাণ-শুকিয়ে-তোলা আতঙ্ক। ছাত্ররা আমাকে প্রশ্ন করার বদলে আমার কথা শুনে যেতে ভালোবাসেছে। কোথাও আমি কোনো বাধা অনুভব করি নি। নিজেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আর নির্ভার মনে হয়েছে সেখানে। নির্ভার আর ফুরফুরে। উৎকণ্ঠাহীন স্বতঃস্ফূর্ততায় সেখানে শিশুদের মতো ইচ্ছামতো ছুটে বেড়িয়েছি কথার পর কথা বলার সহজাত আনন্দে। আমার সেই আনন্দ আর স্বতঃস্ফূর্ততা ছাত্রদের হৃদয়কেও ছুঁয়ে গেছে। ছাত্রদের সঙ্গে আমার সেই প্রাণের অম্লান যোগাযোগ আজও একই রকম সজীব।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

২

এই প্রসঙ্গে ভালো শিক্ষক হওয়ার সঙ্গে ভালো কথাবলার সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথা বলে নিতে ইচ্ছা করছে। একজন শিক্ষকের মধ্যে নানান ধরনের গুণের সমাহার থাকতে হয়, না হলে ভালো শিক্ষক হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। আদর্শ, মূল্যবোধ, ভালোমাপের পড়াশোনা, উদারতা, মমতা, বড় দৃষ্টিভঙ্গি—এসব গুণ এর মধ্যে পড়ে। কিন্তু যে-গুণটি না থাকলে তিনি শিক্ষক নামের যোগ্যই হয়েই ওঠেন না তা হল সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথাবলার স্বতঃস্ফূর্ত সপারগতা। চমৎকার কথার মুগ্ধ মোহাবেশ রচনা করে ছাত্রকে ক্লাসের ভেতর প্রজ্জ্বলিত করে রাখতে হয় তাঁকে। পড়ানোর বিষয়গুলোকে সাবলীল প্রাঞ্জল ও আনন্দময়ভাবে ছাত্রদের রক্তে সঞ্চারিত করে রাখতে হয়। প্রতিটি শিক্ষকই শেষ বিচারে একজন হ্যামিলনের বাঁশিঅলা যিনি কথার ইন্দ্রজাল দিয়ে ছাত্রদের হৃদয়কে তাঁর পিছনে পিছনে নৃত্যগীতমুখরভাবে আনন্দে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। আমি মনে করি একজন শিক্ষকের জীবনে কথার ভূমিকা তাঁর জানার ভূমিকার চাইতে বড় এবং ছাত্রদের জীবনের দিক-নির্দেশক হিসেবে তাঁর ভূমিকার চেয়ে কম নয়। এটা স্কুল-কলেজ পর্যায়ে কেবল নয়, বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও কমবেশি সত্যি।

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

শিক্ষক জ্ঞানের জগতের ভিক্ষাদাতা নন, তিনি জ্ঞানের জগতে আসতে চাওয়া ছাত্রদের আহ্বানকারী। উজ্জ্বল অসাধারণ শব্দের অমিত শক্তি ছাড়া কী দিয়ে তিনি সেই জগতে তাদের ডাক দেবেন? তাদের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করবেন? ধরা যাক একজন শিক্ষকের কথা—যিনি জানেন অনেক। নিজের বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁর গভীর। কিন্তু তাঁর বিষয়কে, ঐ বিষয়ের বৈভব ও মহিমাকে তিনি ছাত্রদের চোখের সামনে অনিন্দ্যভাবে তুলে ধরতে পারেন না। ফলে তাঁর বক্তৃতা ছাত্রদের কাছে বিরস মনে হয়, শুনলে বিরক্তি আর একঘেয়েমিতে তাদের মাথা ধরে ওঠে। এমন শিক্ষক কি ছাত্রদের মনোজগতে কোনো সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন জাগাতে বা প্রভাব ফেলতে পারবেন? অন্যদিকে একজন শিক্ষক যদি বিষয়জ্ঞানের গভীরতায় তার চেয়ে অপ্রতুলও হন কিন্তু তাঁর থাকে শিক্ষকের সেই দুর্লভ শক্তি—অনবদ্য, চমকপ্রদ, মনোরঞ্জনকারী কথাবলার সপ্রতিভতা, যদি ছাত্রের রক্তে রক্তে তাঁর বক্তব্যকে অনুরণিত করে তুলতে পারেন তিনি, তাঁর বক্তব্য-বিষয়ে ছাত্রদের স্বপ্নকে প্রজ্জ্বলিত করে তুলতে পারেন—তবে এদের দুজনের মধ্যে কাকে শিক্ষক হিসেবে ভালো বলব আমরা? দ্বিতীয় জনকে নয় কি? এইজন্য আমার ধারণা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা বিচারের সময় তাঁদের জ্ঞান বা শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচারের আগে তাঁর সুন্দর বাচনভঙ্গি, উপস্থাপনার চমৎকারিত্ব এবং তার হৃদয় জয় করার ক্ষমতার ওপর বেশি জোর দেওয়া উচিত।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সুন্দর করে গুছিয়ে আকর্ষণীয়ভাবে কথা বলতে পারার সপারগতাকে অনেকেই খুব একটা মূল্য দিতে চান না। ওকালতি বা রাজনৈতিক মঞ্চের বক্তৃতা যা সরাসরি অর্থপ্রাপ্তি বা ক্ষমতাপ্রাপ্তির সঙ্গে যুক্ত তাকে মানুষ সম্মান-সমীহ করে কিন্তু যেখানে তা বৈষয়িক লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত বা আশ্বস্ত করে না, সেখানে তাকে আদৌ গুরুত্ব দিতে চায় না। এজন্যেই রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতায় অনটন-জর্জরিত কবিপত্নী স্বামীর কবি-প্রতিভাকে ততটা মূল্য দেয় নি, যতটা দিয়েছিল রাজকণ্ঠের মালাকে। কিন্তু সুন্দর মনোমুগ্ধকর কথাও আসলে অত সোজা নয়। 'পুরস্কার' কবিতার কবি ঐ দিয়েই রাজকণ্ঠের মালা জিতে আনতে পেরেছিলেন। কবিতা লেখার প্রতিভার মতো, লোকশ্রুত মতো, বৈজ্ঞানিক কল্পনার মতো, অসাধারণ দার্শনিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের মতো, নারীর জ্বলন্ত সৌন্দর্যের মতো এ-ও এক বিরল জিনিস। সবার মধ্যে এটা থাকে না। কারো কারো মধ্যেই কেবল থাকে। এটাও একটা প্রতিভা। একজন মানুষের সজাগ বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগৈশ্বর্য, ক্ষিপ্র চৈতন্য ও উপলব্ধিজগৎ—সবকিছুর গভীর প্রদেশকে আলোড়িত মথিত শিহরিত করে এর অনিন্দ্য গোলাপ ফুটে ওঠে। এখানে আহরণযোগ্য পুষ্প এবং আহরণকারী মক্ষিক বক্তা নিজেই। শিক্ষক যদি সম্মোহনকারী কথক হিসাবে ছাত্রদের কাছে ব্যর্থ হন, তবে তো তাঁর শিক্ষকতা জীবনই ব্যর্থ হয়ে গেল। একজন কবি তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে তাঁর বক্তব্যকে

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অনবদ্যভাবে প্রকাশ করতে পারলে তবেই না তার বক্তব্য নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই, তার বিষয়ের ভালো-মন্দ নিয়ে কথা বলি। সুন্দরভাবে প্রকাশিত না হলে তো তার বক্তব্য হয়ে থাকবে গুদামের মালপত্রের মতো মৃত আর জড়। সে-ব্যাপারে কেন উৎসাহ হবে পাঠকের?

সুন্দর কথাবলার শক্তি একজন শিক্ষকের জন্যে যে কতটা প্রয়োজনীয়, আমার কলেজ-জীবনের একটা ঘটনা দিয়ে তার প্রমাণ দিতে চেষ্টা করি। আমাদের কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক নারায়ণ সমাদ্দারের কথা আগেই বলেছি। অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন তিনি। বিস্ময়কর আর আকর্ষণীয় ছিল তাঁর পড়ানো। তাঁর পড়ানোর ভঙ্গি আমাদের জীবনের গভীর তলকে আশ্চর্যভাবে পুলকিত করে তুলত। কলেজে ভর্তি হবার কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুঝে ফেলেছিলাম যে ভবিষ্যতে সাহিত্য নিয়ে পড়াই হবে আমার জন্যে সবচেয়ে ভালো। কিন্তু তাঁর পড়ানোর অবিশ্বাস্য সম্মোহন দিনকয়েকের মধ্যেই আমাকে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য করে তুলল। ঠিক করে ফেললাম *যদি কোনো বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে পড়তে হয়, তবে তা নিশ্চিতভাবে হবে অর্থনীতি*। কিন্তু হঠাৎ করেই একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল। প্রায় বিনা নোটিশে নারায়ণ সমাদ্দার আমাদের কলেজ ছেড়ে চলে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর জায়গায় এলেন নতুন অধ্যাপক। সবদিক থেকে নারায়ণ সমাদ্দারের বিপরীত তিনি। তাঁর পড়ানো যেমন কর্কশ তেমনি রসকশ বর্জিত আর একঘেয়ে। অর্থনীতি নিয়ে আমার দুচোখ ঘিরে যে অলীক স্বপ্নবিশ্ব তৈরি হয়েছিল, দেখতে দেখতে তা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। অর্থনীতি আমার জন্যে হয়ে উঠল ভয়াবহ একটা দুঃস্বপ্ন, একটা ক্লেদাক্ত ব্যাপার। কাজেই দিন-কয়েকের মধ্যে আমার সিদ্ধান্ত দাঁড়াল—*ভবিষ্যতে কোনো বিষয় যদি না পড়তে হয় তবে তা অবশ্যই হবে অর্থনীতি*। একজন সফল শিক্ষকের মনোরঞ্জনকারী কথার প্রভাব ছাত্রদের জীবনে এতটাই বেশি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৩

আমার শিক্ষকতার একেবারে প্রথমদিকের দু-চারটি হাতে-গোনা ক্লাসে কেবল করেছিলাম একটা কাজ যা পরবর্তীতে শিক্ষক-জীবনে আর কখনই আমি করিনি : সেটা হল ক্লাসে রোলকল। এটা না করে পার পাওয়া গিয়েছিল দুটো কারণে। প্রথম কারণটি আগে বলে নিই। আগেই বলেছি আমার ছাত্রভাগ্য ছিল প্রসন্ন। আমার ক্লাসের ছাত্ররা সর্বোচ্চ সংখ্যায় তো ক্লাসে থাকতই, অন্যান্য ক্লাসের ছাত্রেরাও এসে জড়ো হত অনেক সময়। শহরের নানান কলেজ থেকেও

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

যে-সব ছাত্রেরা এসে ভিড় করত তার সংখ্যাও একেবারে কম নয়। আজীবন ছোটখাটো একটা জনতাকেই প্রায় পড়িয়েছি আমি ক্লাসগুলোয়। ছাত্রদের এই উপচানো সংখ্যা ক্লাসে রোলকলের প্রয়োজনকে এমনিতেই অদরকারি করে দিয়েছিল। আমিও এই অবস্থার সুযোগ নিয়েছিলাম পুরোপুরি। খাতা ছাড়াই ক্লাসে যাওয়া প্রায় পাকা করে ফেলেছিলাম। এতে আমার শিক্ষক-জীবনকে একটা বিরাট অপচয়ের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল বলেই আমার ধারণা। এমনিতে প্রতিটি ক্লাসে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ক্লাসের প্রায় পনের মিনিটই শিক্ষককে ব্যয় করে ফেলতে হয় রোলকল করতে। ক্লাসে পড়ানোর সময় পান তিনি মাত্র তিরিশ মিনিট। শিক্ষক আরও ঘড়েল হলে ছাত্রদের সঙ্গে হাসি-মশকরা করে রোলকল করতে করতে এই সময়কে হেসে খেলে বিশ- পঁচিশ মিনিটে নিয়ে যেতে পারেন। এতে তাঁর পড়ানোর সময় হাতে থাকে মাত্র বিশ মিনিট। ফলে পড়ানোর অবাঞ্ছিত দায় থেকে একরকম বেঁচেই যান তিনি। তাঁর পড়ানোর আয়োজন শুরু হতে-না-হতেই ঘন্টা বেজে যায়। পরের দিনও ক্লাসে তিনি একই জায়গা থেকে শুরু করে ঐখানেই শেষ করেন। এভাবে সারাবছর এমনকি সারাজীবন মোটামুটি একই কথা প্রতিদিন বলে তিনি কাটিয়ে দিতে পারেন। নিজের চোখে কয়েকজন শিক্ষককে হুবহু এভাবে শিক্ষক-জীবন গুজরান করতে দেখে এ-কথা বলছি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

একজন শিক্ষককে যদি রোলকল করতেই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ক্লাসের পনের মিনিট অর্থাৎ ক্লাসের তিনভাগের একভাগ অপচয়ের ঝুড়িতে ফেলে দিতে হয়, তবে আসলে তো তাঁর সারাজীবনের মোট শিক্ষকতার তিনভাগের একভাগই তিনি পানিতে ফেলে দিলেন। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে এর খেসারত বিপুল। অনিচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদেরকে শুধুমাত্র ক্লাসে ধরে রাখার চেষ্টাতেই যদি প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের কার্যকর সময় থেকে এক-তৃতীয়াংশ সময় নষ্ট হয়ে যায় তবে ছাত্রদের ভাগে শেষপর্যন্ত পড়ল কতটুকু? আমার ধারণা ছাত্রদের ক্লাসে জোর করে ধরে বেঁধে রাখার হাতিয়ার হিসাবে প্রবর্তিত এই পদ্ধতির একটি কম ক্ষতিকর বিকল্প বের করা উচিত। বিশেষ করে আমাদের মতো গরিব দেশে যেখানে উপচে-ওঠা ছাত্রদের রোলকল করার বিরক্তিকর যান্ত্রিক ও একঘেয়ে কাজে শিক্ষকদেরকে তাঁদের সক্রিয় শিক্ষকতার একটি বড় অংশ অপচয় করে দিতে হয়।

রোলকল না করেও দীর্ঘ তিরিশ বছর শিক্ষকতা করে যেতে পেরেছিলাম আরও একটি কারণে। এর মূল একালের শিক্ষাব্যবস্থার অবক্ষয়ের ভেতর নিহিত। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্য হওয়ার জন্য ছাত্রের বার্ষিক উপস্থিতির হার বা পার্সেন্টেজের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ছাত্রের নিয়মিত ক্লাসের উপস্থিতি যদি

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

শতকরা পঁচাত্তর–এর বেশি হত তবেই কেবল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করত। যাদের গড়পড়তা উপস্থিতি শতকরা ষাট থেকে চুয়াত্তর হত, কম উপস্থিতির খেসারত হিসাবে তাঁদের কাছ থেকে ভালোরকম জরিমানা আদায় করা হত। যাদের গড়পড়তা উপস্থিতি শতকরা ষাটের কম হত তাদের সরাসরি ডিসকলেজিয়েট করা হত। তারা সেবারের মতো চূড়ান্ত পরীক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। প্রতিবছর প্রতিটা কলেজে যত ছাত্র ডিসকলেজিয়েট হত তার সংখ্যা অনেক। এই ব্যবস্থা ছিল বেশ কড়া। ষাটের দশকে সারা জাতির জীবনে যে–অবক্ষয়ের সূচনা হয় তার হাত ধরে শিক্ষাঙ্গনের অনেক ছোটখাটো ব্যাপারের মতো এই নন–কলেজিয়েট ডিসকলেজিয়েটের প্রথাটাও একটু একটু করে দুর্বল হয়ে আসতে শুরু করে।

স্বাধীনতার পর জাগ্রত ছাত্রসমাজের চাপের মুখে এই নন–কলেজিয়েট বা ডিসকলেজিয়েটের প্রথাটি প্রায় লুপ্তই হয়ে যায়। লুপ্ত হয়, তবু শিক্ষকদের রোলকল করা বন্ধ হয় না। কোনো কারণ বা প্রয়োজন নেই, কোনো কাজে আসবে না, তবু শিক্ষকেরা প্রতিটি ক্লাসে নিয়মিত রোলকল করে চলেন। শিক্ষাবর্ষের এক–তৃতীয়াংশ মূল্যবান সময় অর্থহীনভাবে অপচয় করেন। এর কারণ : ব্যাপারটির কার্যকারিতা চলে গেলেও একটা ছোট অর্থ হয়ত এখনও বেঁচে আছে। যদিও ক্লাসে আসা না–আসার ব্যাপারে ছাত্রদের ওপর শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানের কার্যত এখন আর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, কলেজিয়েট–ননকলেজিয়েট–ডিসকলেজিয়েট সবাই পাস, চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য সবাই উত্তীর্ণ, তবু রোলকলের ব্যাপারে একটা ভয় এখনো ছাত্রদের মনের ভেতর অতীত স্মৃতির পথ ধরে বেঁচে আছে। এদের অদ্ভুত ভয় : ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত না থাকলে রোলকল খাতার শূন্য ঘরগুলো পরীক্ষার আগে তাদের বিপদ ঘটাবে। বিপদটা কেমন, বা কোন্ ধরনের, জানা না–থাকলেও একটা অজানিত ভীতির আশঙ্কায় তরুণ ছাত্রের বুক অযথাই ঢিপঢিপ করতে থাকে। সুযোগসন্ধানী শিক্ষকেরা ছাত্রদের এই মনোবৈকল্যের সুযোগ নিতে ছাড়েন না। ঠাঁট–বাট বজায় রেখে এমন কড়াকড়ি করে রোলকল করেন যেন এই রোলকলের ওপরেই তাদের জীবন–মৃত্যু, ভূত–ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এতে ছাত্রদের উপস্থিতি বাড়ে। ক্লাসগুলো জমে থাকে। প্রতিটা ক্লাসের অনেকখানি সময়ের মূল্যে খেতে হয় ফলটা। কিন্তু এই সামান্য একটু ভয়ে ছাত্রেরা ঠিকঠাক ক্লাসে আসে, ভালোমানুষের মতো ক্লাসে বসে, পড়াশোনা করে। কাজেই অর্থহীন হয়ে যাবার পরও রোলকল রামের পাদুকার মতো আজও শিক্ষাঙ্গনে টিকে রয়েছে। যে–শিক্ষক ছাত্রদের ক্লাসে আকর্ষণ করতে যত ব্যর্থ তাঁর হাতে রোলকলের খাতা তত প্রাণঘাতী অস্ত্র হয়ে ছাত্রদের চোখের সামনে নড়াচড়া করে। প্রতিটা পিরিয়ড শুরু হওয়ার সাথে সাথে কলেজের প্রতিটা ক্লাসে রোলকল শুরু হয়ে যায়। ওয়ান,

www.amrajaraboipori.wordpress.com

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

Scan & Upload by Tusin ahmed

www.amrajaraboipori.wordpress.com

টু, থ্রি ... এক দুই তিন...ইয়েস স্যার, প্রেজেন্ট স্যার, প্লিজ, জি স্যার, উপস্থিত স্যার, আছি স্যার। প্রতিটা ক্লাসের শব্দ এক হয়ে সারাটা কলেজকে একটা যন্ত্রযুগের আদিম শব্দময়তায় মুখর করে তোলে।

যে কারণে আমি রোলকল না করেও পার পেয়ে গেছি তা উল্লেখ করেছি। আমার এই নিয়মবিরুদ্ধতাকে কলেজ কর্তৃপক্ষের এতদিন বরদাস্ত করার কথা ছিল না। অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যে হলেও করতে হত কাজটা। কিন্তু সত্তুরের শেষের দিক থেকে এইসব ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের আগ্রহ প্রায় পুরোপুরি কমে গিয়েছিল। কে ক্লাসে রোলকল করল না করল তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কেউ ছিলও না। তবু একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতাম ছাত্রদের মধ্যে। কর্তৃপক্ষ আমার রোলকল না-করা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, এ করারও কোনো অর্থ নেই। তবু রোলকল না-হওয়ায় তারা নিরাপত্তার অভাব অনুভব করছে। পরীক্ষার আগে উপস্থিতি হিসাবের সময় আমার ক্লাসগুলোর হিসাব কীভাবে হবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যাচ্ছে। বলতাম বাংলার অন্য ক্লাসগুলো ঠিকমতো কোরো। সেখানে যে গড় পারসেন্টজ পাবে আমি সেই পারসেন্টেজই তোমাদের দিয়ে দেব। কিন্তু এতেও হয়ে উঠত না। ভবী ভুলত না। তখন নানান বানানো কথার ছল-চাতুরী দিয়ে তাদের আশ্বস্ত করতে হত।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বছরের পয়লা ক্লাসেই ঘোষণা করে দিতে হত আমার রোলকল না-করার ব্যাপারটা। বলতে হত, ইচ্ছা হলে ভালো লাগলে ক্লাসে এসো, নইলে না। যদি ভালো লাগে, আত্মায় আনন্দ জাগে, ওমর খৈয়ামের মতো যদি মদ, রুটি, কবিতার বই আর প্রিয়তমা—এসব জিনিশ একসঙ্গে পাও এই ক্লাসঘরের ছাদের নিচে, তাহলেই এসো এখানে, নাহলে এখানে কী দরকার তোমার। অনিচ্ছুক হৃদয়কে ক্লাসে জোর করে বসিয়ে রেখে কী করব? ছাত্রদের নানান, ধর আপাতদৃষ্টে আমি দেখছি ক্লাসে বসে তুমি আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আমার প্রতিটা কথা শুনছ। আমার প্রতিটি বক্তব্যকে ঘন ঘন শিরশ্চালন করে সমর্থন করে চলেছ। অথচ, মনের ভেতর তুমি হয়ত এখন এই ক্লাসে নেই। এমনকি এই কলেজের কোনোখানেই নেই। কলেজ ছেড়ে তুমি হয়ত চলে গেছ অনেক দূরে। হয়ত তরুণী-অধ্যুষিত নিউমার্কেটের ফুটপাথে মধ্যাহ্ন-ভ্রমণ উপভোগ করছ। তোমার চোখের দৃষ্টি কারও দীর্ঘ কালো বেণিতে জড়িয়ে আছে। কিংবা ধর তোমার মন চলে গেছে হোস্টেলের সামনের বিশাল শিরীষ গাছটার নিচের ঘন স্নিগ্ধ ছায়ার জগতে। সেখানে বসে বসে বন্ধুবান্ধবের অনাবিল সান্নিধ্যের মধ্যে তোমার সময় কাটছে। সেখান থেকে ক্লাসের এই বিরক্তিকর ঘরটার ভেতরে তোমাকে জোর করে এনে বসিয়ে রেখে কী লাভ হবে আমার? জোর করে কাউকে কি কোনোদিন আনন্দ দেওয়া যায়? যদি বাইরেই ভালো লাগে বাইরে চলে যাও। জানালা আছে দরজা আছে সিঁড়ি আছে, যে যেদিক দিয়ে পারো

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ভাগো। সব চলে যাবার পর যদি দু–চারজন হঠাৎ থেকে যায় এখানে তারাই তো আমার ছাত্র। আমার রক্তের সুহৃদ। আমার শিক্ষক–জীবনের স্বপ্ন। তাদেরই তো আমার জন্মজন্মান্তরের অন্বেষণ। তবে হ্যাঁ, একটা অনুগ্রহ করতেই হবে আমাকে। ক্লাসে আস বা ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও, যাই কর, নিঃশব্দে কোরো–কোনো শব্দ না তুলে, কাউকে বিব্রত না করে। 'সলিটারি রিপার' কবিতার ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো করে বলতে হলে বলতে হবে 'স্টপ হিয়ার অর জেন্টলি পাস।' এটাতো সাহিত্যের ক্লাস। স্বপ্ন আর সৌন্দর্যের তাজমহল তৈরি করতে হয় আমাদের এখানে। ধর পড়াতে পড়াতে এক অলীক সৌন্দর্যময় অনুভূতির জগতে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। দ্বিধা–থরোথরো এক অপার্থিব পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে ক্লাসের ভেতর। ঠিক সেই সময় তুমি দরজার কাছে এসে দীর্ঘ ধারালো হাতটা পুরো বাড়িয়ে দিয়ে যদি বল 'আমি কি ভেতরে আসতে পারি স্যার'—তখন কি হবে? তোমার সেই লম্বা কিরিচের মতো হাত আমার বুকের এদিক দিয়ে ঢুকে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে—আর অনেক স্বপ্নে–আনন্দে গড়ে–তোলা সেই অবিশ্বাস্য মুহূর্তটার স্বপ্নজাল টুকরো টুকরো হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থকবে এই ক্লাসের মেঝেয়, তাতে কি কারও লাভ হবে?

ছাত্রমনের অহেতুক ভয়টাকে তাড়াতে তাদের সঙ্গে কী ছলনা আর মিথ্যাচারই না করে যেতে হয়েছে বছরের পর বছর!

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৪

আমার মতো আব্বাও ছেলেবেলা থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন যে শিক্ষক হিশেবেই তিনি জীবন কাটাবেন। কেবল শিক্ষক হবেন না, সারা কলেজের সব ছাত্রের শিক্ষক হবেন। ছাত্রজগৎ অধিকারে তাঁর মনোভাব ছিল সাম্রাজ্যবাদী। এতে অবাক হবার কিছু নেই। মানুষ—তা সে সাধু বা ঋষি, ভোগী বা ভণ্ড, রাজা বা ভিখারি যাই হোক না কেন—সবার মনের সবচেয়ে নিগূঢ় ও শক্তিমান বাসনা হচ্ছে ক্ষমতা। মানুষ ক্ষমতা চায়, অন্যের ওপর তার অধিকারকে নিরঙ্কুশ ও সর্বজয়ী দেখতে চায়। এই ক্ষমতা অনেক ধরনের হতে পারে। দারোগা বা রাষ্ট্র–শাসকের একটা ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা দৈহিক জগতের ওপর, বাস্তব জগতের ওপর। আবার শিক্ষক, কবি, গায়ক শিল্পী, মানবহিতৈষী—ক্ষমতার ব্যাপারে এঁদেরকে যত উদাসীনই মনে হোক–না কেন—এঁদেরও রয়েছে একইরকম ক্ষমতার পিপাসা। এই ক্ষমতা মানুষের হৃদয়ের ওপর। এঁরা হৃদয়–জগতের রাজা হতে চান। আব্বার মধ্যেও এই আকুতি ছিল। তিনি কলেজের সব বিভাগের সব ছাত্রের শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন। কলেজে যত ছাত্র আসবে–

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

যাবে সবার। সাহিত্যে উৎসাহ থাকলেও আব্বার শাণিত মেধা ছিল গণিত আর দর্শনে। স্নাতক পরীক্ষায় গণিতে ভালোও করেছিলেন খুব। কিন্তু ঐ একটি কারণে তিনি এম. এ. পড়েছিলেন ইংরেজিতে। ইংরেজি সারা কলেজের সবার পাঠ্য। ইংরেজির অধ্যাপক হলে কলেজের সবার শিক্ষক হওয়া যাবে, এই ছিল তাঁর ইংরেজি পড়ার কারণ। পরবর্তীতে বাংলাতেও এম.এ. করে বাংলার শিক্ষকও হয়েছিলেন এটাকে আরও জোরদার করার জন্যে।

সারাটা কলেজকে ছাত্র বানানোর জন্যে আমাকে আব্বার মতো সব ছেড়েছুড়ে ইংরেজির পেছনে ছুটতে হয় নি, বাংলা পড়ার ফলে এমনিতেই তা সম্ভব হয়েছিল। তাই আমার চ্যালেঞ্জ ছিল আর এক ধাপ বেশি : কেবল শিক্ষক হওয়া নয়, সব ছাত্রের হৃদয়ের কাছে পৌঁছানো, সব ছাত্রের হৃদয়কে আপ্লুত করা। এ-ব্যাপারে আমার জন্মগত প্রকৃতি আমাকে কিছুটা সাহায্য করেছিল যার কথা অগেই আমি বলেছি। কিন্তু এসব ছাড়াও একটা বাড়তি চেষ্টা আমি করে গেছি সারাজীবন। প্রতিদিন, প্রতিটা ক্লাসে পড়ানোর মুহূর্তে তা করেছি। ক্লাসের সেরা ছাত্রটাকে আমি কখনো পড়াতে চেষ্টা করিনি, আমি পড়াতে চেষ্টা করেছি ক্লাসের সবচেয়ে বোকা ছাত্রটাকে। সারাক্ষণ তাকেই আমি আমার কথাগুলো বোঝাবার চেষ্টা করেছি, তাকেই উজ্জীবিত উৎফুল্ল করার চেষ্টা করেছি, রসে আনন্দে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। প্রতিদিনের ক্লাসে সে-ছাত্রটিই ছিল আমার শিক্ষকতার চরম পরীক্ষা। তার কাছে পাস হলে সাধারণ ছাত্রদের কাছে পাস। আর সাধারণ ছাত্ররা বুঝলে ভালো ছাত্রেরা তো বুঝলই। মানে সবার কাছে পাস।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

শিক্ষাঙ্গনের অবক্ষয়

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

কীভাবে ষাটের দশক থেকে শুরু করে অবারিত সুলভ বৈদেশিক অর্থ আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্গনকে ক্রমবর্ধমানভাবে আবিল করে তুলেছে, কীভাবে সেই অনর্জিত অর্থ আর কোটি কোটি অপ্রত্যাশিত সুযোগের বিশাল যজ্ঞের ওপর দেশের মানুষ দিগ্বিদিকশূন্যভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিছু মানুষের জন্যে সমৃদ্ধি এবং সারা জাতির জন্য এক মূল্যবোধশূন্য কালকে রোজগার করেছে, কীভাবে সেই মুখহীন অবক্ষয় বিষাক্ত তরল পদার্থের মতো শিক্ষাঙ্গনের ভেতর চুঁয়ে চুঁয়ে ঢুকে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটাকেই বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে, সে-বিষয়ে এর আগে মোটামুটিভাবে আলোচনা করেছি। অর্থনৈতিক কারণ-ঘটিত এই মূল্যবোধহীনতা এই সময়কার শিক্ষাঙ্গনের অধঃপতনের একটি বড় কারণ হলেও এর আরও একটি কারণ ছিল : সেটা রাজনৈতিক। প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক শাসন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৫৮ সাল থেকে শুরু করে এদেশে দীর্ঘ প্রায় তিরিশ বছরের একটানা দলনমূলক সামরিক শাসন (নামে বা বেনামে) এ-ব্যাপারে একটা বড় ভূমিকা রেখেছিল। সামরিক শাসন তথা এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ক্রমে ক্রমে সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে ও একসময় এই সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গনের ভেতর ঘাঁটি গেড়ে বসে পুরো শিক্ষাঙ্গনকেই ধ্বংস করে দেয়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

১

'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ' কথাটা চিরকালই শিক্ষাঙ্গন-লালিত একটা প্রিয় প্রবাদ। সব দেশে সব যুগে শিক্ষাজীবনকে দেখা হয়েছে কর্মজীবনের প্রস্তুতির সময় হিশেবে, কর্মজীবনে অংশগ্রহণের পর্ব হিশেবে নয়। ছাত্ররা ভালোভাবে

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পড়াশোনা করবে, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে নিজেদের যোগ্যভাবে গড়ে তুলবে এটাই তো ছাত্রদের কাছে প্রত্যাশিত। কিছুদিন আগেও আমাদের রাষ্ট্রপতি সংযতভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ছাত্র-রাজনীতি ছাত্রদের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু এতসব অননুমোদন সত্ত্বেও পৃথিবীর অনেক দেশে, বিশেষ করে অনেক অনুন্নত দেশে এখনও ছাত্র-রাজনীতি বেশ শক্তপোক্তভাবেই টিকে আছে। কেবল উন্নয়নশীল দেশে কেন, অনেক সময় অনেক উন্নত ও অগ্রসর রাষ্ট্রও ছাত্র- রাজনীতির সশব্দ পদভারে সচকিত হয়ে ওঠে। এ-প্রসঙ্গে ষাটের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোয় যে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবাদের ঢেউ চলেছিল, তা স্মরণ করা যেতে পারে।

তবু এ-কথা ঠিক যে ছাত্রজীবনের মূল দায়িত্ব রাজনীতি নয়, পড়াশোনা। ঐ অপরিণত বয়স রাজনীতির উপযোগীও নয়। রাজনীতি হল ক্ষমতার নির্দয় লড়াই, জাতির পরিণত সদস্যদের জন্যেই তা প্রযোজ্য। ছাত্রবয়স জীবনটাকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার সময়। এইসময় জীবনকে অনুভূতিতে, জ্ঞানে, শক্তিতে এবং স্বপ্নে বিকশিত করতে পারলেই একজন মানুষ পরিণত জীবনে দায়িত্বশীল নাগরিক হিশেবে নিজের ও জাতির কল্যাণে সত্যিকারের বড় অবদান রাখতে পারে। তা না করে ছাত্রেরা যদি তাদের জীবনের এই কচি অনুভূতিশীল ও তারুণ্যময় দিনগুলোয় রাজনৈতিক দায়িত্বের স্টিমরোলার দিয়ে নিজেদের কোমল বিকাশকে কেবলই নিষ্পিষ্ট করতে থাকে, তবে তাদের তারুণ্যই-যে কেবল ক্লিষ্ট হয়ে যায় তাই নয়, জীবনের সূচনা-পর্বটিই সুস্থ ও সবলভাবে বিকশিত হতে পারে না। ফলে পরিণত জীবনেও জাতির অঙ্গনে বড় অবদান রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। শিশুশ্রম যে-কারণে বাঞ্ছনীয় নয়, ছাত্র-রাজনীতিও সেই কারণেই অবাঞ্ছিত।

তবু এদেশে ছাত্র-রাজনীতি আছে। কেবল আজ নয়, এই শতাব্দীর শুরু থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি অর্থপূর্ণভাবেই আছে। জাতীয় জীবনকে বারে বারে পাল্টে দিয়েছে এই ছাত্র-রাজনীতি, দেশের মানচিত্রকে পাল্টে দিয়েছে। জাতির বিভিন্ন মুক্তিসংগ্রামে তাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা দেশবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে ফিরে ফিরে প্রত্যক্ষ করেছে, তাদের অনন্য অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ অন্দোলনের পর থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে ছাত্রেরা বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও রাজনৈতিক তৎপরতায় বিপুলভাবে জড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগকে প্রায় নিশ্চিত করেছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশি আমলেও ছাত্রদের এই ভূমিকা একইরকম উজ্জ্বল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন, উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ, বা নব্বইয়ের স্বৈরাচার-বিরোধী অভ্যুত্থানের মতো যেসব ঘটনা গত পঞ্চাশ বছরে

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বারে বারে জাতিকে পাল্টে দিয়েছে, নতুন করে তুলেছে, এসবের ভেতর ছাত্রদের ভূমিকাই ছিল প্রধান।

এখন প্রশ্ন, ছাত্র-রাজনীতি যদি অনাকাঙ্ক্ষিতই হয় তবে তার এমন অর্থপূর্ণ ভূমিকা হল কী করে? ছাত্রদের বদলে ঐসব সময়ে আর কি কেউ ঐ ভূমিকা নিতে পারত? না কি সবসময় না হলেও কখনো কখনো কিছু কিছু জায়গায় ছাত্র-রাজনীতি দরকারি হয়ে দেখা দিতে পারে? যদি দরকারি হয় তবে কোথায়, কোন্ প্রেক্ষাপটে?

কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি সুস্থির হয়, যদি সে-দেশের রাজনীতিতে মোটামুটিভাবে ন্যায় বা সুশাসন বজায় থাকে তবে সেখানে ছাত্র-রাজনীতির দরকার হয় না। দেশের জনগণ রাজনৈতিক নেতাদের সাহায্য নিয়ে জাতির পরিচালনার কাজটুকু মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যখন তা হয় না, যখন কোনো অনৈতিক, অগণতান্ত্রিক বা গণবিরোধী শক্তি জবরদস্তিমূলকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করে ফেলে তখন সেই কর্তৃত্বপরায়ণ ও শ্বাসরুদ্ধকর অপশাসনকে হটিয়ে তার জায়গায় উচ্চতর ও আলোকিত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম পরিচালনা ও তাতে জয়লাভ করা জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এর জন্যে দরকার হয়ে পড়ে একটি বাড়তি শক্তির। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই বাড়তি শক্তির মূল চালানটা আসে ছাত্রসমাজের কাছ থেকে। জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে, অনভিপ্রেত হলেও ছাত্রসমাজ—জনগণের এই তরুণ, সজীব ও অনুভূতিশীল অংশটি—আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় ঐ সংগ্রামে অন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এগিয়ে যায়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

গড়পরতা নাগরিকদের তুলনায় ছাত্রদের পক্ষে এই ধরনের অবিবেকি শক্তির সঙ্গে লড়াই করার সুবিধা অনেক বেশি। সাধারণ নাগরিকদের চেয়ে এরা তুলনামূলকভাবে স্বাধীন এবং সংসারের দায়দায়িত্ব ও ঝক্কি-ঝামেলা মুক্ত। ফলে ইচ্ছা-সিদ্ধান্তে যে-কোনো স্বপ্নের জন্যে প্রাণ বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার তুলনামূলক বেশি সুবিধা এদের রয়েছে। তাছাড়া অনুভূতিশীল তরুণ বয়সের অনির্বাণ আদর্শবাদে তাদের হৃদয় প্রজ্জ্বলিত। ফলে, শারীরিক বিলুপ্তির ঝুঁকি নিয়ে তারা এমন সহিংস আক্রমণের পথে এগিয়ে যেতে পারে যা ঐ সংগ্রামের জন্যে খুবই ফলপ্রসূ এবং সমাজের প্রবীণতর নাগরিকদের পক্ষে একরকম অসম্ভব। ঔপনিবেশিক আমলে অবৈধ ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে দেশের এই তারুণ্যশক্তি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংগ্রাম করেছে এবং এই উপমহাদেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করেছে। আশা করা গিয়েছিল স্বাধীনতা-উত্তর মুক্ত মাতৃভূমিতে, স্বজাতীয় শাসনের অম্লান ও মানবিক পরিবেশের ভেতর ছাত্রেরা এই দুঃখ এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু ব্রিটিশদের বিদায় নেবার

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পরও রাজনীতির বলি হবার দায় থেকে ছাত্রেরা রেহাই পেল না।

১৯৪৭ সালে ইংরেজরা চলে গেল, দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু পাকিস্তানের রাজনীতি হয়ে রইল ব্রিটিশ আমলের মতোই অগণতান্ত্রিক আর দমনমূলক। ব্রিটিশ আমলে ন্যায়নীতি আর আইনের অন্তত একধরনের চোখ-দেখানো স্বচ্ছতা ছিল, তাও সেখানে আর রইল না। ইসলামকে বিপদমুক্ত করার নামে সবরকম বিরোধিতাকে স্টিমরোলারে পিষে প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রকারীরা জনগণের বুকের ওপর চেপে বসে রইল। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা হয়ে উঠল আরও শ্বাসরুদ্ধকর ও অসহায়।

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের অব্যাহত শাসন এবং লুণ্ঠনই যে চলতে লাগল তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি কর্তৃত্বকে নিরঙ্কুশ করার জন্যে জবরদস্তিমূলকভাবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হল আমাদের ওপর। অবস্থাটা দিনের পর দিন এমন হয়ে উঠতে লাগল যে জনগণ বা রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই পাশবিক শক্তির মোকাবেলা করা অসম্ভব হয়ে উঠল।

এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ আমলের ছাত্র-রাজনীতির ধারা, প্রায় একইরকম আবহাওয়া পেয়ে, আবার সজীব হয়ে উঠল এবং বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের রক্তদানের ভেতর দিয়ে তা সারা জাতিকে বাঙালিত্বের প্রেরণায় প্রদীপ্ত করে তুলতে লাগল।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

১৯৫৮ আলে আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। এরপর একটানা প্রায় তেত্রিশ বছর (মাঝখানের বাহাত্তুর থেকে পঁচাত্তুরের আওয়ামী লীগের শাসনামল বাদ দিলে) এদেশে নামে বা বেনামে সামরিক শাসন চলেছে। এই অনৈতিক এবং কর্তৃত্বপরায়ণ শক্তির বর্বর বুটের নিচে সে-সময়ে জনগণ এবং তাদের রাজনৈতিক আকুতি পুরোপুরি নিষ্পিষ্ট হয়ে গেছে। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে। জাতির সেই দুঃখ আর অসহায়তার মুহূর্তে একমাত্র ছাত্ররা ছাড়া এই পশুশক্তির সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা এই দেশে আর কারো ছিল না। আমাদের ছাত্রসমাজ সেদিন এই লড়াইয়ের দায়িত্ব বেশ শক্তহাতেই তুলে নিয়েছিল। এই পর্বের অধিকাংশ সময় জুড়ে ছাত্ররাই ছিল এদেশের জনগণের সংগ্রাম ও মুক্তির প্রতীক, তাদের আকাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র, মানবতা ও প্রগতির স্বপ্নের একমাত্র ধারক। বাষট্টি সালে গণবিরোধী সরকারের স্বৈরাচারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রাণ দিয়েছে তারা, উনসত্তুরের গণ-আন্দোলনের সময় দেশব্যাপী উত্তাল গণজাগরণ সংগঠিত করেছে তারা, একাত্তুরের যুদ্ধে উদ্দীপ্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাতির স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে তারা, নব্বইয়ের স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে সামগ্রিক নেতৃত্ব দিয়ে অসাধ্য সাধন করেছে তারা।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

২

ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার লক্ষ্যে সামরিক জান্তা ষাটের দশকে শিক্ষাঙ্গনকেন্দ্রিক ছাত্র সংগঠনগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিকে দমিয়ে রাখার পরিকল্পনা নিয়ে তাদের সমর্থিত ছাত্রদের একটি অংশকে অস্ত্রসজ্জিত করে তোলে। তৈরি করে একটি ভাড়াটে সন্ত্রাসী ছাত্রবাহিনী। এই নিরুপায় অবস্থায় আত্মরক্ষার্থে ছাত্র-সংগঠনগুলোকে সশস্ত্র হওয়ার কথা ভাবতে হয়। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে সশস্ত্র ক্যাডারের এভাবেই পদপাত। স্বাধীনতা-যুদ্ধের পরবর্তীতে, সত্তুরের দশকে, অবাধ অবৈধ অস্ত্রের অপর্যাপ্ত প্রাপ্তির যুগে এই অস্ত্রসজ্জা সবচেয়ে ঘনঘোর রূপ নেয় এবং অস্ত্রের বিরতিহীন ঝনৎকারে শিক্ষাঙ্গন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠতে থাকে। ঐ দশকের শেষদিকে শুরু হয় সরাসরি রাষ্ট্রীয় সূত্র থেকে অস্ত্র সরবরাহের যুগ। কোনো কোনো ছাত্র-সংগঠন সরাসরি সরকারি সূত্র থেকে সরবরাহ পেয়ে যেমন বিপজ্জনক ও মারাত্মক হয়ে ওঠে, তেমনি ভারসাম্য রক্ষার নিরুপায় তাগিদে অন্যেরাও দেশি-বিদেশি গোপন-প্রকাশ্য সব পথে অস্ত্রসংগ্রহে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৮২ সালে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর সময় সেনাপ্রধান হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ (নিজে সম্পূর্ণ অনৈতিক মানুষ হলেও) শিক্ষাঙ্গনের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে যখন শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গন বলে অভিহিত করেছিলেন, তখন হয়ত খুব একটা ভুল বলেন নি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অস্ত্রের নিজেরই একটা উদ্ধত ও বেপরোয়া দিক আছে। কারণে-অকারণে তা ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে অহেতুক উত্তেজিত হয়ে থাকে। ছাত্র-সম্প্রদায়ের হাতে অস্ত্রের মজুদ বাড়ল, অথচ সামরিক সরকারকে উচ্ছেদ করে রাজনৈতিক ন্যায়প্রতিষ্ঠায় তার কোনো ভবিষ্যতই নেই। এই নিষ্ফল নৈরাশ্যকর পরিস্থিতিতে, মূল লক্ষ্যবস্তু হারিয়ে, ছাত্র-সংগঠনগুলো নিজেরা নিজেদের সঙ্গে হিংস্র, নরকীয় হানাহানিতে জড়িয়ে পড়তে শুরু করল। হতাশ অস্ত্রশক্তি আত্মঘাতী হয়ে উঠে, নিজেই ব্যবহৃত হতে শুরু হল নিজের বিরুদ্ধে। অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠলে, নৈতিক ভিত্তি হারিয়ে, তা একসময় ব্যবহৃত হতে শুরু করল ব্যক্তিগত স্বার্থে ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে—সন্ত্রাস, মাস্তানি, ছিনতাই ও চাঁদাবাজিতে। সামান্য দলীয় কোন্দল, অর্থকরী স্বার্থ, তুচ্ছ ব্যক্তিগত কথাকাটাকাটি, ছিনতাই আর চাঁদা আদায়ে যখন-তখন যেখানে-সেখানে ব্যবহৃত হয়ে চলল অস্ত্র। অস্ত্রের অহোরাত্র চলাফেরায় উৎকণ্ঠিত, সন্ত্রস্ত ও নিরাপত্তাহীন হয়ে রইল সারাদেশ ও প্রতিটি মানুষ। এইভাবে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে দেশের রাজনীতি থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, সমাজ-জীবন সবকিছুকে ত্রস্ত ও আতঙ্কিত করে তুলতে লাগল।

আমাদের দেশে এই যুগটা মোটামুটিভাবে সন্ত্রাসের যুগ। এর বিস্তার ষাটের

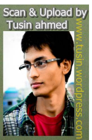

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

দশকের মাঝামাঝি থেকে নব্বই দশকের শেষ পর্যন্ত। নব্বই-এর দশকের শেষকে এর শেষসীমা হিসেবে চিহ্নিত করার কারণ এই যে, এই সময় আমরা গণতন্ত্রের যুগে এসে পা রেখেছি। আমার ধারণা গণতন্ত্র আর সন্ত্রাস একসঙ্গে থাকতে পারে না। সন্ত্রাস সামরিক-যুগের আলামত এবং ঐ যুগের সঙ্গে তার বিদায়ও নেবার কথা। গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায়, বিশেষ করে আমাদের বিশেষ পদ্ধতির গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় সন্ত্রাসের পক্ষে খুব একটা দাপটের সাথে বেশিদিন টিকে থাকার কথা নয়। দুটো কারণে আমার এমনটা মনে হয় :

১. গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত হয়ে-আসা জনপ্রিয় সরকার। কাজেই সামরিক অভ্যুত্থানের পথে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া একটি অবৈধ সরকারকে জনগণের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্যে যে-ধরনের পাশবিক শক্তি প্রয়োগের ওপর নির্ভর করতে হয় ও যে-সন্ত্রাসের সংস্কৃতির প্রচলন করতে হয় সে দায় গণতান্ত্রিক সরকারের নেই। তাছাড়া গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব কেনই বা অস্ত্রধারীকে গুরুত্ব দিতে যাবে? নিজে নিরস্ত্র হয়ে সে যদি অস্ত্রধারীকে গুরুত্ব দেয়, তবে তার জায়গায় অস্ত্রধারীই তো ক্ষমতায় এসে যাবে। অস্ত্রের সংস্কৃতিকে সে যত কমিয়ে আনতে পারবে তার ক্ষমতা তত নিরঙ্কুশ, তত নিশ্চিন্ত হবে। আজ এ-ব্যাপারে যে দেরিটুকু হচ্ছে সে কেবল অভ্যাস-ভোলার দেরি। এত দীর্ঘদিনের সংস্কারকে কে আর মুছে দিতে পারে এক দীর্ঘ সময় ছাড়া। আমার ধারণা সময়েই তা সেরে যাবে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

২. তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথা চালু হবার পর থেকে আমাদের জনগণের জন্যে একটা আনন্দজনক ব্যাপার ঘটে গেছে। এখন থেকে জাতির জীবনের পাঁচবছর সরকারের, আর (নির্বাচনের সময়কার) তিনমাস জনগণের—নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের। এক কথায় বলা যায়, জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার। এই সময়টা স্থূল রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সবরকম হম্বিতম্বির বাইরে। জনগণই এই সময়টার রাজা। পাঁচ বছর পর এটা এক নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন সময় তাদের জন্যে। গভীর নীল আকাশে পাতিবকের মতো ভেসে বেড়ানোর সময়। কাকে তারা ক্ষমতায় পাঠাতে চায়, উদ্বেগহীন শান্ত পরিবেশে তা নির্ধারণ ও কার্যকর করার সময়। রাজনৈতিক দলগুলো এই সময় তাদের পায়ের কাছে নতজানু । কাজেই জনগণকে কষ্টেও রাখব আবার চোখ রাঙিয়ে ক্ষমতায়ও যাব, আজকের বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন সম্ভাবনা কমে গেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যে এই আতঙ্ক ভবিষ্যৎ সরকারগুলোকে সন্ত্রাস দমনে সক্রিয় রাখবে বলেই আমার ধারণা।

এই সন্ত্রাসের যুগের পুরোটাই আমি ছিলাম ঢাকা কলেজে। অস্ত্র, সন্ত্রাস, বোমাবাজি, চাঁদাবাজি, মাস্তানি—সবকিছুই দেশের এই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই আমি দেখেছি। কোন্দলে, দ্বন্দ্বে, সংঘর্ষে, হানাহানিতে কলেজের পরিবেশ ধীরে ধীরে অবক্ষয়ী হয়ে গেছে । সবকিছুই ঘটেছে আমাদের চোখের

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us - www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সামনে, আমরা কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি, কিছুই করতে পারি নি।

সামরিক শাসনের তিরিশটা বছর দেশবাসীর জন্যে এমনিতেও ছিল বেদনাদায়ক। দেশ জনগণের, অথচ তারা দেশের মালিক নয়, দেশের ভাগ্যের ব্যাপারে তাদের কিছু বলার অধিকার নেই, সব ভালোমন্দের সোল-এজেন্সি কেবল রাতের অন্ধকারে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে অবৈধভাবে ক্ষমতা হাতিয়ে নেওয়া একটা অকর্ষিত, মূঢ়, ক্ষমতাগর্বী সামরিক জান্তার—আমাদের কী হবে, কী হতে হবে তা নির্ধারিত হবে এদেরই সদয় অনুকম্পায় আর অনুমোদনে, এ-ধরনের অনুভূতি এক উদ্ধারহীন অসহায়তার ভেতর সবার মনকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে। এই আত্মগ্লানি আর হতাশা যে কী মর্মান্তিক তা বলে বোঝানো কঠিন। নিজের দেশে থেকেও নিজেকে প্রবাসী মনে হয়েছে। যেন আমি এদেশের কেউ-না, কিছু-না। কোনোকিছুর ওপর আমার অধিকার নেই। যেন অনেকদিন আগে এদেশের কোনো বর্ধিষ্ণু নাগরিকের কুৎসিত প্রেতাত্মা আমি। একটা ক্রীতদাস, একটা সম্মানজনক চাকর। কুকুরের মতো ঘৃণ্য, আবিল আর হীন। নিজের শরীরের দুর্গন্ধে নিজেকে ছিঁড়ে, চিরে কুটি কুটি করে ফেলতে ইচ্ছা হত।

প্রগতিশীল ছাত্র-সংগঠনগুলোর জন্যেও ব্যাপারটা ছিল বিরাট হতাশার। সামরিক বাহিনীর এমন বিরাট আর সংগঠিত একটা শক্তির বিরুদ্ধে কিছু করে ওঠাও সম্ভব নয়, আবার এইসব অন্যায় আর নিষ্পেষণ মেনে নেওয়াও কঠিন। নিরুপায় হয়ে ছাত্র-সংগঠনগুলো তাদের সংগ্রাম আর অস্তিত্ব জানান দেবার এবং টিকিয়ে রাখার এক নিরাপদতর পথ বের করল। শিক্ষাঙ্গনের ছোটখাটো বিষয়গুলোকে তারা তাদের আক্রমণের বিষয় করে তুলল। ঢাকা কলেজে তাদের এমনি এক আক্রমণের লক্ষবস্তু হল কলেজের টেস্ট-পরীক্ষা। ঢাকা কলেজের শিক্ষা-পরিবেশ দস্তুরমতো ঠাঁট-পাটওয়ালা, টেস্ট-পরীক্ষা, পার্সেন্টেজ সব কিছুতেই কড়াকড়ি। এটাকে ভেঙে দেওয়া গেলে বলে বেড়াতে পারার মতো একটা সাফল্য আসে। কাজেই লেগে যাও টেস্ট-পরীক্ষার বিরুদ্ধে। পরীক্ষার প্রথম দিন কলেজে গিয়েই দেখতাম এখানে-ওখানে ছাত্রদের ছোটবড় জটলা। সবার চোখ-চেহারা সকৌতুক, মুখে মুখে পরীক্ষা দেওয়ার যে-পরিমাণ আগ্রহ, হলে গিয়ে পরীক্ষায় বসতে ঠিক একই পরিমাণ উৎসাহের অভাব। কী ব্যাপার? অমুক অমুক ছাত্র-সংগঠনের ছাত্রেরা তাদের শাসিয়ে গেছে পরীক্ষা দিতে বসলে পরীক্ষাহলের মধ্যে বোমা ফেলা হবে। এই অবস্থায় কী করি বলুন? তাদের কথায় এইসব অরাজকতার ব্যাপারে অসীম উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে, অথচ গলার আওয়াজ থেকে মনে হয় পরীক্ষা না হলেই যেন সবাই বেঁচে যায়। রহস্যময় আর সন্দেহজনক তাদের কথাবার্তা। সব বোধগম্যতার বাইরে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এরপর শুরু হয় শিক্ষকদের কাজ। নরমে-গরমে, ধমক দিয়ে, অনুরোধ করে দলে দলে তাদের ক্লাসে নিয়ে বসাবার বিশ্রী এক দায়িত্ব। এ-কাজটাও অত নির্বিঘ্ন নয়। বাইরে থেকে সন্ত্রাসী ঢুকে পড়েছে কলেজের ভেতর, ছাত্রদের ভেতর ভেতর গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে বোমাবাজি শুরু করতে পারে। করেছেও অনেকবার। একবার তো আমার একহাত সামনেই সামনাসামনি বোমা ফেলেছিল, স্প্রিন্টারগুলো আশেপাশের দেয়ালে লেগে দেয়াল ছিদ্র করে দিয়েছিল, কোনোমতে বেঁচে গিয়েছিলাম। অস্ত্রধারীরা সবাই বহিরাগত, অপরিচিত। অনেকেই পেশাদার সন্ত্রাসী। কাজেই তাদের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ারও উপায় নেই। কোনোবার হয়ত সারা কলেজের সবখানে একসঙ্গে বোমাবাজি করে প্রথমেই ভণ্ডুল করে দেওয়া হয়েছে পরীক্ষা। কোনোবার হয়ত হয়েছে একটু অন্যরকম। ছাত্রেরা বসেছে পরীক্ষা দিতে, ঠিকঠাক শান্তভাবেই চলছে সবকিছু । হঠাৎ কলেজের এককোণ থেকে ভেসে এল বোমা বিস্ফোরণের গগনবিদারী শব্দ। ঠিক সাথে সাথেই আরও কয়েকটা বিস্ফোরণের শব্দ, একের পর এক। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ছাত্রেরা পিঁপড়ের মতো পিলপিল করতে করতে বেরিয়ে আসছে ক্লাস থেকে। ব্যস, শেষ হয়ে গেল কলেজের টেস্ট-পরীক্ষা। এর পর কে আর বসাতে পারবে ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে? কে নিতে যাবে তাদের জীবনের দায়িত্ব?

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কলেজের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে আমরা প্রতিটা শিক্ষক সুষ্ঠুভাবে টেস্ট-পরীক্ষা নেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করতাম। এটা আমরা করতাম কিছুটা ঢাকা কলেজের শিক্ষা-ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার তাগিদে, কিছুটা দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভেবে। দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার স্বার্থে এজন্যে যে, দেশের শ্রেষ্ঠ কলেজ ঢাকা কলেজে পরীক্ষা ভণ্ডুল করার খবরটা ভালোভাবে ছড়িয়ে দিতে পারলে ঢাকার অন্য কলেজগুলোর পরীক্ষা এমনিতেই বানচাল হয়ে যাবে। আর ঢাকায় পরীক্ষা না হলে সারাদেশের পরীক্ষার খেল তো এমনিতেই খতম। অর্থাৎ ঢাকা কলেজে পরীক্ষা না-হওয়া মানে সারাদেশে পরীক্ষা না-হওয়া, সারাদেশের পরীক্ষাব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে পারা। ঢাকা কলেজের পরীক্ষা ভণ্ডুল করাটা হয়ে উঠেছিল ছাত্র-সংগঠনগুলোর অন্যতম বড় লক্ষ্যবস্তু। আদাজল খেয়েই তারা এ-কাজে নামত। যেভাবেই হোক পরীক্ষা বানচাল তাদের করতেই হবে। তাদের এই প্রাণপণ চেষ্টার সঙ্গে আমরা কোনোদিন এঁটে উঠতে পারি নি। হয়ত পারা যায়ও না কখনো। যে-ইঁদুরের পেছনে বেড়াল ছুটছে কেবল তার নৈশভোজ সংগ্রহের আশায়, আর ইঁদুর দৌড়োচ্ছে প্রাণের তাগিদে, সেই বেড়াল কী করে সেই ইঁদুরকে ধরবে? আমরাও একসময় রণে ভঙ্গ দিয়ে ক্লান্ত শরীরে ফিরে আসতাম স্টাফরুমে। সেখানে বসে বসে এইসব চেষ্টার অর্থহীনতা নিয়ে আলোচনা করে বাসায় ফিরে

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

যেতাম। আমার শিক্ষকতা-জীবনের শেষ পনের বছর, অন্তত ১৯৭৬–৭৭ থেকে ১৯৯১–৯২ পর্যন্ত চলেছিল একই ব্যাপার।

পরীক্ষা নিয়ে ছোটাছুটি করতে গিয়ে একটা মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার এই সময়। আমার ধারণা ছিল আমাদের ছাত্রেরা এই দেশের সেরা কলেজের সেরা ছাত্র, নিশ্চয়ই এরা পরীক্ষা দিতে খুবই উদগ্রীব, কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর মাস্তানির উৎপাতে পেরে ওঠে না। কিন্তু এই সময় তাদের হাবভাব থেকেই আমার কাছে প্রথম স্পষ্ট হয় যে পৃথিবীর নিকৃষ্ট কলেজের নিকৃষ্টতম ছাত্র থেকে শুরু করে শ্রেষ্ঠ কলেজের শ্রেষ্ঠতম ছাত্রটির কেউই আসলে পরীক্ষা দিতে চায় না। সবাই পরীক্ষাকে ভয় পায়, পরীক্ষা থেকে প্রাণপণে পালিয়ে থাকতে চায়। খারাপ ছাত্র পরীক্ষা থেকে পালাতে চায় ফেলের ভয়ে, শ্রেষ্ঠ ছাত্র সেকেন্ড হওয়ার আতঙ্কে। সব দেশে সব সমাজে পরীক্ষা ছাত্রকে জোর করেই দেওয়ানো হয়। আমাদের আর অভিভাবকদের গুঁতোগুতিতে তারা বিপুল হতাশা আর অনিচ্ছা নিয়ে পরীক্ষাহলে গিয়ে বসে ঠিকই, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে একটা ঈপ্সিত বিস্ফোরণের শব্দের জন্য কান খাড়া করে বসে থাকে এবং সামান্যতম অজুহাত পেলে তাকে অজুহাত হিসেবে তুলে ধরে সেটাকে পরীক্ষাহল ত্যাগের নিশ্চিত কারণ হিসেবে ব্যবহার করে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৩

স্বাধীনতার পর দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের হাতে ব্যাপক হারে অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ায় সারা দেশের সামাজিক জীবন একটা বড় ধরনের অরাজকতার ভেতরে পড়ে যায়। অনেক সামাজিক সম্পর্কই পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে যায়। বাড়ির যে-ছেলেটা এতকাল বাপ- মায়ের সামনে মাথা নিচু করে বাড়িতে ঢুকত-বেরোত, হঠাৎ একদিন দেখা গেল সে বাপ-মায়ের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে, বেয়াদবি করতে শুরু করছে। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কেউ তার এই ঔদ্ধত্যের বাইরে নয়। অস্ত্রের শক্তি এখন তার হাতে। ঘুণেধরা, জরাজীর্ণ সামাজিক শক্তির চেয়ে তার শক্তি কোথায় কম? তথাকথিত ছেঁদো-কথাওয়ালা, মজ্জাহীন সমাজপতিদের দরকার হলে সে একহাত দেখিয়েও দিতে পারে। এদেশের যুগযুগের সামাজিক সদাচার আর সুশীল মূল্যবোধগুলোকে উপহাস করে একসময় অজ্ঞাত উৎস থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে এসে সে বাপ-মায়ের হাতে তুলে দিতে শুরু করে একসময়, সংসারে সচ্ছলতা বাড়ায়, স্বপ্ন জাগায়। তার মাথা সংসারের অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে একসময় ওপরে উঠে যায়, বাপ-মাকেও ছাড়িয়ে সে হয়ে ওঠে সংসারের মূল ব্যক্তি, কর্তা। তাকে স্বস্তিতে রাখা

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

নিয়েই সবার প্রতিমুহূর্তের চিন্তা, তার আনন্দেই সবার স্বস্তি। মা তাঁর অন্য ছেলেমেয়েদের সামনে দিয়ে বাড়ির ভালো ভালো খাবারগুলো তাকে খাওয়ান, ভাইবোনেরা তাকে সমীহ করে, তাকে নিয়ে গর্বিত হয়। কেন হবে না? সেই যুগের সেই তো সবচেয়ে আধুনিক, সবচেয়ে সময়-সমর্থিত মানুষ, 'সারভাইভ্যাল অফ দি ফিটেস্ট'-এর ফিটেস্ট। আগামী দিনের বাংলাদেশ তো হবে তার সন্তান-সন্ততিদেরই পৈতৃক সম্পত্তি। যে বাপ-মায়ের সামনে দিয়ে একদিন সে মাথা নিচু করে বাড়ি থেকে বেরোত-ঢুকত, আজ তার সামনেই তার সেই বাবা-মা কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সত্তুর দশকের এমনি এক অবিশ্বাসী সন্তান আর তার সত্যব্রতী ও অনমনীয় বাবাকে নিয়েই ঐসময় আবদুল্লাহ আল মামুনের বহুল আলোচিত নাটক 'সুবচন নির্বাসনে' লেখা।

৪

অস্ত্র এসে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ককে যেভাবে ওলটপালট করে দিয়েছিল, শিক্ষাঙ্গনে তা একইভাবে ওলটপালট করে দিয়েছিল ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক। আমাদের ছেলেবেলায় শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকের কর্তৃত্ব ছিল নিরঙ্কুশ। শিক্ষক বা বিদ্যায়তন কর্তৃপক্ষ কেবল-যে প্রশ্নাতীত ছিলেন তাই নয়, ছিলেন সর্বতোভাবে মান্য। গুরুগৃহের আদর্শই যেন খানিকটা বজায় ছিল তখন। সেই কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রথম, অকর্ষিত ও স্থূল ধরনের একটা বিক্ষোভ ঘটে পঞ্চাশের দশকে। কী করে তা ঘটল তা আগে দু-এক কথায় বলে নিই।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলন, দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কারণে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদের প্রতি যে-তীব্র বিদ্বেষ দেখা দেয় তার জের হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু বিতাড়নের একটা অঘোষিত ও বেদনাদায়ক পর্ব চলে। রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত—সব ভাবেই চলে এই অঘোষিত ও নিষ্ঠুর ব্যাপারটি। ভারত-বিভাগের আগে এদেশের মুসলমানেরা লড়াই করেছিল ভারতের মুসলমানদের জন্যে একটি আলাদা আবাসভূমির লক্ষ্যে। একটি আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন ছিল তাদের। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় তাদের অনেকের মধ্যেই এমন একটা প্রচ্ছন্ন ভাবনা ছিল যে তাদের ঈপ্সিত সেই মুসলিম রাষ্ট্রটি, যা কেবলমাত্র মুসলিম অধ্যুষিত, প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এবার পাকিস্তানের হিন্দুদের একইভাবে উচিত দলবেঁধে ভারত গিয়ে ভারতকে পাকিস্তানের মতোই একটা বিশুদ্ধ হিন্দুরাষ্ট্র করে তোলা। কিন্তু এদেশে যে আবার হিন্দু বা সংখ্যালঘু থাকতে পারে, তাদের সঙ্গে বসবাস নিয়ে সমস্যা হতে পারে এটা প্রায় কারো চিন্তাতেই ছিল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মোহাম্মদ আলী

Scan & Upload by Tusin ahmed

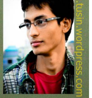

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

জিন্নাহ্ পাকিস্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিলে তারা যেন খানিকটা অবাকই হয়ে যায়। যাহোক তারা তাদের ওই স্বপ্নের ব্যাপারে মোটামুটি অবিচল থাকে এবং জাতির জনক বেঁচে থাকতেই তাঁকে সসম্ভ্রমে এড়িয়ে পাকিস্তানকে একটি বিশুদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু না-থাকায় ওখানকার জন্যে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায় কিন্তু সমস্যা হয় পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা অনেক, ফলে কাজটা অত সহজ নয়। দেশের গোটা হিন্দু সম্প্রদায়কে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ভারতে খেদিয়ে দিতে পারলেই হয়ত এর একটা সমাধান পাওয়া যেত, কিন্তু এর ঝুঁকি অনেক। ভারতও যদি তার বিরাট মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একইভাবে পাকিস্তানের ভেতর ঢুকিয়ে দেয় তখন তাদের জায়গা হয়ে কোথায়? কাজেই মুখে তারা এমন একটা ভাব ফুটিয়ে বসে রইল যে অত কঠোর পদক্ষেপ তারা নিচ্ছে না বটে (যেহেতু হিন্দুরা তাদের পবিত্র আমানত) তবে যার-যার স্বদেশে তার-তার হওয়াই তো ভালো। ঐটাই তো সম্মানজনক, সঙ্গত, প্রত্যাশিত। তাড়াতাড়ি এটা বুঝতে পারলেই তো তাড়াতাড়ি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। হিন্দুরাও যে মুসলমানদের মতোই এদেশের নাগরিক—স্বাধীন নিঃশঙ্ক ও মর্যাদাবান নাগরিক—এই আশ্বাস ও নিরাপত্তাবোধ তাদের ভেতরে জাগিয়ে তোলার কোনো চেষ্টা তারা করে নি। বরং উল্টোটা করেছে। নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অবস্থানকে নিরঙ্কুশ করার জন্যে দেশের আলোকিত হিন্দুদের 'রাষ্ট্রবিরোধী', 'কমিউনিস্ট', 'ভারতের চর' হিশেবে অভিযুক্ত করে দমনমূলক নিগ্রহের মাধ্যমে দেশ থেকে উৎখাতের চেষ্টা করেছে। এই সময়কার রাজশাহী জেলের খাপরা ওয়ার্ডে কমিউনিস্ট রাজবন্দিদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা এই দমনমূলক অমানুষিকতার অন্যতম উদাহরণ। সরকারের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সামাজিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে হিন্দু বিতাড়ন, হিন্দু উচ্ছেদ এবং হিন্দু সম্পত্তি হস্তগত করার যে-ধারা সে-সময় শুরু হয় তা হিন্দুদের মধ্যে ভীতি ও আশঙ্কার পাশাপাশি এমন এক গাঢ় নিরাপত্তাহীনতার বোধ জাগিয়ে তোলে যে, হিন্দুরা এদেশে তাদের ভবিষ্যৎকে পুরোপুরি অনিশ্চিত ও অন্ধকার বলে অনুভব করে। এর ফলেই শুরু হয় সাতচল্লিশ-উত্তর যুগে হিন্দুদের সেই বহুকথিত দেশত্যাগ।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পঞ্চাশের দশকে 'রাষ্ট্রবিরোধী', 'কমিউনিস্ট', 'ভারতের চর' এমনি নানান অজুহাতে দেশের অনেক শিক্ষায়তন থেকে অনেক সুযোগ্য এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে অত্যন্ত রূঢ় ও অশ্রদ্ধাজনকভাবে বিদায় করা হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সশ্রদ্ধ কর্তৃত্বের ওপর সেটাই আমাদের সমাজের প্রথম আঘাত। তবে এটা বছর-দশেকের বেশি চলে নি। কিছুদিনের মধ্যেই এই পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং সত্তুরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তা একই অবস্থায় বয়ে চলে।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৫

সত্তুর দশকে শিক্ষাঙ্গন অরাজক হয়ে ওঠে মোটামুটি দুটি কারণে। একটির কথা আগেই কিছুটা বলেছি। ষাট–সত্তুরের দশকে, আমাদের বৈষয়িক উন্নতি এবং সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার স্বপ্ন ও প্রেরণার হাত ধরে, সারাদেশের সবখানে ছোট–বড় অসংখ্য স্কুল–কলেজ ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠতে শুরু করে এবং দেখতে দেখতে প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন ছাত্রে–শিক্ষকে উপচে পড়তে থাকে। শিক্ষার এই প্রসারটা ঘটে একটু বেশিরকম দ্রুতগতিতে, কিছুটা অভাবিত ও অপরিকল্পিত অবস্থায়, আমাদের যোগ্যতার তুলনায় স্ফীততর কলেবরে। এই অপ্রস্তুত বিকাশ পুরো শিক্ষাঙ্গনকেই কিছুটা ভারসাম্যহীন ও নৈরাজ্যকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়। স্বাধীনতাযুদ্ধ–সৃষ্ট বিশৃঙ্খলতা এই নৈরাজ্যকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। সময়ের সাথে সাথে এই টালমাটাল অবস্থা হয়ত নিজেই নিজেকে সামলে নিতে পারত কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ঢুকে পড়ায় তা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ষাটের দশক থেকে শুরু–হওয়া বিত্ত–বৈভবের স্থূল ও অভাবিত বিকাশ এবং মুক্তিযুদ্ধ–পরবর্তী সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের বিপর্যয় এমনিতেই শিক্ষাঙ্গনের ভেতর চুঁয়ে গিয়ে তার নৈতিকতা ও শৃঙ্খলার জগৎতকে ভেঙেচুরে দিয়েছিল। ছাত্রদের হাতে অস্ত্র এসে যাওয়া সবটাকে একেবারে পুরোপুরি অরাজক করে তুলল।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক এবং শিক্ষা–কর্তৃপক্ষের সার্বভৌম সনাতন অবস্থান একরকম ধসে পড়ল। অস্ত্রধারী সন্তানের সামনে নিরুপায় পিতামাতার মতো অস্ত্রধারী ছাত্রের সামনে শিক্ষকের উন্নত মাথাও নুয়ে গেল পুরোপুরি। যে–ছাত্র এতকাল তাঁর সামনে মুখ নিচু করে কাঁচুমাচু হয়ে চলাফেরা করেছে, সেই ছাত্রের সামনে তিনি কাঁচুমাচু হয়ে কথা বলতে লাগলেন। বিদ্যালয়ের ন্যায়নীতি আর শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে ছাত্রদের সঙ্গে তার সম্পর্ক হল কৃপাপ্রার্থী ও আপোষকামীর মতো। মাথায় হাত বুলিয়ে বা বাবা–সোনা বলে তাদের যতটুকু নিয়মকানুনের পথে রাখা যায় সেটুকুকেই তিনি তাঁর চরমপ্রাপ্তি মনে করে সন্তুষ্ট হতে লাগলেন। পুরো শিক্ষাঙ্গনই জিম্মি হয়ে দাঁড়াল এই অস্ত্রধারীদের হাতে। ছাত্র–ভর্তি, হোস্টেলের সিট, পরীক্ষার তারিখ, পার্সেন্টেজ, ছাত্র–সংসদের অর্থের ইচ্ছামতো অপচয়—সবকিছু তাদেরই খবরদারিতে চলতে লাগল। শিক্ষায়তনের সবকিছুই তাদের কব্জায়। কিছু রুটিনমাফিক কাজ আর ক্লাসে আসা–যাওয়া ছাড়া শিক্ষকদের খুব অল্প কর্তৃত্বই রইল শিক্ষাঙ্গনে।

শিক্ষায়তনের এইসব সন্ত্রাসী আর অস্ত্রধারীর দৌরাত্ম্যে, এক বিশাল অবক্ষয় আর অরাজকতার ভেতর, আমাদের শিক্ষাঙ্গন ধীরে ধীরে নিঃস্ব আর বিস্রস্ত হয়ে পড়তে লাগল। অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য আর মূল্যবোধের প্রায় কোনোকিছুই যেন বেঁচে থাকল না কোনোখানে।

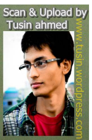
Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

৬

এতসব সন্ত্রাস আর অরাজকতাও কিন্তু জাতীয় পরীক্ষাগুলোতে আমাদের এই শ্রেষ্ঠ কলেজটির ফল ভালো হওয়াকে প্রভাবিত করতে পারল না। সব দুর্যোগ হাসিমুখে উৎরে আমাদের ছাত্রেরা বোর্ডের পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থানগুলো আগের মতোই দখল করে চলল। ঢাকা কলেজ বা ঢাকা কলেজের শিক্ষকরা ভালো বলে কিন্তু এর ছাত্রেরা ভালো ফল করে না, এরা নিজেরা ভালো বলেই এরা ভালো ফল করে। এ-ব্যাপারে শিক্ষকদের কোনো ভূমিকা নেই। ভর্তি করার সময়েই আমরা দেশের সেরা ছাত্রদের, কেবল স্ট্যান্ড-করা আর স্টার-পাওয়া ছাত্রদের বেছে বেছে এই কলেজে ভর্তি করি। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে ভাগ পাবার যুক্তি আমাদের কোথায়? তবু কলেজের অধ্যক্ষরা এই সাফল্যকে তাঁর শিক্ষকমণ্ডলী এবং বিশেষভাবে তাঁর নিজের কৃতিত্ব হিসেবে ধরে নিয়ে অসীম আত্মপ্রসাদে সময় কাটাতেন।

এমন অরাজকতার মধ্যেও ঢাকা কলেজের ছাত্রেরা-যে ক্ষতিগ্রস্ত হল না তার কারণ দেশের অন্য সব কলেজের মতোই ঢাকা কলেজেরও অধিকাংশ ছাত্র ছিল নিরীহ এবং ভালো, সন্ত্রাসী ছিল হাতে-গোনা কয়েকজন। (কিন্তু হাতে অস্ত্র ও পেছনে রাজনৈতিক সমর্থন থাকায় সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও তারা সে-যুগে শিক্ষাঙ্গনের অধঃপতনের অমন নারকীয় অনুঘটক হয়ে উঠতে পেরেছিল।) ঢাকা কলেজের ভালো ছাত্রেরা ছিল বেশিরকম ভালো। কলেজ ডুবে গেলেও তারা তাদের মুখস্থ-বিদ্যা, প্রাইভেট টিউটরের বাড়িতে হাঁটাহাঁটি আর হাতের নোটবই কিছুতেই ছাড়তে চাইত না। কলেজ থাকা-না-থাকার তোয়াক্কাই প্রায় করত না তারা। ফলে এই কলেজে সন্ত্রাসীদের জিন্দাবাদ এবং ভালো ছাত্রদের সেরা রেজাল্ট—কলেজের নিন্দা আর গৌরবের প্রতীক হয়ে পাশাপাশি জেগে রইল। আসলেই সন্ত্রাস ঢাকা কলেজের বড় ধরনের কোনো ক্ষতি করতে পারে নি, ক্ষতি করেছিল দেশের সাধারণ কলেজগুলোর। বছরের পর বছর নৈরাজ্য আর মূল্যবোধহীনতায় ভুগে ভুগে নিঃশেষিত হওয়া এই কলেজগুলোর কাছ থেকে ছাত্রদের পাওয়ার মতো প্রায় কিছুই আর ছিল না—না শিক্ষার আদর্শ, না শিক্ষকদের কাছ থেকে কোনো প্রাপ্তি। বর্ষাকালের ঝোড়-জঙ্গলের মতো অকর্ষিত সংখ্যায় তারা শিক্ষায়তনগুলোকে পূর্ণ করে তুলেছিল কেবল।

৭

আগেই বলেছি অস্ত্র ও সন্ত্রাসের প্রভাবে শিক্ষাঙ্গনের মূল কর্তৃত্ব শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের হাত থেকে চলে গিয়েছিল ছাত্রনেতাদের হাতে, যাদের ক্ষমতার মূল

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ভিত্তি ছিল অস্ত্র। অকর্ষিত, স্থূল ও বিবেকবোধবর্জিত এই ছাত্রনেতাদের কাছে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত লাভ ছাড়া আর কোনোকিছুরই প্রায় কোনো মূল্য ছিল না। শিক্ষাঙ্গনের মূল্যবোধ বা সুষ্ঠু শিক্ষা-পরিবেশের গুরুত্ব বা তাৎপর্য বোঝার মতো কোনো পরিশীলন বা সুরুচি ছিল না এদের মধ্যে। এইসব বোধহীন, সভ্যতাহীন, মূঢ় ও জন্তুসুলভ ছাত্রনেতাদের পায়ের নিচে গত তিন দশক ধরে আমাদের শিক্ষাঙ্গন নিপিষ্ট হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

ছাত্রদের সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছিলাম রাজশাহীর বাজারের এক ছোট দোকানদারের কাছে ১৯৬২-র দিকে। পঞ্চাশের দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন ড. আই. এইচ. জুবেরি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেই ছাত্ররা যেন আলাদাভাবে চোখে পড়ে সেজন্য তাদের একটা ইউনিফর্ম তৈরি করেছিলেন তিনি। নীল স্যুট আর জিন্নাহ ক্যাপের এই ইউনিফর্ম পরে ছাত্ররা যখন বাজারে যেত তখন দোকানিরা তাদের দেখে খুশি হয়ে উঠত। তারা ফলের বাজারের ভেতরে ঢুকলে দোকানিরা আম, কলা, লিচু—যার যা আছে, দু-চারটা করে তাদের উপহার দিতে থাকত। না নিতে চাইলেও জোর করে দিত। তারা ভাবত তাদের এই ছেলেমেয়েরা একদিন শিক্ষিত হবে, বড় হবে, বিদ্বান হয়ে পণ্ডিত হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আজ এদের বাড়ার সময়। এখন তাদের ভালোভাবে খাওয়াদাওয়া দিয়ে ঠিকমতো বড় করে তুলতে না পারলে তারা এসব পারবে কেন? এই ছিল ছাত্রদের নিয়ে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন। ছাত্রদের তারা তাদের আশ্রয়, ভবিষ্যৎ এবং জাতির সম্পন্ন ভরসার স্থল হিসেবে দেখত।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এখন ছাত্রদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের এই ধারণা পাল্টে গেছে। ছাত্র এখন তাদের কাছে এক দুঃস্বপ্নের নাম। ছাত্র শব্দটা এখন আর আগের মতো তাদের ভেতর স্বস্তি, আস্থা বা স্বপ্নের উদ্দীপনা জাগায় না, বরং এক অজানিত উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তায় ভীত করে তোলে। রাস্তার ওপর তিন-চারটা ছেলেকে কোথাও জটলা করতে দেখলে বয়স্করা ভয় পায়, ক্ষতিকর কিছুর আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, কী জানি কখন কী করে বসে। দল বেঁধে ছাত্ররা বাজারে ঢুকলে দোকানিরা প্রমাদ গোণে। শিক্ষাঙ্গন থেকে ছাত্রদের ভাবমূর্তি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার এই মোটামুটি ইতিহাস।

৮

আজ এই মুহূর্তে শিক্ষাঙ্গন আরোগ্যের অতীত হয়ে পড়েছে আরও একটি কারণে। সেটা কেবল অধঃপতিত ছাত্রের কারণে নয়, অধঃপতিত শিক্ষকের কারণেও। গত তিরিশ বছর ধরে এই অধঃপতিত শিক্ষা-পরিবেশের ভেতর থেকে উচ্ছৃঙ্খল ও

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আদর্শহীন মন-মানসিকতা নিয়ে বেড়ে-ওঠা ঐ অকর্ষিত ছাত্রেরাই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে এসে আজ শিক্ষক হিশেবে দেশের স্কুল-কলেজগুলোকে ভরে ফেলেছে। এদের মধ্যে শিক্ষকতার সুশীল আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষের সংখ্যা একেবারেই অল্প। মূল্যবোধহীনতা, আত্মমর্যাদাশূন্যতা, অর্থলিপ্সা, অলজ্জতা আজকের এদেশের অনেক শিক্ষকেরই কয়েকটি সুপরিচিত বৈশিষ্ট্যের নাম। মানুষের পৃথিবীতে কল্পনীয় এমন খুব কম অপরাধই আছে যা আমাদের শিক্ষকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। এর বিশদ বিবরণ আছে আমাদের দেশের গত তিরিশ বছরের পত্রপত্রিকার পাতায়। আলাদাভাবে শ্রদ্ধেয় একটি সুশীল গোষ্ঠী হিশেবে শিক্ষকের ভাবমূর্তি এখন প্রায় অবলুপ্ত। দুর্নীতিপরায়ণতায় শিক্ষক এখন পুলিশ বা কাস্টমসের লোকদের সঙ্গে প্রায় ভেদাভেদহীন, যেটুকু পিছিয়ে আছেন সে কেবল সুযোগের অভাবে । পরীক্ষাহলে ছাত্রদের নকল সরবরাহ করা, পরীক্ষার খাতায় নম্বর বাড়ানো, পরীক্ষার ফির টাকা আত্মসাৎ, ছাত্রদের নিয়ে দলাদলি, শিক্ষায়তনের তহবিল তছরুফ এসব থেকে শুরু করে এমন খুব কম অপরাধ আছে যা নিয়ে শিক্ষকেরা গড়পড়তাভাবে অভিযুক্ত নয়। এই শিক্ষকের হাত থেকে একটা বড় যুগ বা জাতি গড়ে উঠবে এমন আশা কী করে করা যায় আজ! উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র এবং আদর্শহীন শিক্ষক আজ যৌথভাবে শিক্ষাঙ্গনের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। এই দুর্দৈব উৎরে শিক্ষাঙ্গন কী করে বাঁচবে?

www.amrajaraboipori.wordpress.com

নকলপ্রবণতা

১

গল্পটা জেনোফোন আর সক্রেটিসকে নিয়ে। একদিন এথেন্সের একটা খুব সংকীর্ণ গলির ভেতর দিয়ে জেনোফোন হেঁটে যাচ্ছিলেন, গলিটা এত ছোট যে পাশাপাশি একের বেশি লোকের পক্ষে সেই গলি দিয়ে হেঁটে যাওয়া বেশ অসুবিধার। হঠাৎ দেখলেন গলির অন্যদিক থেকে সক্রেটিস এগিয়ে আসছেন। দুজনে মুখোমুখি হতেই সক্রেটিস তাঁর লম্বা লাঠি উঁচু করে ধরে জেনোফোনকে থামিয়ে বললেন, এই শহরে যদি কারো খিদে পায় তবে কোথায় গেলে সে খাবার পাবে বলতে পার? জেনোফোন সক্রেটিসকে কিছু খাবারের দোকানের নাম বললেন। উত্তর শুনে সক্রেটিস বললেন, চমৎকার! এবার বল তো, কারো যদি চিত্তের আনন্দের দরকার হয় তবে সে কোথায় যাবে? উত্তর দিতে না পেরে জেনোফোন চুপ করে রইলেন। তখন সক্রেটিস বললেন, তাহলে আমার সঙ্গে এস। আমি তোমাকে সেই আনন্দের সন্ধান দেব।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সক্রেটিস জেনোফোনকে যেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন তা হল মানবজাতির শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। মানব-সম্ভাবনাও বিকাশের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান এগুলো। প্লেটোর একাডেমি, অ্যারিস্টটলের লাইসিয়াম, প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অসংখ্য উজ্জ্বল মানুষ ও মতবাদকে ঘিরে গড়ে-ওঠা সমৃদ্ধ গোষ্ঠীগুলো এই দলের। এই সংঘগুলোর মুক্ত উদার প্রেরণাদীপ্ত জগতে, অপার্থিব মত্ততার সুতীব্র আনন্দের ভেতর মানুষের অন্তর্লোক যত শক্তিমন্তভাবে বেড়ে ওঠে আর কোথাও তা হয় বলে মনে হয় না।

গত কয়েকশ বছরে সারা পৃথিবী জুড়ে যে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা কিন্তু এই আলোকিত পাঠশালাগুলোর আদর্শে গড়ে ওঠে নি। গত কয়েক শতাব্দীর পৃথিবীতে বিত্ত ও বৈভব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ব্যবসা ও বাণিজ্যর মতো বৈষয়িক ক্ষেত্রগুলোয় যে বিশাল ও অবিশ্বাস্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে সেই কর্মজগৎকে সুষ্ঠুভাবে টিকিয়ে রাখার ও নিরন্তরভাবে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে পৃথিবীব্যাপী প্রয়োজন দেখা দিয়েছ বিপুলসংখ্যক সুযোগ্য, দক্ষ ও সুশিক্ষিত মানুষের। এই মানুষদের বাস্তব জগতের ঐ সুনির্দিষ্ট দায়িত্বগুলোর জন্যে সুদক্ষ ও চৌকশভাবে গড়ে তোলাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য। কাজেই সক্রেটিসের শিষ্যসংঘের মতো এর উদ্দেশ্য জ্ঞানের আনন্দ নয়। এর লক্ষ্য শিক্ষার্থীকে একটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষ পরিমাণ দক্ষতা দিয়ে গড়ে তোলে, যার মোটামুটি উদ্দেশ্য একটি মনোমতো চাকরি, যা দিয়ে আজীবন একটি কাম্য-পরিমাণ অর্থোপার্জন করা যাবে এবং জীবন-তরণীটিকে অনুকূল হাওয়ায় আজীবন বেয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যে জ্ঞান নয়—অর্থ, তা, শিক্ষার দিকে বঙ্গসন্তানকে লুব্ধ করে তোলার জন্যে লেখা উনিশ-শতকী কবিতার চরণ—'লেখাপড়া করে যেই /গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই' আজও লেখাপড়ার করার অনুকূলে ছাত্রদের মৌলিক প্রেরণা হয়ে বেঁচে আছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

২

পৃথিবীর বাস্তব দায়িত্বটির জন্যে ছাত্র সত্যিকারভাবে যোগ্য হয়ে উঠল কি না এবং হলে তা কতখানি হল তা নিশ্চিত করার উপায় একটাই : কঠোর ও সতর্ক পরীক্ষাব্যবস্থা। একটা জাতির পরীক্ষাব্যবস্থাকে যতটা নিখাদ ও প্রশ্নাতীত করে তোলা যাবে সেই জাতি পরিচালনার জায়গায় ততই যোগ্য এবং দক্ষ লোক সরবরাহ করা সম্ভব হবে, সেই জাতির মানুষের জীবন ততই নিরাপত্তা আর স্বস্তিতে ভরে উঠবে। পরীক্ষার উদ্দেশ্য কী? পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্য বলে যদি কিছু থাকে তবে তা একটাই : ফেল করানো। কে কোন দায়িত্বের অযোগ্য সেটা

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

নির্ণয় করে সে দায়িত্ব সে যেন কোনোভাবেই না-পেতে পারে তা নিশ্চিত করা। এককথায় ঐ চেষ্টা থেকে তাকে ফেল করিয়ে দেওয়া। ধরা যাক একজন মেধাহীন বা অযোগ্য লোক যদি ডাক্তার হয় তাহলে কী ঘটবে সমাজে? একজন বাজে ডাক্তারকে চিকিৎসার বৈধ লাইসেন্স দিয়ে সমাজে ঢুকতে দেওয়া, আর একটা ভোজালি হাতে একজন গুণ্ডাকে ইচ্ছামতো খুনের লাইসেন্স দিয়ে সমাজের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া তো একই কথা! হত্যার আইনগত ক্ষমতা দিয়ে গোটা সমাজটাকেই তো সে এক এক করে শেষ করে ফেলবে। কিংবা একজন নির্বোধ বা মেধাহীন লোক যদি ইঞ্জিনিয়ার হয় তবে কী হবে? দেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী যে-মিলনায়তনে দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণী, বিদ্বান-শ্রদ্ধাবানদের সামনে তাঁর সরকারের ভবিষ্যৎ নীতি ব্যাখ্যা করছেন, দুপাশ ঘিরে বসে রয়েছেন মন্ত্রিসভার সদস্যরা, তার পুরো ছাদ হঠাৎ ধসে পড়বে ঘরসুদ্ধ লোকের মাথার ওপর, আর দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা তার নিচে আলুর দম হয়ে গিয়ে একসঙ্গে পিষে যাবেন। এইক্ষেত্রে পরীক্ষার কাজ কী? পরীক্ষার কাজ ঐ অযোগ্য লোকগুলো কোনো উপায়ে, কোনো ফাঁক-ফোকর গলিয়ে যেন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে না পারে সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখা। এইজন্যে পরীক্ষাব্যবস্থাকে হতে হয় কঠোর আর নির্মম। একে হতে হয় ত্রুটিহীন, নিখাদ। পরীক্ষায় সবাইকে পাস করিয়ে দেওয়া গেলে তার চেয়ে খুশির আর কী হতে পারত? প্রতিটা পরীক্ষার্থীর মন হয়ে উঠত আনন্দোজ্জ্বল, প্রতিটা ঘর মুখর হয়ে উঠত মিষ্টির নিরন্তর আনাগোনায়; শুভেচ্ছায়, করমর্দনে আর অভ্যর্থনায় দিনটা একটা জাতীয় উৎসবের চেহারা নিতে পারত। কিন্তু এমন একটা ভালো কাজ না করে পরীক্ষার ফল বের হবার দিন এত ছাত্রছাত্রীর মন ভেঙে দিয়ে, এত ছাত্রছাত্রীকে চোখের পানিতে একাকার করে, এতজনকে ফেল করিয়ে (যার প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগে যাবার কথা, তাকে নিচে—অনেক নিচে নামিয়ে দিয়ে) সারাদেশ জুড়ে যে বিশাল বিষাদাত্মক নাটকের সৃষ্টি করা হচ্ছে তা তো সমাজের, পৃথিবীর মানুষের নিরাপত্তা আর স্বস্তির কথা ভেবেই।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বিজ্ঞান কলেজে নকল ঠেকাতে গিয়ে নাকাল হওয়ার যে-গল্প কিছুক্ষণ আগে শুনিয়েছি, সেই দিনের একটা ছোট ঘটনা এ-প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করতে ইচ্ছা করছে। পরীক্ষাহলে হাঁটাহাঁটি করছি, হঠাৎ দেখলাম একটা ছেলে সতর্ক-চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আর হাতে-ধরা কাগজ থেকে নকল করছে। আমি পেছন দিক থেকে এগিয়ে খপ করে তার হাত থেকে নকলটা কেড়ে নিলাম। সে বহিষ্কারের ভয় পাবে কী, উল্টো বিরক্ত হয়ে উঠল। তার ভাবটা এমন : এমনিতেই দেখে লেখার সময় নেই, তার ওপর আবার নকল নিয়ে এভাবে টানাটানি চললে হবে কী করে। নকলটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে সে সরাসরি আমাকে অনুরোধ করল। আমি নকল না-ফেরত দেওয়ায় সে

Scan & Upload by Tusin ahmed

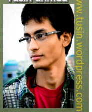

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

মৃদুভাষায় আমাকে অভিযুক্ত করতে শুরু করল। তার বক্তব্য স্পষ্ট : পরীক্ষায় পাস করে সে চাকরিবাকরি করে দুটো রোজগার করুক তা আমি চাই না।

আমি তাকে বললাম, তা ঠিক নয়। তোমার ভালো রোজগার হোক, এতে আমি খুবই আগ্রহী, কিন্তু তোমাকে নকল করতে দিলে, ঐ নকলের নম্বরটা দিয়ে তুমি যে সারাজীবন তোমার চেয়ে যোগ্যতরদের ওপরে উঠে থাকবে আর যোগ্য হয়েও সারাজীবন তাদের যে তোমার নিচে থাকতে হবে—এই অন্যায়কে প্রতিরোধ করার জন্যেই তোমাকে নকল করতে দিতে পারছি না। নকল ধরতে হয় সৎ ও যোগ্যকে বাঁচাবার জন্যে, পেছন দরজা দিয়ে সুযোগ পেয়ে অযোগ্যদের ঢুকে পড়ার অন্যায় চেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্যে, ন্যায়সঙ্গত পৃথিবীর জন্যে এক দুশ্চিন্তাহীন ও নিরাপত্তাস্মিত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যে।

স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল সারাজীবনের জন্যে নির্ধারণ করে দেয় একজন মানুষ মেধার দিক থেকে কোন্ মাপের এবং সারাজীবন সে সেই মেধার কী পরিমাণ দাম পাবে। অর্থাৎ জীবনে কতটা অর্থোপার্জন সে করবে। কাজেই, পরীক্ষার ফল মানে টাকা ; ভালো ফল মানে বেশি টাকা। কাজেই পরীক্ষায় অবৈধভাবে নকল করে কেউ যদি পরীক্ষার ফল ভালো করে তাহলে আসলে সে করলটা কী? আসলে সে তো সারাজীবনের জন্যে একটা মোটা পরিমাণ টাকাই চুরি করল। এই অর্থে নকল আসলে চুরি। অর্থ আত্মসাৎ।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কাজেই পরীক্ষার হলে অবাধে নকল চলতে দেওয়া; আর একটা অন্যায়, দুর্নীতিপরায়ণ, অবৈধ আর হতাশাগ্রস্ত সমাজের জন্ম দেওয়া একই কথা—যে সমাজ যোগ্য ও অবদানক্ষম মানুষের নৈরাশ্যপূর্ণ দীর্ঘশ্বাসে, ক্ষোভে, হতাশায় এবং আত্মধ্বংসে অপচিত।

এইজন্য উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সব দেশের পরীক্ষাব্যবস্থাকে যথাসম্ভব ত্রুটিহীন আর দুর্নীতিমুক্ত করে তুলতে হয়।

৩

আশির দশকে আসার আগেই আমাদের পরীক্ষাব্যবস্থার নির্ভরযোগ্য মানদণ্ডটি প্রায় পুরোপুরি ভেঙে পড়ে।

আমাদের ছেলেবেলায় এই মানদণ্ড ছিল মোটামুটি নির্ভরযোগ্য এবং দুর্নীতিমুক্ত। সে-সময়েও পরীক্ষা হলে নকল যে একেবারে ছিল না তা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকদের প্রিয় ছাত্র বা ছাত্রীরা শিক্ষকদের প্রীতির মতো তাদের দেওয়া নম্বরের আনুকূল্যেও হয়ত কখনো

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কখনো কমবেশি অভিষিক্ত হত, কিন্তু তখন তা আজকের মতো এমন অলজ্জ, বেপরোয়া এবং সর্বগ্রাসী চেহারা নিয়ে দেখা দেয় নি। সে-সময় পরীক্ষাহলে অসদুপায় অবলম্বনকারী ছাত্রের হার ছিল সে-যুগের সরকারি অফিসের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের হারেরই প্রায় সমপরিমাণের। ষাটের দশকেও সরকারি অফিসগুলোয় অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারি ছিল সৎ । অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিল হাতে-গোনা দুয়েকজন। তারা ছিল চিহ্নিত এবং সামাজিকভাবে ঘৃণিত। এখন পরিস্থিতি উল্টে গেছে। এখন সরকারি অফিসগুলোয় কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অধিকংশ অসাধু ও দুর্নীতিগ্রস্ত ; ভালো কর্মচারীর হাতে-গোনা, চিহ্নিত ও উপহাস্য। আমাদের ছাত্রবয়সে পরীক্ষাহলে নকলকারীর সংখ্যা ঐ সময়কার দুর্নীতিপরায়ণ ও আজকের সৎ-কর্মচারীদের সংখ্যার প্রায় সমহারেরই ছিল। একটা পরীক্ষা-কেন্দ্রে নকলকারীর সংখ্যা মোট ছাত্রের এক বা দুই শতাংশের বেশি ছিল না। আর নকল করলেই তারা-যে খুব-একটা সুবিধা করতে পারত তাও নয়। শিক্ষকদের বহুকাল-লালিত মূল্যবোধ, কঠোর নিয়মকানুন ও সতর্ক তৎপরতার কারণে তারা সহজেই ধরা পড়ে যেত এবং পরীক্ষাহল থেকে বহিষ্কৃত হত।

ষাটের দশকে দেশের দুয়েকটি চিহ্নিত কলেজের ছাত্রদের ভেতর উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নকলপ্রবণতা বেড়ে উঠলেও সাধারণ কলেজগুলোর অবস্থা ছিল একেবারেই অন্যরকম। এদেশে সর্বজনীন উৎসবের আকারে প্রথম নকল অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীনতার পর, ১৯৭৩ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায়। স্বাধীনতাযুদ্ধ ও তার আগের অস্থির, সংক্ষুব্ধ ও আন্দোলনমুখর বছরগুলোয় দেশের প্রায় প্রতিটা পরিবার যে অবর্ণনীয় দুর্দশায় নিপতিত হয়েছিল ও তাতে ছাত্রদের পড়াশোনার যে বিস্তর ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল, হয়ত সে ক্ষতিকে কিছুটা পুষিয়ে দেবার জন্যেই ঐ বছর পরীক্ষাহলের সবরকম নকল-প্রতিরোধ ব্যবস্থায় বেশ খানিকটা ঢিল দেওয়া হয়। অবাধ নকলের সুযোগ পেয়ে যায় ছাত্রেরা । সেবারের পরীক্ষাহলে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ-যে নকলের হাট-করা দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিতে যাচ্ছে তা ছাত্রমহলে আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে নিয়মিত ছাত্রেরা তো বটেই এমনকি যারা আগে দু-চারবার পরীক্ষা দিয়ে পাসের শিকে ছিঁড়তে পারেনি বা যারা কোনোদিন পাস করতে পারবে না বলে চিরকালের মতো হাল ছেড়ে চাকরি বা ঘরকন্না করছিল তারাও নড়েচড়ে বসে মোটা টাকার ফি দিয়ে দলে দলে পরীক্ষাহলে এসে হাজির হল। বিপুল পরীক্ষার্থীর চাপে উপচে-ওঠা পরীক্ষাহলগুলো এমনিতেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল, তার ওপর কর্তৃপক্ষের এই মৌন অনুমোদন। অপ্রতিহত নকলে পরীক্ষাহলগুলো প্রায় মদ-চোলাইয়ের কারখানার মতো গেঁজে উঠল। পরীক্ষার খাতাও দেখা হল পুরোপুরি কাছা খুলে দিয়ে। ফলে ফেল করার সুযোগ

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কারো সামনেই আর তেমন রইল না। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার হল স্মরণকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। ছাত্রদের উষ্ণতায়, খুশিতে, অভিনন্দনে আর করমর্দনে, মিষ্টান্নের প্রাণখোলা বিলি–বণ্টনে সরব আর মুখর হয়ে উঠল প্রতিটা বাড়ির অঙ্গন।

নকল এখন শিক্ষাঙ্গনের অন্যতম স্বীকৃত ব্যাপার। চক–ডাস্টার, মাস্টার–ছাত্র, ক্লাস হওয়া বা ছুটি–থাকা যেমন বিদ্যায়তনের একেকটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, নকল এখন তেমনি একটা ব্যাপার। এর ভালো–মন্দ নিয়ে এখন আর কারো ভেতর কোনো প্রশ্ন নেই। পরীক্ষা হলে শিক্ষকেরা নকল ঠেকানোর জন্যে প্রথমে কিছুক্ষণ হৈ-হট্টগোল করে একসময় হাল ছেড়ে উদাসীন হয়ে যান। নকলের এই অবারিত সুযোগ প্রায় সকলকেই ধীরে ধীরে নকলের ভেতর টেনে নিয়ে এসেছে। খারাপ টাকা যেভাবে ভালো টাকাকে খেদিয়ে দেয়, তেমনি এই অনৈতিক সুবিধা ভালো–মন্দ সবাইকে খারাপের ভেতর একাকার করে ফেলেছে। সাধারণ ছেলেমেয়েরা নকল তো করেই, নকলে অনিচ্ছুক ভালো ছেলেমেয়েরাও, সমান মেধাসম্পন্ন নকলকারী ছেলেমেয়েদের চেয়ে নিচে পড়ে যাবার ভয়ে একসময় নিরুপায় হয়ে নকল করতে বাধ্য হয়ে যায়। নকলকে কেউ এখন আর অপরাধ বা অসম্মানের ব্যাপার মনে করে না। নকল করে কি না জিজ্ঞেস করলে ছাত্রছাত্রীরা মুখ টিপে সলজ্জভাবে সামান্য হাসে। সেও এত সামান্য এবং পলকের যে তা অপরাধের মনোভাবকে প্রকাশ করে না। যেন শিক্ষকদের বাধা এড়িয়ে সাধ্যমতো লুটেপুটে নেবার ব্যাপার জিনিশ এটা, যতটা লুটে নেওয়া যায় ততটাই লাভ। এতে সংকোচ বা অপরাধবোধের প্রশ্নের কী আছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

গত কয়েক দশকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসের কারণে শিক্ষক–যে কেবল শিক্ষায়তনের ব্যবস্থাপনার ওপর থেকেই তাঁর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছেন তাই নয়, তিনি কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছেন পরীক্ষাহলের ওপর থেকেও— বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষাগুলোর হলের ওপর থেকে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর—সব পরীক্ষাগুলোর ব্যাপারেই এ–কথা প্রযোজ্য। সব পরীক্ষাতেই নকল চলেছে অবারিতভাবে। শিক্ষকরা পরীক্ষা–গ্রহণের দায়িত্বে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে অসহায়ের মতো সব দেখে গেছেন কেবল, এর বিরুদ্ধে কোনো শক্ত বা কার্যকর অবস্থান নিতে পারেন নি। অস্ত্রের সামনে কিছুই করা সম্ভব হয় নি। চিরকালই শিক্ষকেরা নানান প্রতিকূল অবস্থাতেও বিশুদ্ধ পরীক্ষা নিশ্চিত করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে পড়ে তাঁদের সে–শক্তি অসহায় হয়ে এসেছে। তাঁরা দুর্বল ও নিরুপায় হয়ে পড়েছেন। প্রতিরোধ নিরর্থক জেনে তাঁরা এই চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে গেছেন। শিক্ষকদের প্রতিরোধ শক্তিহীন হয়ে আসায় নকল শিক্ষাঙ্গনে অপ্রতিহত রাজত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কথায় আছে : কিছু মানুষকে তুমি চিরকালের জন্যে বোকা বানাতে পার, সব মানুষকে কিছুকালের জন্যে বোকা বানাতে পার, কিন্তু সব মানুষকে চিরকালের জন্যে বোকা বানাতে পার না। অস্ত্র এইসময় প্রায় সব শিক্ষককে দুর্বল করে মাটির সাথে নুইয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সবাইকে পারে নি। সবকিছু অর্থহীন জেনেও জীবনের শ্রেয়তর মূল্যবোধে বিশ্বাসী বেশকিছু শিক্ষক গত দুই দশকে দেশের সব জায়গায় এই নকলের বিরুদ্ধে তাঁদের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিত সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। সবখানে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে নকল প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক শিক্ষক বহু জায়গায় শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন, বহু শিক্ষক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন, অনেক শিক্ষক প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছেন, তবু এই চেষ্টা পুরোপুরি থামিয়ে ফেলেন নি। নকল প্রতিরোধে জীবন উৎসর্গকারী এই শিক্ষকেরাই হয়ত আমাদের আজকের শিক্ষাঙ্গনের একমাত্র শহীদ।

৪

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ভালো শিক্ষকেরা আত্মোৎসর্গ করে চললেও বা নিরুপায় হয়ে গেলেও দেশের শিক্ষকদের একটি বড় অংশ নকলের ব্যাপারে সবরকম সহযোগিতা দিয়ে গেছেন এই সময়ে। মোটামুটি তাঁদের সহযোগিতার ফলেই নকল আজ জাতীয় উৎসবে পরিণত হতে পেরেছে। ছাত্রদেরকে নকল করার সুবিধা করে দেওয়াকে তারা 'সাহায্য করা' বলে মনে করেন। ছাত্রেরাও তাই মনে করে। বাইরের নকলকে পরীক্ষাহলে আসার সুবিধা করে দিয়ে, প্রাইভেট-পড়া ছাত্রদের নকল সরবরাহ করে, ছাত্রদেরকে প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়ে তাঁরা এই সাহায্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এই 'সদাশয়' শিক্ষকেরা জানেন পরীক্ষাহলে তাঁদের প্রিয় ছাত্রসমাজের একমাত্র শত্রু ম্যাজিস্ট্রেট-সমাজ। বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পরীক্ষা-কেন্দ্রগুলোয় আচমকা হানা দিয়ে একমাত্র তারাই যে-কোনো মুহূর্তে নকলকারী ছাত্রদের বিপদ হিশেবে আবির্ভূত হতে পারে। তাই ছাত্রদের গার্ড দেবার বদলে পরীক্ষাহলে তাঁদের মূল কাজ হয়ে দাঁড়ায় ম্যাজিস্ট্রেটকে গার্ড দেওয়া। দূরে গ্রামের রাস্তার দিকে সারাক্ষণ তাঁরা তাঁদের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি ছড়িয়ে রাখেন। ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ির আভাস দেখামাত্র ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে সন্ত্রস্ত ঘোষণায় ছাত্রদের সতর্ক করে দেন : ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ির ধুলো দেখা গেছে রে, সাবধান!

এমনি এক ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কিছুদিন আগে দেখা হয়েছিল আমার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সার্কিট হাউসে। ম্যাজিস্ট্রেট আমার ছাত্র। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর থানার নির্বাহী কর্মকর্তা সে। কথায় কথায় হঠাৎ দুঃখ করে বলল,

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

'এদেশের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই স্যার।'

তার মুখে এ-ধরনের দার্শনিকসুলভ হতাশা শুনে কৌতূহল হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাৎ তোমার এটা মনে হল কেন?'

সে বলল, 'সবাই কেবল নিজের লাভ ভাবে স্যার, দেশের ভালো আর কেউ চায় না।'

'প্রমাণ পেলে কী থেকে?'

'এবারের পরীক্ষাহলের অবস্থা দেখে স্যার।' সে তার গল্প শুরু করল : 'জানেন তো স্যার, থানার মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পুরো তদারকির দায়িত্ব থাকে আমাদের, মানে থানা নির্বাহী অফিসারের ওপর। তো অন্যান্য বারের মতো এবারও দায়িত্ব করছি। মোট পরীক্ষার্থী হাজার-দুই। এদের প্রত্যেকের গড়পড়তা সাহায্যকারী চারজন। অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক, আত্মীয়, বন্ধু, প্রেমিক—একেকজনের একেক রকম। সবমিলে দশ হাজার। এই হল একপক্ষ। এরা সবাই নকলের দল। আর এদের বিরুদ্ধপক্ষে সারা থানার মধ্যে আমি আর আমার সহকারী কমিশনার (ভূমি)। বোঝেন কী অসহায় অবস্থা। ঐ দশ হাজার শুধু জানে না যে আমার সঙ্গে দাঁড়ানো বিশটা পুলিশের শক্তি এদের তুলনায় কত সামান্য। একবার জানলে আমাদের এরা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলত।'

www.amrajaraboipori.wordpress.com

'কিন্তু এই দশ হাজার লোকের সবাই তো নকলের পক্ষে হতে পারে না।'

'স্বার্থের সামনে এদেশে এখন আর কিছু নেই স্যার! শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রাজা-প্রজা, ভদ্র-অভদ্র এ-ব্যাপারে সব সমান। সবাই চায় নকল হোক। সামান্য একটু নকল করার জন্য, ভেতরে নকল সাপ্লাই দেওয়ার জন্য একেকজন শিক্ষিত ভদ্রমানুষ কোথায় নামতে পারে ভাবতেও পারবেন না। যেন সব লুটের মাল স্যার। যা হাতিয়ে নেওয়া যায় তাই লাভ। এ ব্যাপারে বিবেক-নীতি, ন্যায়-অন্যায় কোনোকিছুর কোনো বালাই নেই। শিক্ষক-ছাত্র, অভিভাবক-অভিভাবিকা, রাষ্ট্র, জাতি জনগণ সব যখন এর বিরুদ্ধে তখন নকল ঠেকাব কী করে বলেন?'

বললাম, 'কিন্তু শিক্ষকদের অনেককে তো তোমাদের সঙ্গে পাওয়ার কথা!'

'এতকাল তাই পেতাম স্যার। কিন্তু কিছুকাল থেকে তাও গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবার নিয়ম করেছে স্কুল-কলেজের ফল যে-মানের হবে স্কুল-কলেজ সরকারি অনুদানও পাবে সে মাপেই। কাজেই মাস্টাররা নেমে পড়েছে নিজের স্কুল আর কলেজের ফল কত ভালো করানো যায় সেই চেষ্টায়। যত পারছে নিজেদের ছাত্রদের নকলের সুযোগ করে দিচ্ছে। রুটি-রুজির ব্যাপার, স্যার। কী করে এদের ঠেকাব বলেন?'

সারাদেশের পরীক্ষার হলে নকলের অবস্থা প্রায় এমনি। এমনি অপ্রতিহত আর অবারিত।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্ন-পদ্ধতি

সন্ত্রাস ও নকল ছাড়াও আরও বেশকিছু ব্যাপার শিক্ষাঙ্গনের আজকের অবক্ষয়ের জন্যে দায়ী। সেগুলোর মধ্যে ছেলেমেয়েদের মাত্রাতিরিক্ত প্রাইভেট-পড়ার উন্মাদনা এবং নোটবইয়ের অবৈধ ও অবাধ প্রসার অন্যতম। আমার ধারণা এগুলোর ভেতর এক সন্ত্রাস ছাড়া বাকি তিনটি ব্যাপারই—পরীক্ষাহলে নকল, মাত্রাতিরিক্ত প্রাইভেট-পড়া ও নোটবইয়ের প্রসার—এমন সর্বগ্রাসী ও অনিয়ন্ত্রিত আকার ধারণ করতে পেরেছে একটিমাত্র জিনিশের জন্যে, তা হল ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্নপদ্ধতি। কীভাবে এটা হল তা ছোট করে তুলে ধরছি।

আমাদের প্রশ্নপদ্ধতিটাই, আমার ধারণা, একটা পুরোপুরি জ্ঞানবিরোধী প্রশ্নপদ্ধতি। প্রত্যেক বিষয়ে কয়েকটা হাতে-গোনা, ধরাবাঁধা বড় দাগের প্রশ্ন আছে, ঘুরেফিরে সেগুলোই পরীক্ষায় আসে। প্রশ্নগুলোই বলে দেয় পুরো বই বা বিষয় ছাত্রদের পড়ার দরকার নেই, মোটামুটি ঐ নির্ধারিত প্রশ্নগুলো রপ্ত করে নিতে পারলেই তাদের পক্ষে পরীক্ষা-বৈতরণী পার হয়ে বাকি জীবন সুখে কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। কোন্ বিষয়ের কোন্ প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় আসবে তা ছাত্রদের এমন নিশ্চতভাবে জানা যে তার বাইরে থেকে প্রশ্ন হলে ছাত্রেরা বিদ্রোহ করে ওঠে ও 'প্রশ্ন কঠিন হয়েছে' শ্লোগান দিতে দিতে পরীক্ষাহল থেকে বেরিয়ে যায়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ফলে ছাত্রেরা তাদের পাঠ্য বিষয়গুলোকে পুরোপুরিভাবে জানতে উৎসাহী হয় না এবং বইয়ের কিছু বিক্ষিপ্ত জায়গার যোগসূত্রহীন কিছু প্রশ্ন মুখস্থ করে ঐ বিষয়ের জানার পর্ব শেষ করে। পরীক্ষার প্রস্তুতির সময়ও তারা ঐ প্রশ্নপদ্ধতির ধারা অনুসরণ করে। প্রথমেই 'এগুলো ছোট, এগুলো আসে না' এমনি করে বইয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে নেয়। এরপর বসে যায় গত বছরের প্রশ্ন নিয়ে। ওগুলো আসে না, আসার রেওয়াজ নেই, আসবে না। এলে একহাত দেখিয়ে দেওয়া হবে বোর্ড আর ইউনিভার্সিটিকে। কাজেই বাদ হয়ে যায় সেগুলোও। এরপর যাচাই-বাছাই করে নিজেরা বাদ দেয় আরও কিছু প্রশ্ন। এর পর তারা বের হয় একজন দেবদূতের খোঁজে যে সুনিশ্চিতভাবে বলে দিতে পারবে ঠিক কোন্ ছটি প্রশ্ন পরীক্ষায় এসেছে। এই দেবদূতের জন্যে খুব দূরে যেতে হয় না। কাছেই তিনি আছেন। তাঁর নাম প্রাইভেট টিউটর। নিশ্চিতভাবে তিনি বলতে পারেন ঠিক কোন্ ছটি প্রশ্ন পরীক্ষায় এসেছে।

এইভাবে এই প্রশ্নপদ্ধতি ছাত্রদেরকে শিক্ষার উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রশ্নপদ্ধতিতে প্রশ্নসংখ্যা সীমাবদ্ধ ও চিহ্নিত হয়ে যায় বলে তা পরীক্ষাহলে নকল, মাত্রাতিরিক্ত প্রাইভেট-পড়া ও নোট ব্যবসা—এই তিনটি ব্যাপারকেই বেড়ে ওঠার ব্যাপারে সুবিধা করে দেয়। প্রশ্নসংখ্যা সীমিত ও চিহ্নিত বলে নকলকারীরা সেগুলোকে কাগজে টুকে বা নোটবই থেকে ছিঁড়ে অনায়াসে

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পরীক্ষাহলে নিয়ে যেতে পারে। সেটা বেশি কষ্টকর বা অসুবিধার মনে হলে পরীক্ষা হলের বাইরে থেকেও সেগুলো সরবরাহ পাবার সহজ সুবিধা রয়েছে। প্রশ্নগুলো যদি অত চিহ্নিত বা নিশ্চিত না হত, প্রশ্ন করা হত সারা বইয়ের সব জায়গা থেকে, প্রশ্নগুলো হত ছোট ছোট, ছোট কিন্তু আবার নৈর্ব্যক্তিকের মতোও ছোট নয়, প্রতিটা প্রশ্নের জবাব দেবার দরকার হত ভেবে ভেবে, সারা বই খতিয়ে—তাহলে পরীক্ষাহলে নকলের সরবরাহ এত সহজ হত না। কী প্রশ্ন আসবে সে-সম্বন্ধে আগে থেকে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে পকেটে নকল নিয়ে পরীক্ষাহলে ঢুকে যেমন কোনো সুবিধা হত না, তেমনি বাইরের নকল সরবরাহকারীদের পক্ষে প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক খুঁজে বের করে পরীক্ষা হলে চালান করাও হত কঠিন। যোগ্য, পর্যাপ্তসংখ্যক ও সুশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ না মিললে নকল সরবরাহের পুরো আঞ্জামটারই মাঠে মারা যাবার সম্ভাবনা দেখা দিত। আর বাইরের থেকে বই-নোটবই আগাগোড়া ঘেঁটে ভেতরে নকল পাঠানো সম্ভব হলেও তা পাঠাতে এবং নকলকারীর কাছে পৌঁছোতে এত দেরি হয়ে যেত যে তা পেয়েও তার হয়ত তেমন কিছু কাজ হত না।

পরীক্ষায় কোন্ প্রশ্নগুলো আসবে তা এমন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়ে পড়াতেই প্রাইভেট টিউশনি আজ দেশব্যাপী এমন একটি জাতীয়ভিত্তিক ও বিশাল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিশেবে দেখা দিতে পেরেছে। প্রশ্নের সংখ্যা সীমিত বলে সেগুলোর ওপর নম্বর-সফল লোভনীয় নোট তৈরি করে প্রাইভেট টিউটররা এমন রমরমা ব্যবসা ফেঁদে বসতে পেরেছেন। চড়াদামে, প্রায় নিলামের ছাঁচে, সেগুলো তাঁরা বিক্রি করছেন। পরীক্ষায় ভালো ফল করার আশায় ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ নোটের জন্যে গৃহশিক্ষকের বাড়ির দরজায় উন্মাদের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

দেশজুড়ে নোটবইয়ের এমন বিশাল জমজমাট ব্যবসাও জমে উঠতে পেরেছে পরীক্ষায় প্রশ্নের সংখ্যা এমন সীমিত হয়ে গেছে বলেই। নোটবইগুলো তৈরি হচ্ছে ঐ হাতে-গোনা প্রশ্নগুলোকে কেন্দ্র করেই। বইয়ের অন্য ব্যাপারগুলো গুরুত্ব পাচ্ছে খুবই কম। এগুলোকে গুরুত্ব দিয়েই বাজারে বেরোচ্ছে শিওর স্টার, শিওর সাকসেস, ছাত্রসখা, ছাত্রবন্ধু জাতের অসংখ্য বই। রেডিও-টেলিভিশনে এসব নোটবইয়ের যে বিপুল বিজ্ঞাপন হয় তা এই ব্যবসার বিশালতা সম্বন্ধে ধারণা পাবার জন্যে যথেষ্ট। এইসব নোট বইয়ের প্রতাপ আর দৌরাত্ম্যের নিচে আসল পাঠ্যবই আজ চাপা পড়ে গেছে। পাঠ্যবই কোনোদিন চোখে না দেখেও, কেবল নোটবই বা প্রাইভেট শিক্ষকের নোট পড়েই আজ একজন ছাত্র বা ছাত্রীর পক্ষে পরীক্ষায় রীতিমতো ভালো ফল করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে। মাধ্যমিক থেকে অনার্স, এম.এ. সব পরীক্ষা সম্বন্ধেই এটা সত্য।

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

গৃহশিক্ষক সমস্যা

১

নকলের মতো গৃহশিক্ষকতা বা নোটবইয়ের ধারাও এদেশে অনেকদিনের। আমাদের ছেলেবেলা পর্যন্ত এগুলোর পরিমাণ ছিল অল্প, তাই এসব নিয়ে কেউ কথা তুলত না। এখন এগুলো বিপুল এবং সর্বজনীন আকার ধারণ করায় জাতীয় আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

আমি নিজেও অল্পকিছুদিন প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে পড়েছি। ব্রিটিশ আমলের শিক্ষা আইনে একজন শিক্ষকের দুজন পর্যন্ত ছাত্র পড়ানোর অনুমতি ছিল। অল্প পরিমাণে যে-কোনো জিনিশই স্বাস্থ্যপ্রদ, কাজেই তা আমাদের উপকার না করতে পারলেও খারাপ যে করে নি তা জোর দিয়েই বলা যায়।

এ যুগের তুলনায় আমাদের কালে প্রাইভেট পড়ার চল যে কম ছিল তার কারণ অনেক। আমাদের কালের অভিভাবকেরা সন্তানের মানুষ হবার ব্যাপারে স্কুল-কলেজের শিক্ষা-মানের ওপর একালের তুলনায় অনেক বেশি নির্ভর করতে পারতেন। তাঁরা ধরে নিতেন, স্কুলই তাদের সবদিক থেকে গড়েপিটে নিজ নিজ পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দেবে। এসব চেষ্টার পরও যদি কারো কোনো বিষয়ে ছোটখাটো এক-আধটা দুর্বলতা থেকে যেত বা ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ যদি বেশিরকম মেধাহীন বা অক্ষম হত তখনই কেবল তার ব্যাপারে প্রাইভেট পড়ানোর কথা ভাবা হত। প্রাইভেট পড়াকে সবাই একটা সাময়িক বা আপৎকালীন ব্যবস্থা হিশেবেই দেখতেন। তাছাড়া সেটা তো সেই সময় এমন দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ত যে, শিক্ষক ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের শরীর-স্বাস্থ্য এবং পড়াশোনার খোঁজখবর করছেন আর ক্লাসে না-বোঝা বিষয় বুঝিয়ে দেবার জন্যে চেয়ার টেনে বসে গেছেন। এমন অবস্থায় প্রাইভেট টিউশনির দরকার এমনিতেই কম থাকার কথা।

কেন আমাদের ছেলেবেলায় প্রাইভেট টিউশনি আজকের তুলনায় কম ছিল তার প্রথম কারণটা বলা হল। আজকের তুলনায় সেকালের বিদ্যালয়ের উন্নতমানের লেখাপড়াই প্রাইভেট পড়াকে অনেকটাই অপ্রয়োজনীয় করে রেখেছিল। উন্নত দেশগুলোতে স্কুলের পর ছেলেমেয়েদের যে প্রাইভেট পড়ার এমনকি হোমওয়ার্ক করারও দরকার হয় না, তার কারণও এই।

আমাদের ছেলেবেলায় প্রাইভেট পড়ার রেওয়াজ যে আজকের চেয়ে কম ছিল তার আর-একটা কারণ আমাদের ছেলেবেলার অভিভাবকেরা আজকের অভিভাবকদের তুলনায় গরিব ছিলেন। গত তিন দশকে বিত্তের বিকাশের কারণে একালের অভিভাবকরা যতটা সচ্ছল অবস্থায় উঠে এসেছেন, আমাদের ছেলেবেলায় তা ছিল না। সেকালের সচ্ছল অভিভাবকেরাও ছিল আজকের নিম্ন-

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

মধ্যবিত্তদের পর্যায়ের, কোনোভাবে দুবেলা মাছে-ভাতে বেঁচে-থাকা মানুষ। চাইলেও ছেলেমেয়েদের জন্যে প্রাইভেট টিউটার রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না।

তবে যে-কারণে প্রাইভেট পড়ানোর দৌরাত্ম্য সারা শিক্ষাঙ্গন জুড়ে এমন সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পেরেছে তা আরও গভীর। এখানে ছোট করে তা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

২

ছেলেবেলায় নিচের দিকের কোনো একটা ক্লাসে আমাদের একটা চমৎকার কবিতা পড়তে হয়েছিল : 'হারাধনের দশটি ছেলে'। কবিতাটার প্রথম দুটি লাইন ছিল এ-রকম :

হারাধনের দশটি ছেলে
ঘোরে পাড়াময়,
একটি কোথা হারিয়ে গেল
রইল বাকি নয়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কলম-পেন্সিল, জুতো-জামা নয়, জলজ্যান্ত একটা ছেলে হারিয়ে গেল তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই যেন কারো। বাকি ন'জন যে আছে এটাই আপাতত একটা ভাগ্য। মাথাব্যথা থাকবেই বা কী করে? দশ-দশটা ছেলে সামলাতে যে-বাপকে উদয়াস্ত হিমশিম হয়ে থাকতে হয়, তারপক্ষে একটা ছেলে হারালে তাকে খুঁজে বেড়ানোর শক্তি কোথায় আর থাকে।

আমাদের ছেলেবেলায় প্রায় প্রতিটা বাপই ছিল এক-একটা হারাধন। ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল অনেক—কারো সাত, কারো দশ , কারো পনের—যা শুনে একালের ছেলেমেয়ের দল চোখ আকাশে তুলে দাঁত বের করে হেসে ওঠে। বাড়িতে এত ছেলেমেয়ে থাকার ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে। এর দুটো ভালো দিক নিয়ে আমি প্রথমে কথা বলব। প্রথমত এত ছেলেমেয়ের ভালোমন্দকে আলাদা আলাদাভাবে দেখভাল করা কোনো বাবা-মায়ের পক্ষে সম্ভব হত না বলে এবং প্রতিটি ছেলেমেয়ের সবরকম চাহিদা আবদার মেটানোও বাবা-মায়ের সাধ্যের বাইরে থাকত। ফলে ছেলেমেয়েরা পরিবার থেকে পাওয়া প্রাপ্তিটুকুকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে শিখত। এতে তাদের কূপমণ্ডূকতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা যেমন কমে আসত তেমনি বেড়ে যেত সবাইকে দিয়ে-থুয়ে সবার সঙ্গে মিলেমিশে বেঁচে থাকার ক্ষমতা। যেহেতু তারা জানত মিলিত ভাগ-

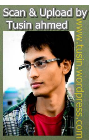
Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বাঁটোয়ারার ভেতর দিয়ে বেঁচে থাকার ওপরেই নির্ভর করছে তাদের টিকে-থাকা, তাই ছোট স্বার্থ ছোট প্রাপ্তি নিয়ে টানাটানি কাড়াকাড়ি করার প্রবণতা তাদের ভেতর এমনিতেই কমে আসত। ফলে তারা বেড়ে উঠত অনেকটা সুস্থ ও স্বাভাবিক ছেলেমেয়ে হিসেবে। আমাদের বাসায় আমরা ছিলাম এগার ভাই-বোন। আমাদের বাসায় যখন কোনো পাকা পেঁপে আসত তখন আমরা জানতাম সে পেঁপে যত সোনালি সুপরিপক্ক আর বড় আকারেরই হোক-না কেন, ঐ পেঁপের নির্দিষ্ট সাইজের একটা ছোট টুকরাই আমার জন্যে বরাদ্দ। অন্যায় আবদারে চোখের পানি নাকের পানি একাকার করে ফেললেও ঐ সাইজের এতটুকুও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানো যাবে না। এর ফলে প্রতিটা মানুষ ছেলেবেলাতেই এই জগতে নিজের অবস্থান বা অধিকার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে নিতে পারত, পৃথিবীর সবকিছুর ওপর অযৌক্তিক দাবির অত্যাচার চালিয়ে সবাইকে উৎপাত করা থেকে বেঁচে যেতে পারত।

এ তো গেল ছেলেমেয়েদের উপকারের দিক। কিন্তু কেবল ছেলেমেয়ে নয়, এই অবস্থায় বাপ-মায়েরও কিছু বাড়তি সুবিধা ছিল। ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশি থাকত বলে তাঁদের বিপুল বাৎসল্য স্নেহকে অনেকের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে বেঁচে থাকা সম্ভব হত তাঁদের পক্ষে। এতে তাঁদের মন সুস্থ সবল উৎকণ্ঠাহীন ও প্রশান্ত হয়ে থাকার সুযোগ পেত, তাঁদের মনের ভারসাম্য বজায় থাকত। ফলে সন্তানদের দুর্ভাগ্যকে তাঁরা যেমন একালের বাপ-মাদের তুলনায় অনেক সহজভাবে মেনে নিতে পারত তেমনি পারিবারিক সৌভাগ্যগুলোও অনেক সুস্থিরভাবে উপভোগ করতে পারত। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই ছিল প্রকৃতির রীতি। এই নিয়মের আওতাতেই মানুষের জীবন আবর্তিত হয়েছে।

আজ এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ষাটের দশকে এদেশে বড়ভাবে পরিবার পরিকল্পনা চালু হবার পর আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোয় সন্তানসংখ্যা বিপুলভাবে কমে যেতে শুরু করে। ছেলেমেয়ের সংখ্যা সাত-আট থেকে এসে দাঁড়িয়েছে এক থেকে দুইয়ে। এটা ঠিক যে, বিশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে মানুষের মৃত্যুহার অসম্ভবরকম কমে যাওয়ায় যে জনসংখ্যা সমস্যা তৈরি হয়েছিল তা মোকাবেলা করার জন্যে মানুষকে, অনেকটা উপায়হীন হয়েই, পরিবার পরিকল্পনার সাহায্য নিতে হয়েছে; কিন্তু এর খেসারতও তাকে কম দিতে হয়নি। এর ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের জগৎ যেমন বহুরকম সামাজিক ও মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে তেমনি (বিশেষ করে নারীদের) যে-পরিমাণ দুরারোগ্য ও জটিল রোগের শিকার হতে হচ্ছে তার পরিমাণও কম নয়।

ব্যাপক পরিবার পরিকল্পনার ফলে আজ মানুষের সন্তানসংখ্যা বিপুলভাবে কমে গেছে। আগেই বলেছি পাঁচ-সাত-দশ বা পনেরর জায়গায় আজ মানুষের

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সন্তানসংখ্যা এসে ঠেকেছে দুই বা এক-এ। কাজেই পাঁচ-সাত-দশ বা পনের জন সন্তানের জন্যে পিতামাতার হৃদয় থেকে যে বাৎসল্য-রস উৎসারিত হত তা আজ কেন্দ্রীভূত হয়েছে দুজন বা একজনের মধ্যে। কাজেই আগের দিনের পিতামাতারা যেভাবে তাঁদের স্নেহকে অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে দিয়ে সুস্থ ও ভারসাম্যময় মন-মানসিকতা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন, আজকের পিতামাতারা আর তা পারছেন না। একজন বা দুজন সন্তানের মধ্যে স্নেহ সুতীব্রভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাওয়ায় তা পিতামাতার মনে তাদের ব্যাপারে তীব্র আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে। হারিয়ে ফেলার ভয়ে তারা অনুক্ষণ অসুস্থ হয়ে থাকছে। কৃপণের মতো, স্বার্থপরের মতো তারা তাদেরকে নিজেদের বুকের ছোট কুঠুরির ভেতর অসহায়ের মতো আঁকড়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। তীব্র স্নেহ থেকে জন্ম-নেওয়া এই তীব্র আতঙ্ক সন্তানের ওপর নেমে আসছে তীব্র অত্যাচারের রূপ নিয়ে। সন্তানের সামনে তারা দেখা দিয়েছে ভয়াবহ স্বৈরাচারীর চেহারায়। পুরোপুরি নিজেদের স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার আলোকে তারা তাদের সন্তানদের গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে তারা আপোষহীন ও নির্মম। এর এতটুকু এদিক-ওদিক হলে তাকে তারা সন্তানের জন্যে ক্ষতিকর ভেবে শিউরে উঠছে। সন্তানের স্বাধীন ইচ্ছা, স্বপ্ন-সাধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে পুরো পদদলিত হয়ে যাচ্ছে। তারা বেড়ে উঠছে তাদের বাপ-মায়ের চাওয়া-পাওয়ার আজ্ঞাবাহী পুতুল হিশেবে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমাদের ছেলেবেলায় পাঁচ-সাত-দশ কি পনের জন গতানুগতিক ছেলেমেয়ের সংসারে এক-আধজন প্রতিভাবান বা বিদ্রোহী সন্তান-যে দেখা দিত না তা নয়। প্রায়শই সন্তানদের ভেতর থেকে এক-আধজন বাপ-মায়ের চাপিয়ে দেওয়া বিধানকে অস্বীকার করে নিজেদের পথে এগিয়ে যেতে চাইত। কিন্তু তাদের রসাতলে এইসব যাবার চিন্তাভাবনাকে আজকের বাবা-মায়ের মতো তারা পুরোপুরি নির্দয়-হাতে দমন করে দিত না। হয়ত ঐ বিরাট সংসারের ভারে ক্লান্ত থাকত বলেই তাদের সে শক্তি থাকত না। তাছাড়া তারা ধরেই নিত যে এতগুলো সুবোধ আর অনুগত সন্তানের মধ্যে এমনি দু-একটা সৃষ্টিছাড়া, বেয়ারা বা উদ্ভট সন্তান থেকে-যাওয়া অসম্ভব নয়। ফলে প্রতিভাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের কারো কারো পক্ষে সেকালে পরিবারের আক্রমণ এড়িয়ে নিজের স্ব-স্বভাবি অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হত।

কিন্তু আজ বাবা-মায়ের সিদ্ধান্তের বাইরে পা ফেলার কোনো শক্তিই প্রায় সন্তানের নেই। পিতামাতার সিদ্ধান্তই আজ তার একমাত্র ভবিতব্য ও অনিবার্য নিয়তি। তার ওপর পিতামাতার কর্তৃত্ব প্রায় নিরঙ্কুশ। পিতামাতারা যদি সবাই বিবেচক, বিজ্ঞ, প্রতিভাবান ও মেধাবী হতেন তাহলে এ নিয়ে কোনো সমস্যা হত না। কিন্তু সাধারণ অভিভাবকেরা মোটামুটিভাবে গড়পড়তা সাধারণ মানুষ।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তাদের স্বপ্নের দিগন্ত নেহাতই শাদামাঠা। সব পিতামাতার মতো তারা তাদের একটি বা দুটি সন্তানকে, তাদের বুকের ধন মানিককে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটি করে রেখে যেতে চান। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাদের ধারণা খুব স্পষ্ট বা সুচিন্তিত নয়। প্লেটো বা আইনস্টাইন তাদের কাছে শ্রেষ্ঠ মানুষ নয়। এদের তারা চেনে না। তাদের জানামতে জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধি হল কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারা। তারা তাদের সন্তানকে সেই ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ে রেখে যেতে চায়। এই লক্ষ্যে জীবন বাজি রেখে তারা কাজ করে। এই পথে কোথাও বিন্দুমাত্র কাঁটা দেখা দিলে তারা তাকে নির্মুল করে ফেলতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। এর জন্যে দরকারে ভিন্নমতাবলম্বী সন্তানের স্বপ্ন ও আনন্দের পৃথিবীকেও পায়ের তলায় দলে পিষ্ট করে দিতেও তাদের এতটুকু আপত্তি নেই। এইসব গড়পড়তা বাপ-মায়ের হাতে সাধারণ বা গতানুগতিক ছেলেমেয়েদের খুব একটা ক্ষতি হয় না। তাদের ভেতর অনন্য কিছু থাকে না বলেই ক্ষতি হয় না। কিন্তু ক্ষতি হয়ে যায় প্রতিভাবান ও মেধাবী ছেলেমেয়েদের। বাপ-মায়ের ভেদাভেদহীন স্বপ্নের নির্দয় স্টিম রোলারের নিচে তাদের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্বের ধার সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার হয়ে যায়, তারা গতানুগতিক সাধারণ মানুষ হয়ে পড়ে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ভবিষ্যতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, বা ব্যবসা-ব্যবস্থাপনা নিয়ে পড়াশোনা করে ভালো আয়ের চাকরিবাকরি করতে হলে যা দরকার তা হল স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরদিন থেকেই ভালো ছাত্র হওয়ার চেষ্টা শুরু করে দেওয়া। আজ আমাদের দেশে ভালো ছাত্র হবার উপায় একটাই : পাঠ্যপুস্তকসর্বস্ব লেখাপড়া আর বিপুল নোট উদরস্থ করে যেতে পারা। আমাদের অভিভাবকেরাও সন্তানের জীবন বলতে আজ শুধুমাত্র এই কাজটুকুই বোঝেন। এর বাইরে আর সবকিছুই তার জন্যে নিষিদ্ধ। তার জীবন কাটে এক শ্বাসরুদ্ধকর দুঃসহ বন্দিত্বের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকের অসুস্থ অমলের মতো। তাকে বাইরে যেতে দেওয়া হয় না, বিকেলের অনাবিল খেলাধুলার আনন্দ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনবিকাশের সুযোগ থেকে সে নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত। অথচ এ সবই করা হয় তার ভবিষ্যৎ সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের কথা মনে রেখে। বন্ধুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কিছু মুহূর্ত কাটাবার অবকাশ, দুটো সুন্দর আনন্দময় কল্পনাসমৃদ্ধ বই পড়ার সুযোগ, ইচ্ছাখেয়ালে কোনো অপরিচিত রাস্তায় বন্ধুদের সঙ্গে হঠাৎ-খুশিতে বেড়িয়ে পড়ার বিলাস—এসব কোনোকিছুই তার জীবনে নেই। তার জীবনের প্রতিটি দিন শুরু হয় স্কুলে যাবার ঊর্ধ্বশ্বাস গলদঘর্ম ব্যস্ততায়। কোনোরকমে নাকেমুখে কিছু গুঁজে স্কুলের দিকে ছুট দেয় সে। স্কুল শেষ করে ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে যখন সে ফিরে আসে তখন পৃথিবীর ওপর বিকেলের ছায়া নেমে এসেছে। এই সময় তার কচি শরীর অল্পকিছু

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বিশ্রাম চায়। কিন্তু অভিভাবকদের কঠোর নিষেধের কারণে সে সুযোগ তার মেলে না। বিশ্রাম কিসের জন্যে? জীবনকে এভাবে অহেতুক অপচয় করলে ভালো বা সমৃদ্ধ জীবন কী করে মিলবে তার ভবিষ্যতে। মুখে কোনোমতে দুটো গুঁজে দিয়ে আবার তাকে ছুটতে হয় একই লেখাপড়ার ধান্ধায়। তবে এবার আর স্কুলে নয়, প্রাইভেট টিউটরের বাড়িতে। এক প্রাইভেট টিউটরের বাড়ি থেকে আর এক প্রাইভেট টিউটরের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে কৈশোরের মনোরম বিকেল আর সন্ধ্যাগুলোকে পিষ্ট করতে করতে পিঠের ওপর ভবিষ্যৎ-জীবনের বোঝা নিয়ে পরিশ্রান্ত শরীরে সে ছুটতে থাকে। সন্ধ্যার কিছুটা পরে যখন সে ফিরে আসে তখন সে ক্লান্ত এবং নিঃশেষিত। এর পরেও দিনের লেখাপড়ার ঘানি টানা তার শেষ হয় না। রাত্রির খাবারের পরবর্তী দিনের হোমওয়ার্ক শেষ করে তবে তার মুক্তি।

যে-বয়সে সন্ধ্যার আকাশের একটি-দুটি তারার মতো জীবনের কামনারা এক-দুই করে ফুটে উঠতে থাকে, জীবনের সুকুমার স্বপ্নেরা থরে-থরে স্তবকে-স্তবকে বিকশিত হতে থাকে, সেই বয়সটাকে যদি শুধু পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ আর প্রাইভেট টিউটরের দুয়ারে দুয়ারে এভাবে নিপিষ্ট করে ফেলা হয় তবে সেই সন্তান তো উপভোগ-শক্তিবর্জিত একটা মূঢ়, অকর্ষিত ও অবিকশিত মানুষ হিশেবে রয়ে গেল। জীবনের আনন্দময় আস্বাদনের সুকুমার অলীক অনুভূতিগুলোই তো তার জীবনে পাতা মেলল না। যখন ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ জীবন তার দরোজায় এসে দাঁড়াবে তখন তাদের অভ্যর্থনা জানাবে সে কী দিয়ে? প্রেমের আনন্দের দ্বিধা থরো-থরো মুহূর্তের সামনে দাঁড়িয়ে সে করবেটা কী? গোবিন্দ দাসের কবিতায় আছে :

www.amrajaraboipori.wordpress.com

> অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
> কী করব বারিদ মেহে।

অঙ্কুর যদি (গ্রীষ্মের খরায়) সূর্যের তাপেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তবে (পরে) বর্ষার মেঘ এসে কী করবে। কচি অপরিণত কিশোর হৃদয়ের ওপর এই ধরনের দুর্বিষহ নিগ্রহ, কেবলমাত্র পাঠ্যসর্বস্ব নোটসর্বস্ব মুখস্থচর্চার এই আনন্দহীন কালো অত্যাচার শিশুর জীবনকে যদি উন্মোচিতই হতে না দিল, এইসব কষ্টে শেষপর্যন্ত কী লাভ হবে তার ? তাছাড়া জীবনের অপার্থিব খুশির আনন্দে যে কিশোর বা তরুণ পাগলা ঘোড়ার মতো আদিগন্ত মাঠ ছুটে পেরিয়ে যায়নি, খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুকে দুহাতে ছিঁড়ে হিংস্র আনন্দে উচ্চকিত হয়নি , গাছের মগডালে উঠে আকাশকে বুকের ভেতর ডাক দেয়নি, বড় জীবনকে সে কীভাবে আস্বাদ করবে? সত্যিকার বড় কিছু করাই বা কী করে সম্ভব তার পক্ষে?

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পাঠ্যপুস্তকসর্বস্ব গৃহশিক্ষকের কাছে প্রায় কিছুই পায় না আজকের ছাত্র—না আনন্দ, না দৃষ্টিভঙ্গি, না স্বপ্ন, না মূল্যবোধ, না দিকনির্দেশনা। তবু তাকে গৃহশিক্ষকের কাছে যেতে হয়। যেতে হয় দুটো কারণে। প্রথম কারণ : পরীক্ষাহলে যে হাতে-গোনা প্রশ্নগুলো অনিবার্যভাবে আসবে সেই প্রশ্নগুলোর ভালো-মানের নোট তিনি দিতে পারেন বলে। পরীক্ষার খাতায় নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে একটা অদ্ভুত কুসংস্কার আছে পরীক্ষকদের। কোনো ছাত্র বাজারের নোটবই থেকে মুখস্থ লিখেছে টের পেলে পরীক্ষক তাকে কম নম্বর দেন। সে নোট ভালো হলেও তাই করেন। কিন্তু কোনো অপরিচিত বা আলাদা নোট মুখস্থ লিখলে তিনি নম্বর দেন বেশি। হয়ত 'এ নোট সহজলভ্য নয় বা এ ছাত্র আর সবার মতো লেখেনি, আলাদা কিছু লিখেছে' কাজেই তাকে কিছু বাড়তি কৃতিত্ব দেওয়া উচিত—এ ধরনের কোনো চিন্তা থেকেই তাঁরা এটা করেন। আমার ধারণা, এর কোনো মানে হয় না। উত্তরটি যদি ছাত্রের নিজের লেখা না হয়ে থাকে (সাধারণত ছাত্রেরা নিজের লেখা নোট পরীক্ষার খাতায় লেখে না, অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় তারা জেনে গেছে কারণ তার নিজস্বতা বা মৌলিকতা বোঝার বা গুণগ্রহণ করার মতো শিক্ষক এখন আর প্রায় নেই, ওটা করতে গেলে পরীক্ষায় নম্বর কমে যায়, অহেতুক গায়ে পড়ে বিপদ ডেকে আনা হয়), যদি মুখস্থই লিখে থাকে তবে কারটা মুখস্থ করে লিখল তার ওপর তো নম্বরের বেশকম না হওয়াই তো উচিত। কিন্তু যেহেতু পরীক্ষকরা এটা করেন তাই গৃহশিক্ষকের নোটে নম্বর জোটে বেশি, ছাত্রমহলে তাঁর নোটের মহিমা বেড়ে যায়, তার বাড়িতে ছাত্রদের ভিড় উপচে পড়তে থাকে, তিনি একজন বড় রোজগারের মানুষ হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয়ত গৃহশিক্ষকের বাড়িতে আজ ছাত্রদের যে অভূতপূর্ব ভিড় দেখা যাচ্ছে তার কারণ খানিকটা তিনি নিজেও। নানা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন ইশারায় তিনিই ছাত্রদের তাঁর বাসার দিকে আহ্বান করেন। সে আহ্বান 'এসো এসো সুরে করুণ মিনতি মাখা'। এটা ঠিক যে, কোনো শিক্ষক চাইলেই রাতারাতি সফল গৃহশিক্ষক হিসেবে রমরমা পসার গড়ে তুলতে পারেন না। এর জন্যে তাঁর বেশ কটি যোগ্যতা বা গুণের দরকার হয়। এগুলোর একটি হল জনপ্রিয় বা ক্লাস-সফল শিক্ষক হওয়া। যে-কোনো বিষয় ছাত্রদেরকে চমকপ্রদভাবে বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা তাঁর থাকতে হয়। এ দিয়ে ছাত্রদের তিনি তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেন। কিন্তু ক্লাসে সবকিছু পুরোপুরি প্রাঞ্জল বা জলবৎ তরলং করে বুঝিয়ে দিলে কষ্ট আর টাকা ঢেলে তাঁর বাড়ি গিয়ে প্রাইভেট পড়ার ব্যাপারে ছাত্রদের উৎসাহ কমে যেতে পারে। তাই তাঁকে আস্তিনের ভেতর কিছু গুমর রেখে দিতে হয়, দাতাকর্ণের মতো সব উপুড় করে ঢেলে দিলে চলে না। আমি একজন শিক্ষককে চিনি যাঁকে ছাত্রেরা ক্লাসে খুব বেশি প্রশ্ন করতে শুরু করলে রেগে গিয়ে সরাসরিই বলে উঠতেন, ক্লাসে এত প্রশ্ন কিসের? বাড়িতে আসতে পারস না?

আজ দেশের স্কুল-কলেজগুলোয় কার্যত লেখাপড়া প্রায় হচ্ছেই না। দেশের

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের অধিকাংশই শিক্ষক হওয়ার যোগ্য নন, যাঁরা যোগ্য তাঁরা ছাত্রদের দেন অতি সামান্য। ফলে অভিভাবকরা কেউই বিদ্যালয়কে আজ তাদের সন্তানদের মুক্তির অঙ্গন হিসেবে মনে করেন না। ফলে বাণিজ্যিক উদ্যমসম্পন্ন গৃহশিক্ষকেরা আজ হয়ে উঠছে ছাত্রসম্প্রদায়ের মূল আশ্রয়। শিক্ষাঙ্গন আজ স্কুল-কলেজ ছেড়ে শিক্ষকদের বাড়িতে বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি শিক্ষকের বাসাই আজ এক একটি দোকান। কোনো কোনো শিক্ষকের বাড়িকে মনে হয় পুরো সুপারমার্কেট। এসব বাড়ির সামনে ছাত্রদের যত গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, অনেক সুপার মার্কেটের সামনেও তত গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে না। মুক্তবাজার অর্থনীতির আদলে সেখানে অবাধ বিদ্যার বেচাকেনা চলছে। নোট দিয়ে, সাজেশন দিয়ে তাঁরা ছাত্রদের পরীক্ষায় ভালো ফল করাকে নিশ্চিত করছেন।

প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে না-পড়েও যে ভালো ফল করা যেতে পারে আজ এই বিশ্বাস ছাত্র বা শিক্ষক সবার মাথা থেকেই মোটামুটি বিদায় নিয়েছে। ছাত্রেরা পরিণত হচ্ছে শিক্ষকদের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল একধরনের মেরুদণ্ডহীন পরজীবীতে। আজ যার যত বেশি গৃহশিক্ষক সে-ই তত ভালো ছাত্র। দুই-তিন-চারটি বিষয় তো বটেই, প্রতিটি বিষয়ে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াশোনা এমন ছাত্রের সংখ্যাও বিপুল। যার প্রাইভেট টিউটারের সংখ্যা যে-পরিমাণে কম, সে সেই পরিমাণ আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভোগে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

গৃহশিক্ষকের বাড়ি আজ ছাত্রসম্প্রদায়ের লেখাপড়ার মূলকেন্দ্র হয়ে ওঠায় স্কুল-কলেজগুলো বিশেষ করে কলেজগুলো দিনের পর দিন ছাত্রশূন্য হয়ে পড়ছে। সেখানে ছাত্রেরা ভর্তি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু ক্লাস করছে না। ক্লাসের সময়টুকুতে গৃহশিক্ষকদের বাড়িতে বাড়িতে বইখাতা নিয়ে দলে দলে হাজিরা দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের কলেজে ভর্তি হওয়ার কারণ একটাই : ওখানে ভর্তি হলে শিক্ষাবোর্ডে পরীক্ষা দেওয়া যাবে। কলেজের ছাত্রশূন্য ক্লাস কোনোমতে শেষ করে বা না-করেই অধ্যাপক বাসায় অপেক্ষমাণ ছাত্রদের পড়ানোর উদ্দেশে তড়িঘড়ি সেদিকে ছুট লাগাচ্ছে।

প্রাইভেট টিউশনির মাত্রাতিরিক্ত বাণিজ্যিক প্রসার আমাদের শিক্ষাঙ্গনের একটা বিরাট ক্ষতি করে দিয়েছে। এই প্রথা শ্রদ্ধা আর স্নেহের মাধুরীধারায় স্নিগ্ধ আমাদের যুগযুগান্তরের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে নিছক আর্থিক লেনদেন আর কেনাবেচার সম্পর্কে। শিক্ষক এখানে দোকানদার। মুখে অলজ্জ হাসি ফুটিয়ে তিনি একহাতে বিদ্যা বিক্রি করেন, ছাত্র অন্যহাতে কিনে নিয়ে যায়। এই ব্যক্তিগত বেচাবিক্রির জগতে আমাদের ছেলেবেলায়-দেখা শিক্ষক-ছাত্রের সুস্মিত সম্পর্ক প্রায় পুরোপুরি হারিয়ে গেছে। এ ছেলেবেলায় আমাদের স্কুলগুলোতে এমন শিক্ষক তো অনেকই ছিলেন যাঁরা সন্ধ্যার পর মেধাবী ছাত্রদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাদের পড়াশোনার খোঁজখবর নিতেন, চেয়ার টেনে তাদের না-বোঝা

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বিষয়গুলো বোঝাতে বসে যেতেন, গরিব মেধাবী ছাত্রদের নিজের বাসায় মাসের পর মাস পড়িয়ে তাদের দুর্বল জায়গাগুলো ঠিক করে দিতেন, ছাত্র ভালো ফল করেছে এই খুশিতে বাড়ির বড় মোরগ জবাই করে তাদের দাওয়াত করে খাইয়ে সেই গৌরব উদযাপন করতেন। এসব অন্যের মুখ থেকে শোনা গালগল্প নয়, আমার চারপাশে চোখে-দেখা ঘটনা। শিক্ষক বিত্তশালী বা সচ্ছল বলে এগুলো করতেন তা নয়, শিক্ষক হিশেবে এসবকে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব মনে করতেন বলেই করতেন। ছাত্রকে বড় করে তোলার ভেতর দিয়ে সমাজকে জাতিকে বড় করে তোলা হচ্ছে, দেশকে দুঃখ-অশিক্ষা-অন্ধকার মুক্ত করা হচ্ছে ভাবতে পারতেন বলেই এসব করতেন। আজ আমাদের সমাজে এ-ধরনের শিক্ষক কোথায়? আজ আমাদের দেশের প্রাইভেট টিউটরেরা, ভালো শিক্ষকেরা ব্যবসায়ীদের মতো রজতসর্বস্ব জীবনযাপনের স্বপ্নে বিভোর। চারপাশের উন্মাদ অসুস্থ সমাজের মতো কেবলই বিত্তের পেছনে দিকবিদিকহীনভাবে ছুটে চলেছেন তাঁরা। আজ কেবলমাত্র শিক্ষকতার দায়িত্বের জন্যে শিক্ষকতা বিরল হয়ে এসেছে। আজ ছাত্রদের কাছ থেকে গুণে গুণে মাসের আগাম বেতন হাতে পাবার পরই কেবল তাদের পড়াতে বসেন শিক্ষক। আগেভাগে টাকা না নিলে কী ধরনের বিপদ হতে পারে বারেবারে মুখ পুড়িয়ে তাও ভালো করেই শিখে নিয়েছেন তাঁরা। সুযোগ্য ছাত্র একমাস ধরে জোরেশোরে নোট সাজেশন হাতিয়ে বেতন না দিয়েই মাস-শেষে কেটে পড়ে। এভাবে ক্ষতি স্বীকার কাঁহাতক আর সম্ভব!

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

উপসংহার

আশির দশকের শেষপ্রান্তে, এরশাদী আমলের শেষদিকে এসে ঢাকা কলেজ অরাজকতার একেবারে শেষসীমায় এসে পৌছোল। সন্ত্রাসে, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলতায়, পাঠ্যপুস্তক-সর্বস্বতায়, নকলে, শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনির বল্গাহীন দৌরাত্ম্যে কলেজের পরিবেশ হয়ে উঠল নারকীয়। ফুল-ফোটা বাগান-ঘেরা সুন্দর সজীব কলেজের চেহারা দিনের পর দিন শ্রীহীন হয়ে আসতে লাগল। সবকিছুর মধ্যে ঔদাসীন্য, অযত্ন আর অমনোযোগিতার ছাপ দেখা দিল স্পষ্ট রেখায়। একটা সময় জোরালোভাবে টের পেতে লাগলাম কলেজ আর কিছুতেই যেন মনকে টানছে না। কিছুতেই আর যেতে ইচ্ছা করছে না কলেজের দিকে। কলেজের কথা মনে হলে একসময় যে খুশির ঝলক মনটাকে চৈতী হাওয়ার গান শোনাত তা যেন অদ্ভুতভাবে মরে গেছে। একটা অদ্ভুত বিবমিষার ভাব যেন গলা পেঁচিয়ে উঠে আসতে চাচ্ছে ভেতর থেকে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এই সময়কার তিনটি ঘটনা কলেজ সম্বন্ধে আমার শেষতম অনুভূতিটুকুকেও যেন নিঃশেষিত করে দিয়ে গেল। প্রথমটির কথা আগে বলে নিই।

ঘটনাটা ১৯৮৮-র। একদিন আমাদের বিভাগের দু-তিনজন মহিলা সহকর্মীর কাছে একটা অদ্ভুত গল্প শুনলাম। গল্পটা এরকম : গতকাল একটা ছেলে এসেছিল নটরডেম কলেজ থেকে। ভয়ে ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে ঢুকেছিল শিক্ষক-কক্ষে। তার উদ্দেশ্য সামান্য। সে কেন এসেছে জানতে চাইলে একজন শিক্ষিকাকে সে প্রশ্ন করেছে, 'আপনারা কি নোট বেচেন?' কথা শুনে ঐ শিক্ষিকা তাকে ধমক দিতেই সে জানিয়েছে, তার চার-পাঁচ বন্ধুর কাছ থেকে নিশ্চিত খবর নিয়েই সে এসেছে। বিক্রির মতো কিছু থাকলে সে কিনতে চায়।

ঘটনাটা শুনে সারা শরীর ঘিনঘিন করে উঠল। নিজেকে একটা পশুর চাইতেও আবিল মনে হতে লাগল। এত ছোট হয়ে গেছি আমরা? একটা দোকানদার? মুদি? আমাদের কাছে নোট কিনতে পাওয়া যায়? ছাত্রেরা টাকা নিয়ে এলে তা বিক্রি হয়? নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। আমরাই নিশ্চয়ই বিক্রি করি। দেশের শ্রেষ্ঠ কলেজের শিক্ষকরাই বিক্রি করি। না হলে কোথা থেকে খবর পায় এরা। কীভাবে পায়? শিক্ষকতাকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৈভব ভেবে একদিন সব ছেড়ে-ছুড়ে শিক্ষকতায় এসেছিলাম। কিন্তু আজ আমরা কোথায়? কোথায় নেমে গেছি আমরা?

সারাদেশে ছাত্র-শিক্ষকের ভেতর নোট কেনাবেচার বিশাল রমরমা ব্যবসার কথা ভালোভাবেই জানতাম, ব্যাপারটা নিজের ওপর এসে পড়ায় ভেঙে পড়লাম।

এই সময় আর একটা ঘটনা ঘটে যা আমার মনকে পুরোপুরি খুবই ভেঙে দেয়।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ঘটনাটা ১৯৯০-র। জিয়াউর রহমানের আমল থেকে এরশাদ আমলের অনেক দিন পর্যন্ত—মোট দশ বছর—কলেজে ছাত্র-সংসদের নির্বাচন বন্ধ ছিল। সেবার নির্বাচনের অনুমতি আদায় করা হয়েছে। দেশের ছাত্র-রাজনীতির দুই প্রধান দল ছাত্রলীগ আর ছাত্রদল নির্বাচনে মুখোমুখি। এ নির্বাচনে তাদের জিততেই হবে। এটা মর্যাদার প্রশ্ন। এ ব্যাপারে তারা আপোষহীন। কাজেই নির্বাচন নিয়ে কলেজে বড় ধরনের হানাহানি অনিবার্য। এর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় নিশ্ছিদ্র সুষ্ঠু নির্বাচন। কলেজের শিক্ষক কর্তৃপক্ষ সবাই এ নিয়ে উৎকণ্ঠিত। সবাই মূল দায়িত্ব এড়িয়ে দূরে সরে থাকতে চাচ্ছেন।

নির্বাচন বিষয়ে আহূত শিক্ষকসভায় হঠাৎ করেই আমার ওপর নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হল। এ ধরনের বাস্তব দায়িত্ব এর আগে আমি কখনো করি নি। সবাই এ-ধরনের ব্যাপারে আমার অনীহার কথা জানতেন বলে এসব ব্যাপারে আমাকে জড়াতেন না। কিন্তু এবার কিছুটা নিরুপায় হয়েই তাঁরা আমাকে চেপে ধরলেন। আমাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হল। দু-দলের ছাত্রনেতারা এসে আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে লাগল। আমি উদ্যোগ নিয়ে নির্বাচন করে না দিলে সবার জন্যে সেটা যে কী বিষাদময় হয়ে উঠতে পারে তা বারেবারে আমাকে বোঝাতে লাগল। তারাও আমাকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে চলল। সবার কথা ভেবে আমি নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নিতে রাজি হলাম।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে যতরকম নিরাপত্তা নেওয়া সম্ভব ছিল সবকিছুই নিশ্ছিদ্রভাবে নেওয়া হল। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল অসম্ভব সুষ্ঠুভাবে। নির্বাচনে একদল জেতে, একদল হারে। নির্বাচন করতে গেলে জেতার মতো হারার জন্যেও তৈরি থাকতে হয়। কিন্তু গণতন্ত্রের ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি বলে আজও আমরা পরাজয় মেনে নিতে পারি না। জাতীয় নির্বাচনেও পারি না। সে না-পারাটা যে কতটা গাঁড়লসুলভ তা আজ এদেশের নাগরিকমাত্রেই জানেন। আমাদের কথা এখনও গ্রামের সালিশির সেই লোকটার মতোই : বিচার-আচার যাই করেন, তালগাছটা আমার। আমি শুধু জিতব, শুধু পাব, এই পাওয়া অনন্তকাল অবিরতভাবে চলবে, এতে কেউই বাধা দিতে পারবে না।

ঢাকা কলেজের নির্বাচনে দশকের পর দশক ধরে ছাত্রলীগ জিতে এসেছে, এবারও তারা নিশ্চিত ছিল যে তারাই জিতবে। ছাত্রদলেরও হারার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। এই পরাজয়ের সান্ত্বনাস্বরূপ সন্ধ্যায় ভোটগণনা শুরু হবার পর ছাত্রলীগের কর্মীরা ছাত্রদলের কর্মীদের দলীয়ভাবে মিষ্টিও খাইয়ে দিয়েছে। বুঝিয়েছে—ইলেকশনে হারজিত তো আছেই, হারার জন্যে কেন অযথা মন খারাপ করছ, ইলেকশন তো আর শেষ হয়ে যাচ্ছে না! সামনে নিশ্চয়ই তোমরা আসতে পারবে, ইত্যাদি।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কিন্তু বাইরে যখন এসব চলছিল তখন ভোটগণনার টেবিলে আমরা দেখছিলাম অন্য দৃশ্য : ছাত্রদল ছাত্রলীগের চেয়ে সামান্য ভোটে এগিয়ে রয়েছে। কেউ তখনো টের পায়নি, হয়ত ভাবেও নি, কিন্তু জাতীয় জীবনের চিত্রটাও ছিল মোটামুটি একইরকম। আওয়ামী লীগের চেয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতি জনসমর্থন সেবার সবার অলক্ষে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। সেটা টের পাওয়া গিয়েছিল পরের বছর, ১৯৯১-এর ইলেকশনে, যেখানে জাতীয়তাবাদী দল অপ্রত্যাশিতভাবে, সবাইকে খানিকটা অবাক ও অপ্রস্তুত করে দিয়ে, আওয়ামী লীগকে হারিয়ে সরকার গঠন করেছিল।

মাত্র একশর মতো ভোটের ব্যবধানে ছাত্রলীগ হেরে গেল। গত আড়াই বছর ধরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যেভাবে ১৯৯৬-এর জাতীয় নির্বাচনকে মেনে নিতে পারছে না, তেমনি ছাত্রলীগও ওই পরাজয় মেনে নিতে পারল না। ইলেকশনের ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল তাদের তাণ্ডব। কলেজের দরোজা-জানালা ভাংচুর করে একাকার করে ফেলল তারা। ছাত্রদলের সমর্থকরা প্রাণ নিয়ে পালাল। শিক্ষকদের পুলিশের গাড়িতে করে কোনোমতে পার করে দেবার ব্যবস্থা করা হল। সবকিছু শেষ করে আমার বাসায় ফিরতে পরের দিন সকাল দশটা বেজে গেল।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বেশ কয়েক দিন চলে গেল, কিন্তু পরাজিতদের তাণ্ডব থামল না। তারা যখন আমার কাছে এসে নির্বাচন পরিচালনার জন্য কাকুতি-মিনতি করেছিল তখন তো তারা এজন্যই তা করেছিল যে ইলেকশনের সঠিক ফলাফলকে আমি সৎ ও নিরপেক্ষভাবে সমুন্নত রাখব। কিন্তু ইলেকশনের পরাজয় তাদের অবয়বকে পুরোপুরি পাল্টে দিয়ে গেল। তারা তাদের আগের করা সব অঙ্গীকারই ভুলে গেল। ইলেকশনের চতুর্থ দিনে আমি কলেজে গেলে তারা স্লোগান দিতে দিতে প্রসেশন করে এসে আমার গাড়িটাকে আমার চোখের সামনে চুরমার করে ফেলল। পরের দিন প্রতিটা কাগজে সেই খবর বড় বড় করে বের হল।

ঘটনাটা আমাকে অসম্ভবরকম আহত করল। আমি কুঁকড়ে, ছোট হয়ে নিজের ভেতর ক্রমাগতভাবে ঢুকে যেতে লাগলাম। আমি লক্ষ করলাম, আমি মাথা উঁচু করে অন্যদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারছি না। অসম্মানে, অপমানে সহজ হবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলছি।

আমার অনেক বন্ধু তখন আমাকে এ নিয়ে অনেক গালমন্দ দিয়েছেন। বলেছেন, নিজের আসল কাজ রেখে কেন এসব ফজুল কাজের মধ্যে গিয়ে সেঁধেছ? এখন বোঝো তার ফলাফল! আমি তাদের সঙ্গে একমত হই নি। আমি মনে করি একজন শিক্ষকের অনেকরকম কাজ আছে। লেখাপড়া তার মূল কাজ হলেও এগুলোও তার কাজের বাইরে নয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে এগুলো করাও তার জন্য বাধ্যতামূলক। বড় বড় দর্শন বিজ্ঞানের বাহানা তুলে এসবকে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। ওটা করতে গেলে আমাদের

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

মুখে-মুখে বলা অনেক বড় কথা মিথ্যা হয়ে যাবে।

আমি এক জায়গায় লিখেছি : আমরা যারা সৎশিক্ষকের জীবনযাপন করে ছাত্রদের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার সামনে জীবন কাটাই, আমাদের ত্বক অন্যদের তুলনায় কিছুটা পাতলা হয়। এর কারণ অনেক। প্রথমত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও বাইরে সারাজীবন এক কুর্নিশসুলভ পরিস্থিতিতে আমাদের জীবন কাটে যা অন্য কোনো পেশার মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। আমরা কাউকে স্যার বলি না, সারাজীবন সবার কাছ থেকে একটানা স্যার সম্বোধন শুনি। আসসালামুয়ালাইকুম বলার দায় আমাদের নেই, ওয়ালাইকুমআসসালাম বলাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এই অবস্থায় এ-ধরনের অসম্মান আমাকে চাবকে চাবকে ভেতরের কাঁচা ঘা থেকে রক্তক্ষরণ ঘটাতে লাগল। আমার শিক্ষক-জীবনের জন্য আমি অনুতপ্ত হতে লাগলাম। এই জীবন আমার কাছে প্রায়-ঘৃণ্য মনে হতে লাগল।

ছাত্রলীগের নেতারা এসে আমার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইল। তাদের নির্দেশ ছাড়াই তাদের অবিমৃষ্যকারী কিছু সদস্য আমার সঙ্গে যে-অন্যায় আচরণ করেছে তার জন্যে তারা আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করল। আশেপাশের সবাই আমার দুর্ভাগ্যের জন্যে সমবেদনা জানালেন এবং ন্যায়কে সমুন্নত রাখার চেষ্টায় আমি-যে অনমনীয় ছিলাম সেজন্যে আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু আমার যন্ত্রণা আমি কিছুতেই মুছে ফেলতে পারলাম না। ব্যাপারটা আমার ভেতরে ভেতরে কুরে যেতে লাগল।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ব্যাপারটাকে মনের ভেতর চেপে রেখে আমি তবু কোনোমতে শিক্ষকতা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একটা ব্যাপার এই সময় আমাকে শিক্ষক-জীবনের অর্থহীনতার একেবারে শেষপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। আগেই বলেছি যখন যে-কলেজেই আমি কাজ করেছি আমার ক্লাস সবসময়েই ছাত্রে গমগম করেছে। একটা প্রাণবন্ত জনতাকেই পড়িয়েছি আমি সারাজীবন। কিন্তু একসময় সূক্ষ্মভাবে টের পেতে লাগলাম আমার ক্লাসের সেই জনসমুদ্রে ভাটার টান লাগতে শুরু করেছে। আমার অজান্তে নিঃশব্দে আমার ক্লাসের উপচে-পড়া ছাত্রসংখ্যা কমে আসছে। ক্লাসে আগের সেই গমগম-করা ভাবটা যেন আর নেই। ক্লাসগুলো আগের চেয়ে বিমর্ষ আর নীরক্ত। একসময় লক্ষ করলাম বেঞ্চগুলোয় ঠাসাঠাসি করা ছাত্রের ভিড় তো হালকা হয়ে এসেছেই, এমনকি কখনো কখনো ক্লাসের পেছনের দিকের এক-দুটো বেঞ্চও যেন প্রায়ই খালি পড়ে থাকছে।

ব্যাপারটা নিয়ে খটকা লাগায় আমি একদিন আমার এক সহকর্মীর কাছে এর কারণ জানতে চাইলাম। আমার কথা শুনে তিনি হেসে উত্তর দিলেন, 'আপনার ক্লাস বলেই এখনো কিছু ছাত্র পাচ্ছেন। আমরা তো মোটামুটি ফাঁকা ক্লাসেই আসা-যাওয়া করছি।' অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বুঝলাম—কী বোকার স্বর্গে বাস করছিলাম আমি এতদিন! কী বিরাট একটা ব্যাপার আমার চোখ এড়িয়ে ঘটে চলেছে অথচ নানা কাজের ঘোরে তা আমার খেয়ালেই আসে নি। নিজের

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

নির্বুদ্ধিতার জন্য দুঃখ হতে লাগল। টের পেলাম, ছাত্ররা কলেজে আসেই না প্রায় আজকাল। কলেজে যাদের প্রতিদিন সন্ত্রাস, হৈ-হল্লা, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া করে কলেজকে সরগরম করে রাখে তাদের অধিকাংশ আসল ছাত্র নয়, সন্ত্রাসী। ভুল করেই তাদের আমি এতদিন ছাত্র ভেবে এসেছি। এখানকার ছাত্রেরা কলেজ ফেলে চলে যায় প্রাইভেট টিউটরের বাড়ি, এক এক করে কয়েকজন শিক্ষকের কাছে পড়া শেষ করে বিকেলের দিকে বাসায় ফিরে যায়। কলেজের দিক আর মাড়ায় না। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই ভেবে পেলাম না, সহকর্মীরা এতদিন এভাবে ছাত্রছাড়া ক্লাস করে চলেছেন , কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে কেন বড় ধরনের শোরগোল তোলেন নি কলেজে? ব্যাপারটা তো কলেজের প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে অসম্ভব গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হওয়ার কথা। হঠাৎ করে তো ব্যাপারটা শুরু হয়নি কলেজে। নিশ্চয়ই একটু একটু করে অনেকদিন ধরে ঘটেছে। তাহলে কেন তাঁরা নীরব হয়ে রয়েছেন? নিজেদের ব্যর্থতার কথা অন্যকে শুনিয়ে নিজেদের লজ্জা বাড়াতে চান নি বলে? নাকি এই শূন্য ক্লাসকক্ষ তাঁদের অনেকেরই ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূল? তাঁরাই কি সেইসব শিক্ষক যাদের বাসার দিকে ক্লাস-ফেলা ছাত্রদের মধ্যাহ্নকালীন ঊর্ধ্বশ্বাস যাত্রা?

আমার ভেতরটা কষ্টে হু হু করে উঠল। তাহলে কাদের জন্যে আমার এতদিনের উৎকণ্ঠা, চেষ্টা, শ্রম? কাদেরকে বড় স্বপ্ন, বড় আনন্দের শক্তিমন্ত মানুষ করে তোলার জন্যে এতদিন এই জীবনকে তিল-তিল করে ক্ষয় করে এসেছি? যাদের জন্য এত জীবনপাত আর কষ্ট তারাই যখন এর বিরুদ্ধে তখন শেষ হোক এই পর্ব।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এট টু ব্রুটি, দেন ফেল সিজার

ব্রুটাস, তুমিই যখন অস্ত্রাঘাত করলে,তখন পতনই হোক সিজারের নিয়তি। সবাই যখন নিজের স্বার্থের ছোট্ট একান্ত কুঠুরির খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরছে তখন আমি কেন একা কষ্টে ছিন্নভিন্ন হচ্ছি। সারা জাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একা এই নিষ্ফলা প্রান্তরে আমি কতটুকু কী করতে পারব? সত্যি যদি তাদের জন্য অর্থপূর্ণ কিছু করতেই হয় তবে তা এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আর সম্ভব নয়। এই বৈষয়িক প্রাপ্তি-প্রত্যাশা, বুটিবুজির স্বার্থসংশ্লিষ্ট আবিল জগতের মধ্যে তার ভবিষ্যৎ সম্ভব নয়। তা যদি করতে হয় তবে তার জন্যে যেতে হবে 'অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।' শিক্ষাঙ্গনের দেয়াল-ঘেরা এই অবসিত প্রান্তরে এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে না।

তখন ১৯৯২-এর মার্চ মাসের শেষদিক। দিন-সাতেক ভেবে নিয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি প্রায় কপর্দকহীন মানুষ। জীবনে রোজগার-সঞ্চয় কোনোকিছুরই চেষ্টা করি নি। আমার পক্ষে ঝট করে এই চাকরি ছাড়াতে ঝুঁকি আছে। সবই বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু কিছুতেই শিক্ষকতা করার কথা ভাবতে পারলাম না।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমার চাকরি ছাড়ার খবরে নিকটজনেরা উদ্বিগ্ন হলেন। সবাই আমাকে এই সিদ্ধান্ত পাল্টাতে অনুরোধ করলেন। একজন এমনও বললেন, 'আরে ভাই, পাগলেও তো চাকরি ছাড়ে না। কী করছেন আপনি এসব?' আমার স্ত্রীকেও মুষড়ে-পড়া মনে হল। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। এদেশে ছেলেদের চাকরি থাকে বলেই তার সঙ্গে একজন মেয়ের বিয়ে হয়। সেই চাকরি না-থাকা মানে তো স্বামীই না-থাকা? তাছাড়া এই পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে কানাকড়িহীনভাবে চাকরি ছেড়ে যাওয়া কাকেই না উৎকণ্ঠিত করবে?

সামনে এপ্রিল মাস। তিরিশ বছর আগে ১৯৬২-এর ১ এপ্রিলে চাকরিতে এসেছিলাম, ঠিক করলাম, তিরিশ বছর পর ঐ একই তারিখে চাকরি থেকে বিদায় নেব। সেই অনুসারে ১ এপ্রিলে চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসরের আবেদনপত্র অধ্যক্ষের কাছে পেশ করলাম।

অধ্যক্ষ লতিফুর রহমান সরল সহজ হাসিখুশি মানুষ। ঢাকা কলেজে আমাদের দীর্ঘ সুখদুঃখের দিন কেটেছে অন্তরঙ্গ সহকর্মী হিসেবে। আমার আবেদনপত্র পেয়ে তিনি বিমর্ষ হয়ে গেলেন। বারে বারে সেটা প্রত্যাখ্যান করার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন। ঘুরেফিরে বলতে লাগলেন, আপনার বিদায়ের আনুষ্ঠানিকতা আমাকে দিয়ে আপনি করাবেন না, প্লিজ। তিনি বন্ধু-বিয়োগের শোক অনুভব করছিলেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমি তাঁকে বোঝাতে চাইলাম, আজ যে বিদায় নিচ্ছি, সাত-আট বছর পরে তো সেই বিদায়ই নেব । পার্থক্য কোথায়?

'কিন্তু আপনাদের মতো শিক্ষকেরা এভাবে চলে যেতে থাকলে ..।'

'নতুন শিক্ষক তৈরি করতে হবে। সেই কাজ করতে চাই।'

খবরটা জানাজানি হবার পর ছাত্র, শিক্ষক, সহকর্মী, আত্মীয়, বন্ধু সবাই তীব্রভাবে সিদ্ধান্তটার প্রতিবাদ করলেন।

কলেজের অধ্যক্ষের মতো শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এমনকি রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে আবেদনপত্র ফেরত নেবার জন্যে ফিরে ফিরে চাপ আসতে লাগল। কিন্তু আমার হৃদয় তখন মৃত, আমার ভেতরে তখন কেবলই বিবমিষা। মাঝখান থেকে ঐসব ঠেলাঠেলির কারণে আমার আবেদনপত্র গৃহীত হতে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস সময় লেগে গেল।

আবেদনপত্র গৃহীত হলে আমার অনুজপ্রতিম ও শক্তিমান কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তিরিশ বছরের শিক্ষকতা-জীবনের দিকে হাত নেড়ে কলেজ থেকে বিদায় নিলাম।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পরিশিষ্ট : ১

আমার স্কুল-জীবনের কয়েকজন শিক্ষক

রাশফুকো লিখেছিলেন ভালো-মন্দ দুই দলেরই নায়ক থাকে। আমি 'আমার স্কুল-জীবনের শিক্ষকেরা' অধ্যায়ে যে-শিক্ষকদের কথা লিখেছি তাঁরা ছিলেন আমার জীবনের ভালো শিক্ষকদের দলের নায়ক। এদেরই পাশাপাশি আবার এমন কিছু শিক্ষকের দেখাও পেয়েছি—বিশেষ করে আমার স্কুল-জীবনের প্রাথমিক দিনগুলোয়—যাঁদের দ্বারা আমার জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এককে সময় মনে হয়েছে এই ধরনের শিক্ষকদের সঙ্গে শিশুদের দেখা না-হওয়াই হয়ত ভালো। তবু এঁরা গুরুত্বপূর্ণ এজন্যে যে সেকালের বিদ্যালয়ে এদের প্রয়োজনীয়তা এবং অভিভাবকদের কাছে এদের প্রিয়তা থেকে সেকালের মানুষের মন এবং সেকালের শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে ধারণা করা সহজ হতে পারে। আমার জীবনের ভালো শিক্ষকদের মতো এঁরাও আমার মনে বেঁচে আছেন একই রকম জ্বলজ্বলে হয়ে। এটা এদের শক্তিরই পরিচয়। এঁদের ঘিরে আমার মনে যে-কষ্ট পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে তা সুসহ করার জন্যে এঁদের গল্প আমি খানিকটা কৌতুকরসের ভিয়েন দিয়েই বলার চেষ্টা করব।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

১

আমার জীবনের প্রথম শিক্ষকের নাম আজ আমি পুরোপুরিই ভুলে গেছি। শরদিন্দু বাবুর আগে তিনি অল্প কয়েকমাসের জন্যে আমাদের পড়িয়েছিলেন। নাম মনে না থাকলেও তাঁর চেহারা এখনো ভয়ার্ত-রেখায় আমার মনের ক্যানভাসে আঁকা হয়ে আছে। অসম্ভব পেটাতেন তিনি আমাদের। স্যার ছিলেন রোগা লিকলিকে একহারা চেহারার মানুষ। তাঁর মুখ ছিল লম্বা আর ছুঁচলো। তাঁর কথা মনে হলে এখনো আমার মনে ছেলেবেলার গল্পে-পড়া শেয়াল পণ্ডিতের লোভী

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এবং চতুর মুখটা থেকে থেকে ভেসে ওঠে। স্যারের চোখদুটো ছিল রুক্ষ আর কঠিন। কানদুটো লোমে ভর্তি। ছেলেবেলায় শুনতাম, কানে লোমওয়ালা লোকদের রাগ বেশি হয়। বড় হয়ে আমার কানেও স্যারের মতোই লোম হয়েছে, অমনি নিবিড় আর ঘননিবিদ্ধ, কিন্তু আজও আমার ভেতর রাগের তেমন কোনো আলামত দেখতে পাচ্ছি না তো।

স্যারের রাগ সত্যি ছিল ভয়ঙ্কর। লম্বা লিকলিকে বেত দিয়ে অসুস্থের মতন পেটাতেন তিনি আমাদের। পেটাতে পেটাতে তার মুখ রক্তাভ আর হিংস্র হয়ে উঠত, তাঁর বেতের নির্মমতায় আমাদের কিশোর বয়স ফালি ফালি হয়ে চিরে যেত। আর তাঁর ক্ষত আমাদের চামড়া কেটে নির্মম তীক্ষ্ণ রেখায় আগুনের হিংস্র হলকার মতো বসে যেত। প্রায় প্রতিদিনই স্যার এভাবে পেটাতেন আমাদের।

প্রতিদিন এসেই স্যার প্রথমে পড়া ধরতেন আমাকে। তাঁর তীক্ষ্ণ বেতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে নানান রকম অঙ্গভঙ্গি আর কসরত করে শুরু হত আমার উচ্চাঙ্গের ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য। সপাং সপাং বেতের মুখে কখনো ভরত নাট্যম, কখনো কত্থক, কখনো মণিপুরি কুচিপরি হয়ে ওড়িশি পর্যন্ত চলতে থাকত আমার সেই নৃত্য-প্রতিভার অলৌকিক মঞ্চপ্রদর্শনী। আমার পর্ব শেষ হলে শুরু হত আমার ছোটভাইয়ের পর্ব। এমনি করেই দিন যেত।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমার ছোটভাই মামুন ছিল আমার চেয়ে বছরখানেকের ছোট। ছেলেবেলায় ওর মেজাজ ছিল তেড়িয়া আর প্রতিভা ছিল নব নব উন্মেষশালিনী। একদিন হঠাৎ করেই ও তার একটা প্রমাণ দিয়ে বসল। সেদিন স্যার এসেছিলেন সময়মতোই। প্রথমে নিয়মমতো শুরু হয়েছে আমার নাচ। বেশ অনেকক্ষণ ধরেই চলেছে সেটা। এরপর মামুনের পালা। নিয়মিতের মতো দেখলাম স্যার সপাং সপাং করে বেতিয়ে চলেছেন আর মামুন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বিকৃত আর্তনাদে প্রতিদিনের গতানুগতিক নৃত্য পরিবেশন করে চলেছে। হঠাৎ করেই কী যেন একটা ব্যাপার ঘটে গেল। দৃশ্যপট পাল্টে গেল মুহূর্তে। দেখি, মামুন নয়, উল্টে স্যারই নাচছেন। হ্যাঁ, স্বয়ং স্যার। প্রতিদিনকার আমাদের মুদ্রাতেই নাচছেন তিনি। শাদা ধুতির ভেতর থেকে সরু সরু লম্বা কালো পায়ের পাতাদুটো মাটিতে ঠুকে শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে নৃত্যের বিচিত্র কারুকার্য সৃষ্টি করে নেচে চলেছেন তিনি। মুহূর্তেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। মার খেতে খেতে অসহ্য মামুন একসময় দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে স্যারের হাত থেকে বেত কেড়ে নিয়ে উন্মত্তের মতো স্যারের দু-পা লক্ষ করে বেতাতে শুরু করেছে।

সেই ঘটনার পর স্যারকে আমাদের বাসায় আর দেখিনি। হয় তিনি নিজেই চলে গিয়েছিলেন, নয় তাঁকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছিল। এত শক্তিশালী একটা স্বৈরাচারী যুগের অবসান যে এত সহজে হবে সেটা আমরা ভাবতে পারি নি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনে একের পর এক স্বৈরাচারী শাসকদের অমনি নির্বোধ পতন দেখে বুঝতে পেরেছিলাম সব স্বৈরাচারী শাসকই হয়ত শেষ বিচারে

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ঐ স্যারেরই মতো। অমনি কাগুজে বাঘ। এদের বাইরের ভয়ঙ্কর চেহারার আড়ালে ভেতরটা একেবারেই ফাঁপা আর শেকড়হীন। সামান্য একটু আঘাত সহ্য করেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। স্যারের কথা মনে হলে ধুতির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা কালো কাঠি কাটি পা-দুটোর নৃত্যরত অসহায় ছবিটা চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়।

স্যার চলে যাওয়ায় আকণ্ঠ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলাম। স্যারের নাম-চেহারা কিছুই আজ মনে নেই। সেকালের সঙ্গে একালের অনেক পার্থক্য হয়েছে, ছাত্র আর শিক্ষকদের দুপক্ষেরই আচারে ব্যবহারে। কিন্তু আমরা যারা সেকালের ছাত্র আর একালের শিক্ষক হয়ে জীবন কাটালাম, তাদের নিয়তি প্রায় একরকমই থেকে গেল। দু-কালেই আমরা নাচলাম। সেকালে শিক্ষকেরা পেটাতেন, ছাত্ররা নাচত ; তখন নেচেছি ছাত্র হয়ে। একালে ছাত্রেরা পিটিয়ে যায়, শিক্ষকেরা নাচেন। এখন নেচে যেতে হচ্ছে শিক্ষক হিশেবে।

২

প্রাণকৃষ্ণ স্যার

www.amrajaraboipori.wordpress.com

স্কুলে আমি আর-একজন স্যারকে পেয়েছিলাম আমরা পাবনার রাধানগর স্কুলে। এবার তাঁর গল্প। কিছুটা রসের ভিয়েন দিয়ে তাঁর পল্প লিখেছিলাম একটা পত্রিকায়। গল্পটাকে ঠিক সেভাবেই এই বইয়ে সংযোজিত করলাম :

"রাধানগর স্কুলের ছাত্রদের কাছে যিনি সাক্ষাৎ যমদূত হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি আমাদের অঙ্কের স্যার প্রাণকৃষ্ণ সাহা ! না, এ কৃষ্ণ বৃন্দাবনের শ্রীরাধার রসিক কালা নন, কৃষ্ণের হাতে মারা পড়ার ঠিক আগাখানটায় রাজা কংসের চোখে কৃষ্ণকে যেমন বিভীষিকাজনক মনে হয়েছিল, প্রাণকৃষ্ণ স্যার আমাদের চোখে ছিলেন তাই। তাঁর নাম শুনলেই আমাদের মুখ শুকিয়ে উঠত। গোপনে আমরা তাঁর নাম দিয়েছিলাম প্রাণদণ্ড সাহা। স্কুলের মধ্যে এক অমরবাবু ছাড়া আমাদের প্রায় সব স্যারের হাতেই নিয়মিত বেত থাকত। অবশ্য তা অধিকাংশ সময়েই যতটা ভয়ের সম্ভাব্য আতঙ্ককে প্রকট করে তোলার জন্য ততটা করুণ রস সৃষ্টির জন্য নয়। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণ স্যারের বেত ছিল মৌল উদ্দেশ্যের প্রতি অকাট্যভাবে আত্মনিবেদিত। এজন্যে মৌলবাদীই বলা যায় তাঁর বেতকে। বিছুটির জ্বলুনি ছিল তাঁর বেতের মুখে। 'বহু ব্যয় করি, বহু ক্রোশ দূরে' কষ্ট করে গিয়ে নিজে বেতবনের দুর্ভেদ্য এলাকা থেকে বিস্তর চেষ্টায় সংগ্রহ করে আনা সবচেয়ে লম্বা বেত হাতে নিয়ে ক্লাসে আসতেন প্রাণকৃষ্ণ স্যার। না, একটা নয়—সমান সাইজের দু-দুটো বেত থাকত প্রাণকৃষ্ণবাবুর হাতে। জোড়া বেত নিয়ে ক্লাসে আসতেন তিনি। প্রাণকৃষ্ণ

Scan & Upload by Tusin ahmed

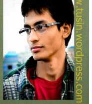

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

স্যারের পেটানোর বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর প্রতিভার মতোই মৌলিক ও ব্যতিক্রমধর্মী। বেতের ঐ দৈর্ঘ্যের কারণেই তাঁর পেটানো হয়ে উঠত আরও বৈশিষ্ট্যময়। বেত লম্বায় বেশি ছিল বলে কাউকে কাছে ডেকে পেটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না; ফলে বেতের ঘা জায়গা ছেড়ে অজায়গায় গিয়ে পড়ত। কাজেই হয় কেবল দূরের ছাত্রদের নয়ত কাছের ছাত্রদের দূরে পাঠিয়ে তাদের পেটাতে হত তাঁকে। এই পদ্ধতির মধ্যে ক্লাসের অন্য ছাত্রদের বিপদের সম্ভাবনাও যে লুকিয়ে থাকতে পারে সে-ব্যাপারে স্যার ছিলেন নির্বিকার। ধরা যাক, সবচেয়ে পেছনের বেঞ্চের কাউকে তিনি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন :

'বল তো সুশান্ত, ষোল ষোলং কত?'

'এক শো বেরাশি স্যার।'

এক সেকেন্ডে দেরি হল না। চেয়ারে বসেই লকলকে লম্বা জোড়া-বেত ছাদতক উঁচিয়ে শপাং করে বসিয়ে দিলেন সুশান্তের ওপর। ফল হল উল্টো। সুশান্তর গায়ে লাগল কি লাগল না, মাঝখান থেকে দেখা গেল, স্যার আর সুশান্ত বরাবর প্রথম থেকে চতুর্থ বেঞ্চের পর পর চারজন ছাত্র আহত হয়ে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে।

বেতের ঘায়ে আক্রান্ত ছাত্রদের পরিত্রাহী সঙ্গীত শুনতে শুনতে রোমান সম্রাট নিরোর মতোই তিনি অসীম তৃপ্তি লাভ করতেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অবশ্য কিছুদিনের অভিজ্ঞতাতেই ছাত্ররা এ-ধরনের আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষার ব্যাপারে সাবালক হয়ে উঠল। যাকে তাক করে স্যারের বেত্রচালনা তার আর স্যারের মাঝ বরাবর আমরা সবাই মুসা নবীর লাঠির আঘাতে নীলনদের পানির মতো চকিতে দুপাশে সরে গিয়ে একটা প্রশস্ত রাস্তা তৈরি করে দিতাম।

আমাদের বেতিয়ে লাল করার জন্য বেত্র ব্যবহারের যতরকম কৌশল তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন তার প্রতিটারই একটা করে আলাদা নাম দিয়েছিলেন তিনি। যেমন তুলোধোনা, গা-সাপটানি, বিছুটি-ধরা, ফুল চাবকানি, হাফ চাবকানি—এমনি অন্তত ডজনখানেক নাম। অনেকদিন ধরে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে প্রতিটা মারের আলাদা জাত-বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে এই নামগুলো তিনি দিয়েছিলেন।

ছাত্রকল্যাণে কানমলা ছিল প্রাণকৃষ্ণ স্যারের দ্বিতীয় নিবেদন। জোড়া-বেতের বারবার ব্যবহার করতে স্যারেরও কষ্ট কম ছিল না। এত লম্বা দু-দুটো বেতকে ছাদতক উঁচিয়ে খাটনি করে ছাত্র চাবকাতে রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়তে হত তাঁকে। এই সময়ে স্যারের বয়স হয়ে গিয়েছিল, শারীরিক শক্তিও কমে এসেছিল কিছুটা। কাজেই ছাত্র ঠ্যাঙানোর টেকনিকে বাধ্য হয়েই খানিকটা সময়োচিত পরিবর্তন আনতে হয়েছিল তাঁকে। যাদের ভুল বা অপরাধ তুলনামূলকভাবে কম তাদেরকে কানমলা দিয়েই তিনি মোটামুটি মাফ করে দিতেন। কিন্তু ক্ষমাও যে কতটা মর্মান্তিক হতে পারে তা তাঁর হাতে কানমলা না-খেলে বোঝার উপায় ছিল

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

না। কাচের গুঁড়ো আর এ্যারারুট জ্বাল দিয়ে তৈরি আঠায় সুতো মাঞ্জা দিলে তা যেমন ধারালো আর খরখরে হয়, স্যারের সারাটা হাতের তালু ছিল তেমনি। ঐ হাত দিয়ে যে-কান তিনি একবার শক্তমুঠোয় চেপে ধরতেন সে-কানের ওপর বিজলির নাচন ঝলক দিয়ে উঠত। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা আর বাঘকে ছুঁলে আঠার ঘা—এই ছোঁয়া ছিল প্রায় তেমনি।

প্রতিদিন তাঁর প্রশ্নের জবাবে ক্লাসে আমি যে-উত্তরগুলো দিতাম তার বিস্ময়কর নির্বুদ্ধিতা স্যারকে এতটাই ক্রুদ্ধ আর অসুস্থ করে তুলত যে, কায়িক কষ্ট সত্ত্বেও আমাকে বেতানো ছাড়া স্যার আর কিছু খুঁজে পেতেন না। একদিন হঠাৎ করেই একটা আশাব্যঞ্জক ব্যাপার ঘটে গেল। আমি স্যারের প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু কম ভুল করে বসলাম। আশা ছিল কানমলার লঘু শাস্তির মোলায়েম রাস্তা ধরেই আজকের দিনটা পার পেয়ে যাবে। হলও তাই, কিন্তু এই লঘু শাস্তির ভেতর যে এতবড় একটা বিপদ ঘাপটি মেরে বসে ছিল, বুঝতে পারি নি।

স্যারের কানমলা চিরকালই ছিল অত্যন্ত শিল্পসম্মত ও উচ্চস্তরের। কোনো ছাত্র কোনো ভুল উত্তর দিয়েছে কি অমনি ডান হাতের তর্জনি দিয়ে ফিল্মি রংবাজদের কায়দায় দুবার তাকে নিজের দিকে আহ্বান করতেন স্যার : চ্লা আও, চ্লা আও! শিকার ধরার আগে স্যারের ভাষা উৎসাহে হিন্দি হয়ে যেত। ছাত্র তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কুটিল হেসে তার দিকে তাকাতেন তিনি, তাঁর সে তাকানোর অর্থ হচ্ছে পড়া না-শিখে আমার ক্লাসে আসা—হুঁ হুঁ, এবার দেখ কত ধানে কত চাল...। তারপরেই ডান হাতে খপ করে তার কান চেপে ধরতেন। হ্যাঁ, কাচের গুঁড়োয় মাঞ্জা দেওয়া সেই বিখ্যাত খরখরে হাতের মোচড়ানি। কানের গোড়াসুদ্ধ গরম হয়ে ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকত। স্যারের কানমলার পর্যায় ছিল দুটো। প্রথম পর্যায়ে কানসুদ্ধ মাথাটাকে হ্যাঁচকা টানে নিজের দিকে টেনে নিতেন তিনি। আর তারপরই দ্বিতীয় পর্যায়। এক ধাক্কায় কান-মাথাসুদ্ধ ছাত্রটাকে সোজা পাঠিয়ে দিতেন তার বেঞ্চের নির্দিষ্ট সিটে। সেদিনও ঘটল একই ব্যাপার। উত্তর ভুল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্যারের ব্যতিক্রমহীন আহ্বান শোনা গেল :

চ্লা আও, চ্লা আও!

বাঘের চোখের দিকে সম্মোহিত মানুষের মতো পায়ে পায়ে এগিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভয়ে আমার সারা শরীর পুরো অসাড় হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এক্ষুনি খপ করে আমার কানটাকে প্রথমে ধরে ফেলবেন তিনি, তারপর হ্যাঁচকা টানে কান-মাথাসুদ্ধ আমাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কায় পাঠিয়ে দেবেন নিজের সিটে। কিন্তু একি? তেমন কিছুই ঘটছে না যে! বরং একেবারে উল্টো ব্যাপার। আমার কানের ওপর হাত পড়তেই খুশিতে স্যারের জিভটা যেন পানিতে ভরে উঠল, যেন অভাবিত কোনো খাবার দেখেছেন সামনে। গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে গড়গড় শব্দ হল যেন গলা থেকে।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

'বাহ্ তোর কানদুটো তো বেশ বড় রে!'

আলতোভাবে কানদুটো নেড়েচেড়েও দেখলেন কিছুক্ষণ।

'বাহ্ বেশ নরমও তো রে!'

স্যারের খুশির সুবাদে আজকের শাস্তিটা মাফও পেয়ে যেতে পারি—এমন ভাবনা মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল বার কয়েক। কিন্তু কী ভাবনা আর কী ঘটনা। মুহূর্তে সেই মাঞ্জা দেওয়া খরখরে হাত বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠল কানের ওপর। আর তারপরে সেই অতিপরিচিত দৃশ্যকাব্য—কান-মাথাসুদ্ধ নিজের সিটে আমার প্রত্যাবর্তন। গোড়াসুদ্ধ সারাটা কান তখন যন্ত্রণায় চিঁচিঁ করছে।

সেদিন থেকে স্যার আমার কানের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে গেলেন। জোড়া-বেতের বিদ্যুৎ ঝলকের নির্মম শাস্তি আমার জন্য প্রায় মাফই করে দিলেন তিনি। পরিবর্তে আমার বড় আর নরম কানদুটোকে মধ্যাহ্নফলার হিসেবে ব্যবহার শুরু করলেন। পড়াশোনার ব্যাপারে ছাত্রদের কোনো ভুল হলে সে-সব ভুলের ভিতসুদ্ধ উৎপাটন করতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। শিক্ষক হিসেবে এটা ছিল তাঁর জাতীয় দায়িত্ব। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলাম আমার কানের ব্যাপারে স্যারের আকর্ষণ ভক্তি থেকে ক্রমে লোভে পরিণত হচ্ছে। আগে উত্তর ভুল হলেই কেবল কানের আদর-আপ্যায়ন জুটত, এখন শুদ্ধ হলেও তা জুটে চলেছে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

'বল তো, ফ্রান্সের রাজধানীর নাম কী?'

'প্যারিস স্যার!'

'হ্না...ও! হ্না ... ও!'

ভুলে-শুদ্ধে পার্থক্য নেই।

স্যারের একাগ্র আদর-আপ্যায়নে আমার কান প্রথমদিকে নেহাতই লাল হত, পরে লম্বা হতে শুরু করল। একসময় একেবারে বিলুপ্তির পথে গিয়ে দাঁড়াল। এই দুর্দৈবের হাত থেকে কী করে কান বাঁচানো যায়। চিন্তায় আমার কপাল মেঘলা হয়ে উঠল।

ভাবতে ভাবতে মোক্ষম বুদ্ধিও বেরিয়ে গেল একটা। সব যুগেই 'লক্ষ্মী ছেলে' বলে একধরনের গোবেচারি ভালো ছেলে থাকে—পরিপাটি কাপড়চোপড়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা নিরপরাধ একজাতের ভদ্র আর সুশীল ছেলে। 'এমনি লক্ষ্মী' ছেলে সেজে একদিন সোজা স্কুলে গিয়ে হাজির হলাম। বিস্তর নারকেল তেল দিয়ে মাথার চুল জ্যাবজেবে করে ভিজিয়ে আগেই নিরীহ ভঙ্গিতে আঁচড়ে নিয়েছিলাম। স্কুলে এসে চুল ছাপিয়ে উপচে-পড়া তেলে দুপাশের কানদুটোকে ভিজিয়ে ভালোভাবে পিছল করে নিলাম। আমার আজন্ম নির্বুদ্ধিতা দিয়ে কেন যেন ধরেই নিয়েছিলাম যে কান পাকড়ে স্যার যখন হ্যাঁচকা টান মারবেন তখন তাঁর হাতটা আমার কান থেকে পিছলে বেরিয়ে যাবে আর আমি ঐদিনের মতো বেঁচে যাব। কান মোচড়াতে গিয়ে স্যারের অপ্রতিভ ও হাস্যকর অবস্থাটা ভেবে

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

একচোট হেসেও নিয়েছিলাম মনে মনে। কিন্তু ব্যাপারটা যে কত অচিন্তিত রাস্তায় মোড় নিতে পারে সেটা টের পেলাম পরবর্তী ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে। স্যারের প্রশ্ন কানে এল :

'বল তো রে ইংল্যান্ডের রাজধানী কী?'

'লন্ডন স্যার।'

'চ্যা ... ও! চ্যা... ও'!

মুখে বিজয়ীর হাসি নিয়ে স্যারের সামনে গিয়ে বুক টান করে দাঁড়ালাম। ভাবটা এমন, তেলে ভিজিয়ে কান জ্যাবজেবে করে এসেছি স্যার, হাত দিয়েই দেখুন না, বুঝবেন কী গ্যাঁড়াকলে পড়েছেন। সবার সামনে কী অসম্মান হয় দেখবেন। তেল দিয়ে কান পিছল করে আসার ব্যাপারটা এরই মধ্যে ছাত্রদের ভেতর চাউর হয়ে গিয়েছিল। সবাই দম বন্ধ করে নাটকের শেষদৃশ্যের জন্য অপেক্ষা করছে। স্যার খপ করে আমার কানটা ধরেই দিলেন সেই বিখ্যাত হ্যাঁচকা টান। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রত্যাশিত দৃশ্য! স্যারের হাত আমার কান থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল হাত কয়েক দূরে। ছাত্রদের চাপা খুশির রোল বিদ্রূপ হয়ে স্যারকে উপহাস করতে লাগল।

অপ্রত্যাশিত ঘটনায় স্যার কিছুক্ষণের জন্য হঠাৎ বোকা হয়ে গেলেন। কিন্তু মুহূর্তে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবকিছু বুঝে নিয়ে সুস্থির হয়ে বসলেন। হঠাৎ তাঁর ভয়ংকর গলার আওয়াজ শোনা গেল : 'এদিকে আয়।' এবারে আর সেই পরিচিত চ্যাও চ্যাও নয়। দুরুদুরু বুকে স্যারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সারাটা ক্লাস উত্তেজনায় থমথম করছে। কিন্তু আশ্চর্য, স্যারের চেহারায় ভাবান্তর নেই। পুরোপুরি শান্ত আর নির্লিপ্ত তিনি, যেন অবাঞ্ছিত ঘটে নি কিছু কোথাও। কাছে যেতেই মাথাটা টেনে নিয়ে বাঁ কানটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আগাগোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে নিলেন অনেকক্ষণ। তারপর বড় একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'হুঁ'। ভাবলাম ফাঁড়া কেটে গেল। স্যারকেও দেখে মনে হল কিছু করার আগ্রহ চলে গেছে যেন তাঁর। বেশ কিছুক্ষণ দম নিলেন তিনি। তারপর শান্ত ভঙ্গিতে যেন কিছুই করছেন না এভাবে পকেটে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে একটা পরিষ্কার রুমাল বের করে স্যার যা করলেন তা আমার জন্য রীতিমতো সম্মানজনকই বলা যায়। আমার কানটা কাছে টেনে নিয়ে রুমাল দিয়ে নিবিষ্টভাবে আগাপাশতলা পরম যত্নে পরিষ্কার করতে শুরু করলেন। কান পরিষ্কার শেষ হলে ধীরে ধীরে শুরু হল তাঁর পরিচ্ছন্নতা অভিযানের দ্বিতীয় পর্ব। রুমাল দিয়ে আস্তে আস্তে নিজের হাতের যেখানে যেটুকু তেল ছিল নিঃশেষে মুছে নিলেন। ক্লাসের ছাত্ররা রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছে। সব মোছা শেষ হলে সুস্থির হয়ে আবার খানিকটা দম নিলেন স্যার। তারপর আচমকা খপ করে বিশাল শক্ত হাতে আমার কানটা ধরে বসলেন। হ্যাঁ, সমস্ত জ্বালা অপমানের প্রতিশোধের আবেগ নিয়ে ধরা। ধরা নয় তো 'উৎপাটন'। মনে হল কানের চামড়া চিরতরে উঠে গেছে। প্রথমে হ্যাঁচকা টানে কানসুদ্ধ আমাকে তাঁর দিকে নিয়ে নিলেন

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তিনি। তারপর এক ধাক্কায় আমাকে নিজের সিটে পাঠিয়ে দিলেন মনের সুখে। আমার ধারণা কানমলার ব্যাপারে ওটাই স্যারের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রেকর্ড।"

ছাত্রদের কাছে তিনি যে-কারণে মূর্তিমান বিভীষিকা ছিলেন সেই কারণেই অভিভাবকদের কাছে তিনি ছিলেন তাদের সন্তানদের উজ্জ্বল উদ্ধার। সন্তানদের পড়াশোনার দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিতে পারলে প্রায় সব অভিভাবকই নিজেকে ভারমুক্ত এবং সৌভাগ্যবান মনে করতেন। ছেলেদের গৃহশিক্ষক হিসেবে তাঁকে পাবার জন্যে অভিভাবক-মহলে টানাহ্যাঁচড়া চলত।

যে বিশেষ যোগ্যতার জন্য তাঁর হাতে ছাত্রদের উন্নতি এ-রকম নিশ্চিত হত তা অভিভাবকদের অজানা ছিল তা নয়, কিন্তু সেকালের শিক্ষকদের মতো অভিভাবকেরাও পড়াশোনার স্বার্থে ছাত্রদের পিটিয়ে মানুষ করাকে মোটামুটি অভিনন্দনই জানাতেন। সেকালের ভারতীয়রা যে-শিক্ষার আদর্শকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভেবে স্বস্তিবোধ করত সেই বিলেতি শিক্ষানীতিতেও বেতের একটা অতি উঁচু ও মর্যাদাবান জায়গা ছিল। Spare the rod, spoil the child—বেতানো বন্ধ করলে ছাত্র বখে যায়—ইংল্যান্ডের শিক্ষাপদ্ধতির নীতিনির্ধারকেরা এই আদর্শকে প্রায় ধর্মীয় নিষ্ঠার সঙ্গে সেকালে বিশ্বাস করতেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

হঠাৎ একদিন দেখি প্রাণকৃষ্ণ স্যার আমাদের তিন ভাই বোনের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। প্রত্যেক সন্ধ্যায় বাসায় এসে পড়াবেন আমাদের। আমার বিলুপ্ত-প্রায় কানের শেষ চিহ্নটুকু তখনো কোনোমতে টিকে ছিল। এই খবরে আমি সেগুলোর সম্পূর্ণ বিলুপ্তির ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে পড়লাম। আমরা তিন সন্ত্রস্ত ভাইবোন দু-তিনদিন গভীর ও নিরুপায় শলা-পরামর্শের পর একদিন মাথা নিচু করে আব্বার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। আব্বা আমাদের দেখেই ধ্যানসিদ্ধ দধীচি মুনির মতো আমাদের আসার কারণ টের পেয়ে গেলেন। এত সাধ্যসাধনা করে আমাদের পড়ানোর জন্যে যে গৃহশিক্ষককে রাজি করানো গেছে সেই শিক্ষকের কাছে পড়তে আপত্তির কী কারণ যে থাকতে পারে আব্বাকে তা বোঝানোই গেল না। আমরা সারাক্ষণ মেঁও মেঁও করে তাঁকে আমাদের ক্ষুব্ধ হতাশা আর অননুমোদন জানিয়ে যেতে লাগলাম। মৃদু হেসে তামাশা করে বললেন, 'অসুবিধা, তাই না?' আসল ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যাওয়ায় আমরা শুকনো মুখে ফিরে এলাম।

স্কুলে স্যারের কাছ থেকে দৈনন্দিন যে আদর-আপ্যায়ন জুটছিল তার সঙ্গে বাসার যোগ হওয়ায় পরিমাণে তা সহনীয়তার বাইরে চলে গেল। আমার তিন সন্ত্রস্ত ভাইবোন সন্ধ্যার পর স্যারের আসার সেই মর্মান্তিক সময়টার জন্য সারাদিন উৎকণ্ঠিত আর বিমর্ষভাবে অপেক্ষা করতে থাকতাম।

ঠিক সন্ধ্যা আটটায় স্যার আসতেন। কলেজের ভেতরকার রাস্তাটা যেখানে অধ্যক্ষের বাসার দিকে আসতে গিয়ে মূল ভবন দুটোর মাঝের জায়গাটা অতিক্রম

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

করেছে, সেখানে প্রতিদিন ঠিক সন্ধ্যা আটটায় স্যারের সাইকেলের ছোট্ট হারিকেন-বাতিটা দেখা দিয়েই অনিবার্য নিয়তির মতো আমাদের বাসার দিকে এগিয়ে আসতে থাকত।

সন্ধ্যা সাতটা বাজার পর পরই আমরা তিন ভাইবোন এক এক করে বাসার সামনের বিশাল সিঁড়িটার ওপর চুপচাপ বসে যেতাম। আমরা কেউ কাউকে কিছু বলতাম না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে জানতাম আমাদের তিনজনের মনে তখন একই দুরাশা : কোনো কারণে কলেজের দুই প্রধান দালানের মাঝখানকার অন্ধকার রাস্তার ওপর স্যারের সাইকেলের ছোট্ট লাল হারিকেন-বাতিটা যদি আজ দেখা না দিত, যদি আজ স্যার না আসতেন। সন্ধ্যা নয়, সকাল থেকেই এই দুরাশায় আমরা বিষণ্ণ আর অসাড় হয়ে থাকতাম। আমাদের বুক টিপটিপ করতে থাকত। কিন্তু কিছুতেই স্যারের সেই অমোঘ নিয়মের ব্যতিক্রম হত না। ঘড়ির কাঁটা সন্ধ্যা আটটায় গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে স্যারের সাইকেলের লালচে গোল বাতিটা, সমস্ত দুর্যোগ দুর্ঘটনা উপেক্ষা করে, ব্যতিক্রমহীনভাবে নির্ধারিত জায়গায় দেখা দিয়েই আমাদের বাসার দিকে এগিয়ে আসত। হতাশায় দুঃখে আমরা সিঁড়ির ওপর নিজের নিজের জায়গায় নিঃসাড় হয়ে শুয়ে পড়তাম।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

প্রাণকৃষ্ণ স্যার বেশ কৃপণ ছিলেন। স্যারের ছোটছেলেটা আমাদের সাথে পড়ত, পয়সার অভাবে একটানা দশ মাস ও চুল কাটত না। স্যার নাকি চুল কাটার পয়সা দিতেন না। চুল লম্বা হয়ে একসময় মেয়েদের মতো মাথার চারপাশে ঝুলে পড়লে হঠাৎ একদিন দেখতাম বাটি-ছাঁট হয়ে স্কুলে এসেছে। স্যার নিজ হাতে কাঁচি দিয়ে মাথার সব চুল ছেটে ফেলে ক্ষুর দিয়ে চারপাশ বাটির আদলে চেঁছে দিয়েছেন।

এই সময় স্যারের বয়স হয়েছিল সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ। স্যারের বেশকিছু বিবাহযোগ্য মেয়ে ছিল— চেহারা ভাল নয়, তাই বিয়ে হচ্ছিল না। এদের বিয়ের জন্য উদয়াস্ত ছাত্র পড়িয়ে, পৌঢ় শরীরে বিশ্রামহীনভাবে খেটে স্যারকে পয়সা জমাতে হত। হয়ত তাঁর কৃপণতার এটা ছিল মূল কারণ। উপচে-ওঠা বিরাট সংসারের ঝক্কি, আর্থিক চাপ, অনবরত দুশ্চিন্তা তাঁর মনকে জীবনের ব্যাপারে বিষিয়ে তুলেছিল। স্যারের জীবনের সেইসব তিক্ততা নৈরাশ্য বিরক্তি আর আত্মহননের ভাগ আমাদের হয়ত এসব নির্যাতনের আকারে পেতে হত। তবু একেক সময় মনে হয় পৃথিবীতে সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ বছরে যাদেরই বেশকিছু বিবাহযোগ্য মেয়ে থাকে, আর্থিক চাপ আর দুশ্চিন্তা মনকে বিষিয়ে রাখে, তাঁদের হাতেই কি কিশোর-কিশোরীরা এমনি নির্যাতন পায়!

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

মৌলভি সাহেব

ষষ্ঠ শ্রেণীতে থাকতেই ধর্ম, সৃষ্টিকর্তা, পাপ-পুণ্য, মানুষের দায়িত্ব, কবরের আজাব এসব নিয়ে মনের ভেতর নানান রকম প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। প্রশ্নগুলো কিছুটা আরজ আলী মাতুব্বরের ধাঁচের। যেহেতু নতুন কোনো ধর্মপ্রবর্তক হবার পরিকল্পনা ছিল না, তাই আমার ঐসব মনের কথা মনের ভেতরে রেখে দিলেই হয়ত ভালো হত, কিন্তু এতসব অসাধারণ দার্শনিক তত্ত্ব-ভাবনার গুরুভার মাথা নিয়ে একজন কিশোরের পক্ষে একা একা ঘুরে বেড়ানো কী করে সম্ভব। অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার পর ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েই মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করল। সময়টা আমার জন্য সুসময় ছিল না। তখন সদ্য পাকিস্তান হয়েছে, চারপাশে মুসলিম লীগের অকর্ষিত কঠোর সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া, যে-কোনো মুক্তচিন্তা তখন ক্ষমাহীন অপরাধ। এমনি সময়ে স্কুলের এক বন্ধুর কাছে একদিন বলেই ফেললাম মনের ঐসব কিছু উল্টোপাল্টা কথা। বলেই ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম। যদি স্কুলের মওলানা সাহেবের কাছে বলে দেয়, তা হলে? আমি বন্ধুকে কাকুতি মিনতি করলাম যেন কথাগুলো কাউকে না বলে। আমার পয়সায় জামরুল আর চটপটি খেয়ে ও পুরো আশ্বাস দিল ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানাবে না। আমি যেন অযথা ভয় না পাই। আশ্বস্ত হয়ে বাসায় ফিরলাম।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পরদিন ক্লাসে ঘটল হতবাক করার মতো ঘটনা। আমি বন্ধুকে গতকাল যা-যা বলেছিলাম ঠিক সেই কথাগুলো উদ্ধৃত করে মওলানা সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কথাগুলো সেই বন্ধুকে বলেছি কিনা। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে বন্ধু এগিয়ে এসে মওলানা সাহেবকে বলল : 'বলেছে হুজুর, সবগুলো কথাই বলেছে।' মওলানা সাহেব আগে থেকেই রাগে আক্রোশে প্রায় অসুস্থ হয়ে ছিলেন, বন্ধুর কথা শেষ হতেই টেবিলের উপর থেকে লম্বা লিকলিকে বেতটা তুলে নিয়ে বিকৃত মস্তিস্কের মতো আমার মাথার দুপাশে বিশেষ করে দুই কানের ওপর শপাং শপাং করে এলোপাতাড়িভাবে পেটাতে শুরু করলেন। তাঁর বীভৎস হিংস্র মুখটাকে একেকবার পানির ভেতরকার গোল চোখওয়ালা সামুদ্রিক দৈত্যের মতো মনে হতে লাগল। যন্ত্রণায় আতঙ্কে মনে হল তিনি হয়ত আমাকে মেরে ফেলবেন। আমার দুই কান ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেতে লাগল। শরীর নেতিয়ে চোখ অন্ধকার হয়ে এল। এমন সময়, হঠাৎ যেন আচমকা সম্বিত পেয়েছেন এভাবে মওলানা সাহেব অবশ শরীরে ধপ করে চেয়ারে বসে হতভম্ব ভীত দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ক্লাসের ছাত্রেরা নিশ্বাস বন্ধ করে এই অমানবিক বীভৎসতা দেখে গেল।

এই ঘটনার জের আমার এবং মওলানা সাহেব দুজনেরই জন্য হল মর্মান্তিক। তখনও এন্টিবায়োটিকের যুগ আসেনি। এ-ধরনের মারাত্মক আঘাতের চিকিৎসা ছিলই না বলতে গেলে। প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকে কেটে গেল আমার কয়েকদিন। বিমর্ষ-মুখ ডাক্তারদের উৎকণ্ঠিত আনাগোনা চলতে লাগল বাসায়।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

জখম শুকিয়ে ভালো হয়ে উঠতে সপ্তাহ দুয়েক লাগল। কিন্তু মৌলভি সাহেবের অবস্থা হল আরো শোচনীয়। আমার মস্তিষ্ক বা কর্ণেন্দ্রিয়ের গুরুতর ক্ষতি না হওয়ায় উনি আইনের হাত থেকে বেঁচে গেলেন, কিন্তু রেহাই পেলেন না স্কুল কমিটির কর্তাদের হাত থেকে। নানা মানবিক দিক বিবেচনা করে স্কুল কমিটি মৌলভি সাহেবকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন না কিন্তু তাঁকে সবার সামনে ডেকে অপদস্থ করলেন এবং শিক্ষকতার জন্য অনুপযুক্ত বিবেচনা করে তাঁকে স্কুলের হিসাবের কাজে নিয়োগ করে দিলেন। অসুস্থ বিছানায় এই খবর জাতীয় বাহিনীর যুদ্ধজয়ের সংবাদের মতো আমার কাছে এসে পৌছল।

আজ পেছনের দিকে তাকিয়ে ঘটনাটা উল্টেপাল্টে দেখার সময় মৌলভি সাহেবের অপরাধটা সেদিনের মতো বড় বলে মনে হয় না। জানি না, ঘা শুকিয়ে যন্ত্রণার স্মৃতি মন থেকে মুছে যাওয়াতেই অমন মনে হয় কিনা! সন্দেহ নেই তাঁর আক্রোশটা ছিল ভয়াবহ। এমনিতেই তিনি একটু রুক্ষ এবং অমার্জিত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর হৃদয়ের নিষ্ঠুরতার ছাপ তাঁর চেহারার ওপর কঠোর রেখায় আঁকা ছিল। তাঁর অবিসংবাদিত ধর্মবিশ্বাসের ওপর অসহনীয় আঘাত হয়ত তাঁকে দিগ্বিদিক শূন্য করে ফেলেছিল। হয়ত আমাকে পুরোপুরি খতম করে দেওয়ার কথাই মনে হয়েছিল তাঁর কিংবা হয়ত অন্য কিছু। তবু মনে হয় সে-কষ্ট যত বেশিই হোক, তাই বলে এই নির্মমতা, এমন অসুস্থ, ক্রুদ্ধ উন্মত্ততা!

www.amrajaraboipori.wordpress.com

মৌলভি সাহেবের সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়েছিল এই ঘটনার প্রায় বছর এগার পর, ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজে। তখন আমি ঐ কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বে। একদিন অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম সেই মৌলভি সাহেব আমার সামনে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কথা থেকে বুঝলাম কলেজের স্কুল শাখায় মৌলভি পদে যোগদানের জন্যে অন্য কোনো স্কুল থেকে বদলি হয়ে এসেছেন তিনি। বোঝা গেল রাধানগর মজুমদার একাডেমি ছেড়ে কোনো এক সময়ে তিনি সরকারি স্কুলে ঢুকেছিলেন, এবং বদলি সুবাদেই এই কলেজের স্কুল বিভাগে যোগদানের জন্যে আসা। তাঁকে অনেকদিন পরে দেখলেও আমার আপদমস্তক এক মুহূর্তেই তাঁকে চিনে ফেলল। কিন্তু তিনি আমাকে চিনতে পারলেন না। কত ছাত্রই তো আমাদের শিক্ষকদের জীবনে আসে, কত ঘটনাই তো ঘটে। কটা মুখকেই বা আমরা শেষপর্যন্ত মনে রাখতে পারি। তাছাড়া এই বারো বছরে তো আমি পুরোপুরিই বদলে গেছি। হাফপ্যান্ট-পরা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থেকে এক লাফে অধ্যক্ষ। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে! কী করে চেনা সম্ভব! মৌলভি স্যারও কিছুটা বদলে গেছেন। চুলের ঈষৎ পক্বতার পাশাপাশি সারা অবয়বে প্রৌঢ়ত্বের ছোঁয়া লেগেছে তাঁর, এমনকি মুখের কঠোর ভঙ্গিটিও আগের চেয়ে অনেক নমনীয় হয়ে এসেছে। কিন্তু আমি অদ্ভুতভাবে লক্ষ করলাম স্যারকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে এগার বছর আগের আমার ভেতরকার সেই অভিমান-ক্ষুব্ধ ক্ষতবিক্ষত

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কিশোরটি ঠোঁট ফুলিয়ে তেড়িয়া হয়ে উঠল। আমি স্যারকে আমার পরিচয় দিলাম না, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম না, স্যার বলে সম্বোধন করলাম না—যা শিক্ষকদের বেলায় সারাজীবন আমি করেছি। উপরন্তু যতবার উনি আমাকে 'স্যার স্যার' বলে সম্বোধন করলেন ততবারই তা আমি পৈশাচিক পরিতৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করলাম। ব্যাপারটাকে আমার কাছে ন্যায়সঙ্গত প্রাকৃতিক প্রতিশোধ বলে মনে হতে লাগল।

এরপর যতদিন আমি ঐ কলেজে ছিলাম ততদিন কাজে-অকাজে আমি তাঁকে আমার কাছে ডেকে পাঠিয়েছি এবং তাঁর অনুগত কণ্ঠের স্যার সম্বোধনকে আকণ্ঠ তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করেছি। সেদিন দেখা না হয়ে আজ যদি স্যারের সঙ্গে আমার দেখা হত তবে তাঁর সঙ্গে আমি হয়ত অন্যরকম আচরণ করতাম। আমার এই অশালীন আচরণকে মানবিক বলে আমি কাউকে প্রশংসা করতে বলব না, আবার একে একজন তীব্র ক্ষিপ্ত যুবকের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে অনুশোচনাও করব না। ভালো-মন্দের বাইরে এটা ছিল সেদিনকার আমার ভেতরের রক্তমাংসময় যুবকটি স্বাভাবিক আচরণ।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এইখানেই যৌবনকে আমাদের লাল সালাম। যৌবন এখানেই আমাদের পৌঢ়ত্বের চেয়ে বড়। যৌবন হিংস্র এবং নিষ্ঠুর, মূঢ় এবং বেদনাময়, উদ্ধত ও আত্মধ্বংসী। যৌবন প্রেমিক, ভিখারি, অসহায়, উন্মাদ। 'Mad as love, mad as first love and wild will all regret.' —প্রেমের মতো মাতাল, প্রথম প্রেমের মতো মাতাল এবং সমস্ত যন্ত্রণা নিয়েও এই দ্বন্দ্ব-ব্যথিত অসহায় পৃথিবীর সুন্দরতম উপহার।

তবে একটা ব্যাপার আমার কাছে এখনো অবোধ্য হয়ে রয়েছে, সেটা হল : কি প্রাণকৃষ্ণ বাবু কি মৌলভি সাহেব দুজনেই কেন আমার এই নিরীহ আর বেচারি কানদুটোকে তাঁদের রক্তিম প্রণয়ের লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পরিশিষ্ট-২

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা

এই পৃষ্ঠাগুলোতে আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সেই উজ্জ্বল শিক্ষকদের গল্প বলব, যাঁরা মতৈক্য ও মতানৈক্যের পথে আমাকে প্রভাবিত করেছেন এবং আজও আমার অস্তিত্বের গভীরে কোথাও–না–কোথাও বেঁচে রয়েছেন। তাঁদের কথা ভাবতে গিয়ে এই মুহূর্তে একটা জিনিশ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করছি যে, যে–ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের তুলিতে আমি আমার স্কুল ও কলেজ জীবনের শিক্ষকদের ছবি এঁকেছি, এঁদের বেলায় তা কিছুতেই পেরে উঠছি না। এঁদের কথা ভাবতে গিয়ে থেকে–থেকেই আমি কিছুটা সজাগ, সচেতন ও বুদ্ধিনির্ভর হয়ে পড়ছি এবং বিচার–বিশ্লেষণ করে তাঁদের দোষগুণ ভালোমন্দ যাচিয়ে দেখতে চাচ্ছি। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। স্কুল আর কলেজের শিক্ষকদের আমি দেখেছিলাম আমার শৈশব ও কৈশোরের সুন্দর অনুভূতিময় ও বিশ্বাস–সজীব দিনগুলোয়। খুঁটিয়ে, খতিয়ে, খাদ–অখাদের চতুর দাঁড়িপাল্লায় মাপজোঁক করে জীবনের হিসাব নেওয়া ঐ বয়সে কঠিন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আমি দেখেছিলাম আরও পরে, আমার প্রথম–যৌবনে, আমার ভেতরকার চিন্তাজগৎ বিকশিত হবার দিনগুলোতে।

তিন ধরনের শিক্ষককে এই অধ্যায়ে আমি তুলে ধরেছি। এক. যাঁদের দিকে আমি তাকিয়েছিলাম পুরোপুরি শ্রদ্ধা–ভরা চোখে ; দুই. যাঁদেরকে ভালোবেসেছিলাম কিন্তু যাঁদের ভুল এবং পতন আমাকে কষ্ট দিয়েছিল ; তিন. অগ্রহণযোগ্য হলেও যাদের শক্তি ও দীপ্তি আমি অস্বীকার করতে পারিনি। এঁদের মধ্যে কয়েকজন আছেন যাঁরা আমার শিক্ষক ছিলেন না, কিন্তু আমার অন্তর্জগৎকে প্রভাবিত করেছিলেন শিক্ষকের মতো।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

মুনীর চৌধুরী

বাগেরহাট কলেজ ছাড়ার দেড় বছরের মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীকে ব্যক্তিগতভাবে দেখার ও তাঁর সান্নিধ্যে আসার আমার সুযোগ হয়। ভালো শিক্ষক এবং সেকালের প্রগতিশীল কমিউনিস্ট-কর্মী হিশেবে তিনি তখন কেবল ঢাকায় নয়, ঢাকার বাইরেও পরিচিত। সুদূর পাবনা ও বাগেরহাটে থাকতেও অনেকের কথাবার্তার ভেতর আমরা তাঁর ও তাঁর আপোষহীন রাজনৈতিক ভূমিকা এবং তাঁর বোন নাদেরা চৌধুরীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও দুর্ধর্ষ এবং বিস্ময়কর কার্যকলাপের কথা শুনে রক্তে চঞ্চলতা অনুভব করেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই তাঁকে শিক্ষক হিশেবে আমি পাইনি, তিনি তখন উচ্চশিক্ষা উপলক্ষে আমেরিকায় ছিলেন। শুনেছিলাম, দেড়-দুই বছর পরে তিনি ফিরবেন । দিনের পর দিন সেই কিংবদন্তিসুলভ মানুষটির জন্যে প্রতীক্ষা করে একসময় তাঁকে দেখার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।

হঠাৎ একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শুনলাম দিন-দুয়েক আগে তিনি বিদেশ থেকে ফিরেছেন এবং কিছুক্ষণ আগে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা গেছে। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের মধ্যে অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলাম। কেবল শিক্ষক হিশেবে নয়; নাট্যকার, বক্তা এবং বাম-রাজনীতির নিরাপোষ প্রতিনিধি হিশেবে যে মুনীর চৌধুরী অনেক আগে থেকেই তরুণ সম্প্রদায়ের চোখে বিস্ময় জাগিয়েছেন, কল্পনার সেই অসম্ভব নায়ক হঠাৎই এত কাছে এসে গেছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাব, এ যেন বিশ্বাসেরও বাইরে। শুনলাম শিক্ষকদের কক্ষে আছেন তিনি। ছাত্র হয়ে সেখানে হুট করে চলে যাওয়াটা সৌজন্যসম্মত নয়, কিন্তু ভেতরের উথালপাথাল তাড়নায় নিজেকে ঠেকিয়েও রাখতে পারছিলাম না। অস্থির পায়ে ঘরটার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আমার চেনা একমাত্র আনিসুজ্জামান স্যারকে চোখে পড়ল, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছেন তিনি। আনিসুজ্জামান স্যার আমাকে স্নেহ করতেন, দরোজায় আমাকে দেখতে পেয়ে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। জানতে চাইলেন কাউকে খুঁজছি কিনা।

জিজ্ঞেস করতে যাব মুনীর চৌধুরী কোথায় আছেন, এমনি সময়ে নিজেই তিনি বলে উঠলেন— 'ওহ্ হো, পরিচয় করিয়ে দিই, আমাদের সেকেন্ড ইয়ার অনার্সের ছাত্র আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, সাহিত্যে উৎসাহী; আর ইনি মুনীর চৌধুরী, নিশ্চয়ই নাম শুনেছেন, আমাদের বিভাগের অধ্যাপক, পরশু আমেরিকা থেকে ফিরেছেন।' হয়ত বয়সের নৈকট্যের কারণেই আনিসুজ্জামান স্যার সবসময় আমাকে আপনি বলতেন, আজও বলেন। যেন আমার যাবতীয় গুণপনা সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছে এমনি অভিনন্দনসূচক ভঙ্গিতে মুনীর

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

চৌধুরী বার দুই-তিন দীর্ঘ করে মাথা ঝোঁকালেন। চোখের কোণে সামান্য হাসি। একটা চেয়ারে বসেছিলেন তিনি আয়েশি ভঙ্গিতে। যেমন ছিলেন, তেমনি রইলেন। ভেতরকার কোনো বিশেষ উৎসাহে উদ্দীপ্ত হলেন না। তাঁর চোখ বা অস্তিত্বও কোনো দীপ্র চঞ্চলতায় কেঁপে উঠল না। তাঁর সম্বন্ধে এতদিন মনে মনে আমি যে-উজ্জ্বল ছবি এঁকে রেখেছিলাম তাঁর এই অপ্রদীপ্ত আয়েশি চেহারা তাঁকে আমার চোখে সেই তুলনায় যেন একেবারেই নিষ্প্রভ করে দিল। সত্যি কথা বলতে কি, আনিসুজ্জামান স্যারের পাশের চেয়ারে যিনি বসেছিলেন তিনি-যে সেই কিংবদন্তির নায়ক মুনীর চৌধুরী এটা আমার যেন বিশ্বাস হতেই কষ্ট হল। দীর্ঘদেহী, কালো, ঈষৎ মেদপ্রবণ শরীরের মানুষটার মধ্যে অনন্যতার কোনো স্পর্শই আমার চোখে পড়ল না। আমি যেন আরও উদ্যত ও প্রজ্বলিত একজন মানুষকে দেখার জন্য সেদিন শিক্ষকদের কক্ষে ছুটে গিয়েছিলাম, তার জায়গায় যেন অন্য একজন মানুষকে দেখে ফিরে এলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই বুঝেছিলাম যে-মানুষটির প্রত্যাশা নিয়ে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, তাঁকে কেন সেদিন আর তাঁর ভেতর পাওয়া সম্ভব ছিল না। বছরখানেক ধরেই নানাজনের মুখে ছিটেফোঁটাভাবে শুনে আসছিলাম মুনীর চৌধুরী আর আগের সেই মুনীর চৌধুরী নেই। জীবন আর সংসারের মোহে দাসখত দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসে চাকরি আর শিক্ষকতার প্রচলিত পথ বেছে নিয়েছেন তিনি। জীবনের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে আপোষ করে নিয়েছেন। এই আপোষ যে তাঁকে কতটা নীরক্ত করে দিয়েছে তাঁকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম সেদিন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট রাজনীতির জন্য প্রথম গ্রেফতার হন তিনি। তখন তিনি খুলনার দৌলতপুর কলেজের ইংরেজির তরুণ অধ্যাপক। বছরখানেক পর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যোগ দেন জগন্নাথ কলেজে। কিছুদিনের মধ্যেই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেওয়ায় আবার জেলে যেতে হয়। জেল থেকে বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণী পেয়ে পাস করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই ৯২ক ধারা জারি হলে আবার জেলে যান। এভাবে বারবার জেলে যাওয়া ধীরে ধীরে তাঁর মনোবলকে দুর্বল ও বিস্রস্ত করে ফেলে। রাজনৈতিক মানুষেরা জন্মগতভাবেই তৈরি থাকে যুদ্ধের জন্যে, কষ্ট আর নিষ্পেষণের জন্যে। এরা যোদ্ধা। শত্রুর উৎখাত এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বে বাস্তবভাবে তারা নিয়োজিত। শক্ত শরীর আর স্নায়ুর মানুষ তাঁরা। কিন্তু সাংস্কৃতিক মানুষেরা তো তা নয়। মুনীর চৌধুরী ছিলেন আপাদমস্তক সুসভ্য সংস্কৃতিবান মানুষ—বৈদগ্ধ্যময়, স্পর্শকাতর, অনুভূতিশীল হৃদয়বান ও মানবিক। তরুণ বয়সে স্বপ্নতাড়িত হয়ে তিনি যোগ দিয়েছিলেন বিপ্লবী

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

রাজনীতিতে—মানুষী সাম্যে ভরা এক সুখী আর ভেদাভেদহীন পৃথিবীর স্বপ্নের আকুতি নিয়ে। কিন্তু সহজাতভাবে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন না, ছিলেন ব্রাহ্মণ। অনিশ্চয়তার ও দৈহিক-মানসিক নির্যাতন ও নিঃসঙ্গতার এই ক্লিষ্ট জীবন তাই ছিল তাঁর পক্ষে দুর্বহ, অসহ। এই কষ্ট বেশিদিন বয়ে বেড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ফলে একসময় বন্ড দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, অনেকদিনের বিপ্লবী বামপন্থী রাজনৈতিক জীবনকে বিদায় জানিয়ে উচ্চশিক্ষা আর গড়পড়তা জীবনের সন্ধানে তাঁর প্রগতিশীল চেতনার চিরশত্রু সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার দেশ আমেরিকার পথে পাড়ি জমিয়েছিলেন। এমনিভাবে সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণে একজন আটপৌরে মানুষের প্রতিকৃতিই হয়ত সেদিন দেখতে পেয়েছিলাম তাঁর চেহারায়। আমার কল্পনার সেই প্রদীপ্ত ও প্রখর মানুষটি সেদিন তিনি আর নন। এরপর লেখালেখি আর একাডেমিক পড়াশোনায় নিমগ্ন হবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু কোনোটিতেই ঠিক আগের মতো সপ্রতিভতা দেখাতে পারেন নি। সংঘাতহীন নিস্তরঙ্গ জীবন বেছে নেওয়ায় তাঁর চৈতন্য ও বোধের জগৎ থেকে আগের সেই দীপ্তি ও সজীবতা ঝরে গিয়েছিল। একাডেমিক পড়াশোনার সংকীর্ণ গলি-ঘুঁজি, তাঁর সহজাত প্রতিভার অনুকূল না হওয়ায় সেখানেও তাঁর অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল শুকিয়ে-ওঠা পুকুরের মাছের মতো, তৃষ্ণায় তড়পানো আর অসহায়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

মুনীর স্যারকে আমি দেখেছিলাম তাঁর জীবনের সবচেয়ে অনুপ্রাণিত মুহূর্তগুলো পেরিয়ে যাবার পর। আমি যখন তাঁকে দেখি তখন এদেশের প্রগতিশীল জগতে তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছেন তাদের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের প্রতীক। অনেকে এটাকে তখন বিপ্লবের স্বপ্ন এবং সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা বলেও মনে করছেন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম, তাঁর মধ্যে প্রতিভা রয়েছে কিন্তু প্রতিভাবান মানুষদের মধ্যে পরিপার্শ্বের সঙ্গে সংগ্রামের যে জান্তব ও প্রকৃতিগত শক্তি থাকে বা জীবনের সহজ কামনাবাসনার প্রতি যে সহজাত প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা দেখা যায় তাঁর মধ্যে তা পরিমাণে কম।

আমার প্রায়ই মনে হয় একজন মানুষ কতখানি অসাধারণ বা বড় তা তাঁর মেধা, প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা এসব কোনোকিছুর ওপরেই নির্ভর করে না। করলেও তা নেহাতই অল্পপরিমাণে। অধিকাংশ মেধাবী মানুষই সাধারণ বা গতানুগতিক জীবনযাপন করে পৃথিবী থেকে বিদায় হন। যার ওপর তা নির্ভর করে তা হচ্ছে অসম্ভবের জন্যে তাঁর রক্তগত পিপাসা কতটা দুর্বার ও অপরাজেয় তার ওপর। তলিয়ে দেখতে হয় : জীবনের কাছে তিনি কী চান। তাঁর চাওয়া যদি হয় সাধারণ, দশটা ভেদাভেদহীন মানুষের মতো গড়পড়তা—কেবলি তেল-নুন-লাকড়ি, গাড়ি, বাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, দারা-পুত্র-পরিবার পরিবৃত সুখী পরিতৃপ্ত

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

একটা প্রচলিত জীবন, তবে বুঝতে হবে যত প্রতিভা বা মেধারই তিনি অধিকারী হন, তিনি সাধারণ। কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা যদি হয় আর দশজন মানুষ থেকে আলাদা, অগতানুগতিক, বিপজ্জনক ও রক্তাক্ত পথের নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী তখনই বুঝতে হবে এ মানুষ পৃথিবীর গতানুগতিক ধারা থেকে স্বতন্ত্র, সাধারণ থেকে ভিন্ন। বড় আর প্রজ্জ্বলন্ত কোনো-কিছুর জন্যে জন্মেছেন তিনি। সহজ পথের প্রত্যাখ্যানকারী এই মানুষটির ভেতরকার উদ্যত পিপাসাকে ফলবান করে তোলার মতো প্রতিভার ঐশ্বর্য যদি তাঁর না-ও থাকে, তবুও দেখা যাবে উচ্চতর জীবনাকাঙ্ক্ষার হিংস্র উন্মাদনায় তিনি তাঁর শক্তির সীমাকে অতিক্রম করে যাবেন, সামান্য মেধাকে পুঁজি করে এমন অসামান্য সাফল্য উপহার দেবেন যা সত্যি সত্যি অপ্রত্যাশিত। মুনীর চৌধুরীর মেধা ছিল প্রতিভাবানদের মতো, কিন্তু তাঁর আকৃতি ছিল সাধারণ মানুষের। তাঁর ভেতরকার এই বৈপরীত্য প্রথমে সবাইকে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশান্বিত করলেও শেষপর্বে হতাশার ভেতর নিক্ষেপ করেছিল। তরুণ বয়সে একবার জ্বলে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর প্রখর দীপ্তি সবাইকে কিছুদিনের মতো তড়িতাহত করে দিয়েছিল। কিন্তু সেটা নেহাতই অল্পদিনের জন্যে। তার পরেই নিজের ভেতরকার সাধারণ মানুষটির অনিবার্য আদেশে নিজের অভীপ্সাহীন প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করে নেন তিনি। পুরোপুরি গৃহী হয়ে যান। নিরীহ, নিরপরাধ, সুখী, পরিতৃপ্ত গৃহী। প্রতিভাজ্বলিত, প্রখর ও তীব্র অন্তর্দৃষ্টি ছিল তাঁর । কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল সাধারণ। তাই তাঁর প্রতিভা সর্বোচ্চ স্বকীয়তায় জ্বলে উঠতে পারে নি। তাঁর ভেতরকার সাধারণ মানুষটি তাঁর অসাধারণত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্ভাবনাকে ফিরে ফিরে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে।

তাঁর আকাঙ্ক্ষার সাধারণত্বের কারণ খুঁজে বের করা কঠিন নয়। তাঁর ভেতরকার মমতাভরা মানবিক হৃদয় আত্মবিনাশী রকমে বিকশিত ছিল। আগের যুগে যাকে 'মায়ার শরীর' বলত তিনি ছিলেন তেমনি। একটা গভীর অনুভূতিময় মায়ের হৃদয় ছিল তাঁর মধ্যে। এই আর্দ্র, কাতর, মায়ামমতা মাখানো হৃদয় তাঁর জন্যে সবচেয়ে আত্মঘাতী হয়েছিল বলে আমার ধারণা। স্ত্রী-পুত্র-সন্তানের প্রতি তাঁর অপরিমেয় মমতা তাঁকে পুরোপুরি পারিবারিক করে তুলতে শুরু করেছিল। মানবিক অনুভূতির এই প্রতিকাররহিত বৃদ্ধির ফলে আর-একটা পতন দেখা দিতে শুরু করেছিল তাঁর মধ্যে। মানুষের দুর্বলতা-অসহায়তা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সবকিছুই তাঁর কাছে ঢালাও ক্ষমা পেতে শুরু করেছিল। মানুষের দোষকে বাদ দিয়ে কেবল গুণগুলোকে শ্রদ্ধা করার জন্মগত ক্ষমতা তার ভেতর থাকায় গুণগ্রহিতায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন সবার ওপরে। কিন্তু এই অতিমাত্রার মানবিক কোমলতার কারণে একসময় শুভর মতো অশুভের অপরাধও তাঁর কাছে একইরকম ক্ষমা পেতে শুরু করেছিল। ফলে ধীরে ধীরে তিনি নিজস্ব নৈতিক অবস্থান হারিয়ে ফেলতে শুরু

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

করেছিলেন। যা দিয়ে একজন শক্তিমান মানুষ শেষপর্যন্ত প্রমাণিত হন—সমাজের ভেতর সেই বিরুদ্ধশক্তি সৃষ্টি করতে তিনি অপারগ হয়ে যান। শত্রু বা মিত্র দুই-ই তাঁর কাছে পার্থক্যরহিত ও একধরনের মেরুদণ্ডহীন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। শত্রুর অপরাধকে ক্ষমা করার সহৃদয়তা মিত্রের চোখে তাঁকে শত্রুর দোসর করে তুলতে থাকে। স্বাধীনতাযুদ্ধের সমসময়ে প্রগতিশীলতার এককালের কিংবদন্তি মুনীর চৌধুরী—সেই জাগ্রত তেজস্বী, তারুণ্যদীপ্ত মানুষটি—পাকিস্তানপন্থীর ভাবমূর্তিতে পরিচিত হতে শুরু করেন।

একবার কোনো এক ব্যক্তি ডায়োজেনিসকে তাঁর সময়কার আরও দুজন দার্শনিকের নাম উল্লেখ করে জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি সহ এই তিনজন দার্শনিকের মধ্যে কাকে শ্রেষ্ঠ বলে তিনি মনে করেন। উত্তরে ডায়োজেনিস বলেছিলেন, আমরা কে কীভাবে মৃত্যুবরণ করব এর উত্তর অনেকটাই তার ওপর নির্ভরশীল।

কথাটায় পুরোপুরি সায় দিতে না পারলেও এটুকু মেনে নিতে অসুবিধা নেই যে, অগ্রহণযোগ্য বা অবাঞ্ছিত মৃত্যু জীবনের ব্যর্থতা, তুচ্ছতা, এমনকি অনেক অপরাধকেও মুছে দিয়ে অনেক সময় জীবনের ওপর মহিমার প্রলেপ পরিয়ে দেয়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সক্রেটিস, যিশুখ্রিস্ট, ব্রুনো বা জোয়ান অব আর্কের বেলায় অন্যায় ও অগ্রহণযোগ্য মৃত্যু তাঁদের জীবনের ত্রুটি আর ক্ষুদ্রতাগুলোকে মুছে দিয়ে উত্তরকালের কাছে তাঁদের স্মরণীয় করেছে। জানিনা উত্তরটি দেবার সময় ডায়োজেনিসের মনে তাঁর পূর্বসূরি সক্রেটিসের কথা স্মরণে ছিল কিনা যাঁর অন্যায় মৃত্যুদণ্ড তাঁর জীবনকে অমরত্ব দেবার ব্যাপারে রহস্যজনক ভূমিকা রেখেছিল।

মুনীর চৌধুরী তাঁর বন্ধুদের পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধ-শিবিরের মানুষদের যত সহৃদয়ভাবেই বুকে টেনে নিয়ে থাকুন না কেন, ঐ শিবিরের লোকেরা কিন্তু তাঁকে কখনো নিজেদের মানুষ মনে করে নি। তাঁকে শারীরিকভাবে উৎখাত করে তারা এর প্রমাণ রেখেছে।

মুনীর চৌধুরীর জীবনের অনেক সৌভাগ্যের একটি সৌভাগ্য যে তিনি একটি সৌভাগ্যবান মৃত্যু পেয়েছিলেন। বেঁচে থাকলে ভালোবাসার অপরাধে, মানবিক মমতার অপব্যবহারের অপরাধে তাঁকে জাতির আদালতে হয়ত জবাবদিহি করতে হত।

মুনীর স্যারের পড়ানো ছিল অনবদ্য। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পড়িয়েছিলেন তিনি আমাদের। পড়ানোর প্রাণবন্ত সরস উচ্ছলতার ভেতর দিয়ে ছোটগল্পের যে নিগূঢ় রস তিনি আমার ভেতর চারিয়ে দিয়েছিলেন তা আজও আমার মনের ভেতরকার শিল্পভাবনাকে অনেকখানি প্রভাবিত করে রেখেছে। তবু শিক্ষক

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

হিশেবে তাঁর যে দিগ্বিজয়ী খ্যাতির কথা অনেকদিন ধরে শুনে আসছিলাম, তাঁকে আমার কাছে ঠিক সেই মাপের শিক্ষক মনে হয় নি। আমার কলেজ–জীবনের শিক্ষক নারায়ণ সমাদ্দার বা কালিদাস মুখার্জি তাঁর চেয়ে খারাপ শিক্ষক ছিলেন বলে আমার মনে হয় না। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সৈয়দ আলী আহসান তখন ছিলেন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে, কেউ কেউ তাঁকে শিক্ষক হিশেবে মুনীর চৌধুরীর চেয়ে ভালো বলতেন। আমি অনেক পরে, আশির দশকে একবার তাঁর বক্তৃতা শোনার সুযোগ পেয়েছিলাম। শুনে শিক্ষক হিশেবে তাঁকে আমার কাছে মুনীর চৌধুরীর চেয়ে উঁচুমাপের মনে হয়নি। তবু খুব বড় মাপের শিক্ষক বলতে যা বোঝায়, আমার ধারণা মুনীর চৌধুরীকে হয়ত তা বলা যাবে না। নিজেও তিনি এ–ব্যাপারটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন না বলেই আমার মনে হয়।

তাঁর ক্লাসকক্ষের বক্তৃতা কোনো গভীর মৌলিক বোধ বা অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিতে আমাকে প্রজ্বলিত করে তোলেনি। আমেরিকা থেকে ফেরার পর তিনি ধীরে ধীরে একাডেমিক পড়াশোনা ও শিক্ষকতার গতানুগতিক জীবনের ভেতর নিমগ্ন হতে শুরু করেন। এর ফলে তাঁর হাত থেকে 'মীর–মানস' বা 'তুলনামূলক সাহিত্যে'র মতো বেশকিছু মাঝারি মাপের বই পাওয়া গেলেও এই শিক্ষাঙ্গন–কেন্দ্রিক পড়াশুনার ভেতরে তাঁর সহজাত শক্তি খুব একটা সাফল্য ঝিকিয়ে ওঠে নি বলেই আমার ধারণা।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কিন্তু যে–জায়গায় তিনি তাঁর যুগের সবাইকে অতিক্রম করেছিলেন সেটা হচ্ছে বক্তৃতার ক্ষেত্র। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাফল্য এসেছিল এইখানেই। তরুণ বয়সে 'কবর' বা 'মানুষ'–এর মতো নাটক আর রাজনীতির জ্বলজ্বলে সাফল্যের পর আর–একবার তাঁর সাফল্য ঝিকিয়ে উঠেছিল এই জায়গাটায়। ঐ সময় শহরের বিভিন্ন সভায়, অনুষ্ঠানে, আলোচনায় তাঁর উপস্থিতি ছিল সুনিয়মিত। প্রায় প্রতিটি সভাকক্ষ তাঁর প্রাণবন্ত ভাষণ ও পরিশীলিত বাচনভঙ্গিতে মুখরিত ও অনুরণিত ছিল। তাঁর সহজাত ধীশক্তি ও প্রতিভা তাঁর এইসব বক্তৃতায় অসাধারণের স্পর্শ পেত। আমার ধারণা, এইটাই ছিল তাঁর প্রতিভার সবচেয়ে শক্তিমান জায়গা। তাঁর এইসব বক্তৃতা বাংলার মতো ইংরেজি ভাষাতেও ছিল একইরকম স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর এই বক্তৃতাগুলো সংরক্ষিত হলে সেগুলো তাঁকে সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করত। তাঁর বৈদগ্ধ্যময় নাটকীয় ও অনবদ্য বক্তৃতা ছিল অসম্ভবরকম সংক্রামক। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষ থেকে শুরু করে অন্তত দুই বছর পর্যন্ত তাঁর বাচনভঙ্গি আমার নিজের কথা বলার ধরন–ধারণকেও প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবিত করে রেখেছিল। মুনীর চৌধুরীর ছাত্র এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বেশ কজন কৃতী অধ্যাপক তাঁর সেই প্রভাবের প্রেতাত্মা হয়ে, তাঁরই মতো হাত–পা নেড়ে, আজও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ক্লাসে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

নানা ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকবারই উষ্ণ, অন্তরঙ্গ ও বন্ধুত্বপূর্ণ তর্ক-বিতর্ক হয়েছে আমার। তাঁর সঙ্গে একদিনের একটা উত্তর-প্রত্যুত্তরের কথা আজও আমি ভুলিনি। আমার অনেকবারই মনে হয়েছে জীবনের মোহের কাছে পরাজয় তাঁকে-যে প্রগতিশীলতার অগ্রবর্তী সারিতে অবাঞ্ছিত করে দিয়েছিল, সামাজিক জীবনে তিনি-যে তাঁর গৌরবের অবস্থান হারিয়েছিলেন—ব্যাপারটা ভেতরে ভেতরে তাঁকে কাঁটার মতো বিঁধত। একদিন খেদের সঙ্গে আমাকে এমনি কিছু কথা বলেছিলেন। কথাগুলোর সারমর্ম অনেকটা এরকম : 'বুদ্ধিতে চৈতন্যে জানাশোনায় তো তিনি ওঁদের (প্রগতিশীলদের) মতোই। তাহলে কীভাবে তিনি পিছিয়ে পড়া?' আমি একটা উপমার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে এর উত্তর দিতে চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, 'বাজারের সবচেয়ে দামি একটা ব্লেডের কথাই ধরুন স্যার। যেমন ঝকঝকে তেমনি ধারালো। রেশমের মতো মোলায়েমভাবে শেভ হয় ওতে। এবার ধরুন সেই ব্লেডটা হাতে নিয়ে কেউ তার ধারালো দিক দুটোকে মেঝের ওপর আলগোছে একটু ঘসে দিল। কী হবে তখন? যেমন ব্লেড দেখতে তেমনি থেকে যাবে, চেহারায় অবয়বে ছাঁদে সৌন্দর্যে এতটুকু পার্থক্য হবে না। ওজন যদি কমেও যায় তবু তা এতটাই সামান্য যে সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া তা শনাক্ত করা কঠিন। সবই অবিকল আর হুবহু থাকবে। কিন্তু ক্ষতি হয়ে যাবে একটা জায়গায়। ও দিয়ে আর শেভ করা যাবে না। মানুষের চৈতন্যের জাগ্রত জায়গাটাও এমনি । সামান্যতম পা হড়কালে লক্ষ লক্ষ মাইল দূর দিয়ে হারিয়ে যায়। কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।'

www.amrajaraboipori.wordpress.com

স্যার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, হয়তো তাই। হয়তো কিছুটা তাই।

গুণের অন্ত ছিল না মুনীর স্যারের। তাঁর যে-ব্যাপারটি আমার মনে সবসময় বিস্ময় জাগিয়েছে, আমাকে আজ পর্যন্ত প্রভাবিত করে রেখেছে তা হচ্ছে তাঁর অপরিসীম উদারতা আর সহৃদয়তা। যে-কোনো মতামতকে শ্রদ্ধা করার শক্তি ছিল তাঁর মধ্যে। প্রতিটা মানুষকে তিনি সম্মান করতে পারতেন। নির্বোধতম মানুষের অবোধ হৃদয়ের অস্ফুটতম কথার অর্থও টের পেতেন তিনি। মানুষের হাস্যকর ভ্রান্তি ও অসহায়তাকে অনুকম্পময়ভাবে ভালোবাসতে পারতেন । অসীম মমতা ছিল বলেই এটা পারতেন। এজন্যে তাঁর সান্নিধ্যে গভীর স্বস্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করতাম আমরা, নিজেদেরকে ভুলত্রুটি নিয়ে সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত ও অসঙ্কোচ বোধ করতে পারতাম।

তাঁর ভেতর শক্তি ও দুর্বলতা দুটোই ছিল। আগেই বলেছি ঐ দুর্বলতা তাঁর শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল। তিনি যা হলে আমি সবচেয়ে খুশি হতাম তার অনেক কিছুই হয়তো আমি তাঁর মধ্যে পাইনি। সেই দুঃখ আজও আমি ভুলতে পারি না। কিন্তু তাঁর অনবদ্য শিক্ষকতা, বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধ, অসাধারণ

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বক্তৃতাপ্রতিভা, সুবিপুল মমত্ব, মানবিক দুর্বলতাকে ক্ষমা করার অসীম ক্ষমতা, অপরিমেয় গুণগ্রাহিতা ও নাট্যামোদী সদা-আনন্দিত হৃদয় এবং জীবনের প্রতিটি বিষয়ে প্রজ্জ্বলিত নিদ্রাহীন উৎসাহ আমার মনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি আমাকে যতটা প্রভাবিত করেছিলেন, আর কেউ হয়ত ততটা করেন নি।

তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা স্বাধীনতাযুদ্ধের একেবারে শেষদিকে, তাঁর মৃত্যুর মাত্র দুই দিন আগে। ১৯৭১এর ১৩ ডিসেম্বরের সন্ধ্যার কিছুটা আগে, তাঁর আব্বার সেন্ট্রাল রোডের বাড়ির সামনের রাস্তার ওপর হঠাৎ দেখা হয়ে যায় তাঁর সঙ্গে। তখন তিনি সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা ছেড়ে ওখানে চলে এসেছেন। ঢাকা তখন এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভারতীয় বিমান হামলা, বাঙালিদের সামনে রেখে দিয়ে পাকিস্তান বাহিনীর আমরণ হাতাহাতি যুদ্ধের সিদ্ধান্ত, মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক চোরাগোপ্তা আক্রমণ, ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনীর ঢাকা অবরোধ—সব মিলে শহরবাসীর অবস্থা তখন আতঙ্কিত, বিমূঢ় এবং বিশৃঙ্খল। প্রতিটা রাস্তার এখানে-ওখানে সন্ত্রস্ত মানুষের জটলা আর এলোমেলো ছোটাছুটি। তাঁর চিরদিনের পোশাক খদ্দরের হলুদ পাঞ্জাবি পরে বাড়ির সামনে একটা জটলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর চেহারা উদভ্রান্ত, আতঙ্কগ্রস্ত।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

রাস্তার ওপর হঠাৎ আমাকে দেখে যেন আঁতকে উঠলেন তিনি। 'একি! এখনো ঢাকায় কেন? চলে যাও শিগগির!' তাঁর কণ্ঠস্বর উৎকণ্ঠিত, অস্বস্ত। আমি তখন গ্রামে গিয়েও আবার ঢাকায় ফিরে এসেছি। নানান ব্যক্তিগত অসুবিধায় যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিতে পারি নি। শেষ মুহূর্তে এতটুকু হলেও অংশ নিতে চাই। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'চেষ্টা করছি স্যার, কালই যেতে চেষ্টা করব।'

'যত শিগগির পার যাও, একদম থেকো না।' তাঁর গলায় সেই মাতৃ-হৃদয়ের উৎকণ্ঠা। সে-ই স্যারের সঙ্গে শেষ দেখা। তিনি আমার শহর ছেড়ে যাবার প্রয়োজনের কথা ভেবেছিলেন। নিজের কথা ভাবেননি। হয়ত নিজেকে সবার মতো অতটা অরক্ষিত মনে করেন নি তিনি! তাঁর মৃত্যু খুব মর্মান্তিক। আলবদরের লোকেরা তাঁকে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় ঠিক এর পরের দিন, ১৪ই ডিসেম্বর। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা গেছে আলবদরের সদস্যেরা মীরপুর ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজের একটা ঘরে আমাদের অপর একজন শিক্ষক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. ফজলে রাব্বি ও আরও অনেকের সঙ্গে তাঁকেও মোটা লোহার রড দিয়ে শরীরে মাথায় পেটাতে পেটাতে মেরে ফেলেছিল। হত্যার পর তারা তাঁর রক্তাপ্লুত শরীর অন্যদের লাশের সঙ্গে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে ফেলে রেখে যায়।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আবদুর রাজ্জাক

প্রখর মেধাসম্পন্ন, অবৈষয়িক, জাগতিক আকাঙ্ক্ষাহীন ,অকৃতদার ও নিঃসঙ্গ আবদুর রাজ্জাক এখন জাতীয় অধ্যাপক। আমাদের সময়কার শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম দীপান্বিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি।

শাদামাঠা জীবনে সমর্পিত, সম্পূর্ণ উচ্চাশাবর্জিত জনাব রাজ্জাক শিক্ষকতার দীর্ঘ জীবন প্রধানত প্রভাষক হিশেবেই কাটিয়ে গেছেন। ক্লাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছাত্র-পড়ানোর নিরর্থক শ্রমে জীবনের অপচয়কে তিনি যুক্তিযুক্তভাবেই দরকারহীন মনে করতেন। সাধারণ ছাত্রেরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে কমই। তিনি ছিলেন শিক্ষকদের শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে মেধাবী ও প্রগতিশীল শিক্ষকমহলে তাঁর চিন্তার প্রভাব ছিল গভীর। লেখার ব্যাপারে তাঁর অসীম অনীহার কারণে তাঁর লিখিত একটি বাক্যও হয়ত উত্তরকালের হাতে পৌছোবে না। এ ধরনের মানুষদের সক্রেটিসের মতো শিষ্য-ভাগ্য দরকার হয়। তাঁর তা ছিল না। ফলে তাঁর চিন্তাধারার প্রায় সবকিছুই প্রকৃতির নিয়মে ইতিমধ্যেই বিস্মৃতির অতলে হারাতে বসেছে। তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র এবং প্রতিভাবান অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের কিছু ক্যাসেট তাঁর অজান্তে ধারণ করে বই আকারে প্রকাশ করেছেন। বইটার প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে তাঁর অসাধারণত্ব স্পষ্ট। আজীবন তপস্যার মতো জ্ঞানের সাধনা করেছেন অধ্যাপক রাজ্জাক। শুনেছি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির তত্ত্বাবধানে অক্সফোর্ডে গবেষণা শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু লাস্কির আকস্মিক মৃত্যুতে গবেষণা অর্থহীন মনে হওয়ায় ফিরে আসেন। অনেকের ধারণা, সহজাত বিশৃঙ্খল স্বভাবের কারণেই সে-গবেষণা তিনি শেষ করতে পারেন নি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অধ্যাপক রাজ্জাকের সান্নিধ্যে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কয়েকবার কথা বলারও সুযোগ হয়েছে তাঁর সঙ্গে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত উৎসাহের অভাবের জন্যেই সেটা আর হয়ে ওঠেনি। এই অনুৎসাহের কারণ হয়ত এই যে, এই ধরনের প্রখর ও ধারালো মননসম্পন্ন মানুষের মুখোমুখি হবার ব্যাপারে আমার জন্মগত ভীতি। এঁদের সামনে গেলে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। নিজের ভেতরকার অবোধ অসহায় মানুষটাকে নিয়ে খুবই অসহায় বোধ করতে থাকি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে শিক্ষক হিশেবে আমরা পাইনি। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার আগেই তিনি বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

Scan & Upload by Tusin ahmed

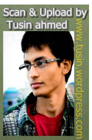

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ছাত্র না হলেও আমরা সেকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মনোজগতে সবাই ছিলাম তাঁর ছাত্র। তাই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর গল্পও বলে নিতে চাই।

দুই দফায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। প্রথমবার ছিলেন সাত বছরের জন্যে, ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত। এরপর তিনি অবসরে যান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু অধ্যাপকদের বিপুল সংখ্যায় দেশত্যাগের ফলে বিভাগের অধ্যক্ষ হবার মতো যোগ্য অধ্যাপক দুর্লভ হয়ে ওঠায় ১৯৫২ সালে তাঁকে দ্বিতীয় দফায় বিভাগীয় প্রধান হিশেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ঐ পদে তিনি ১৯৫৬ পর্যন্ত দায়িত্বপালন করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নেন।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে একেকজন অধ্যাপক তিন বছরের জন্যে বিভাগীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, তাঁর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তাঁর কনিষ্ঠ অধ্যাপক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এভাবেই চাকাটা ঘুরতে থাকে। আমাদের সময় ব্যাপারটা ছিল একটু অন্যরকম। সে-সময় বিভাগের অধ্যাপকদের ভেতর চাকরির দিক থেকে যিনি জ্যেষ্ঠতম, তিনিই হতেন বিভাগীয় অধ্যক্ষ। এই প্রথার কিছু বড় ধরনের দুর্বল দিক ছিল। যিনি একবার বিভাগের অধ্যক্ষ হতেন, তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর না-নেওয়া পর্যন্ত বিভাগীয় অধ্যক্ষের পদটি আগলে রাখতেন। দীর্ঘদিন বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী থাকায় তাঁদের স্বভাবে ও আচরণে একধরনের একনায়কতন্ত্রীর চেহারা ফুটে উঠতে শুরু করত। তাঁদের ঘিরে বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে একটা কায়েমী স্বার্থ গড়ে উঠত। বিভাগের অনেক মেধাবী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছাত্র বিবেক ও অনমনীয় চরিত্রের কারণে, অনেক সময় তাঁদের উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হত, ক্ষতিগ্রস্ত হত। অযোগ্য বিভাগীয় প্রধানদের জবরদস্তিমূলক চরিত্র আরও শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে উঠত বিশেষ করে যখন কেউ বিভাগীয় অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হতেন অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে। এঁরা প্রায় অনন্তকাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন। ফলে বিভাগের অনেক উজ্জ্বল ও কৃতী অধ্যাপক বিভাগের উন্নতিতে অবদান রাখার প্রায় কোনো সুযোগই পেতেন না। সত্যিকার যোগ্য অধ্যাপকেরা অধ্যক্ষ হলে এসব অসুবিধা এত বড় হয়ে উঠত না, যা হত অযোগ্য নিম্নমানের শিক্ষকদের বেলায়। মনে হয় এসব ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করেই পরবর্তীতে এই প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। কিন্তু আমার ধারণা এই ব্যবস্থার অনেক ত্রুটির দিক থাকলেও একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও ভালো দিক ছিল। এর একটা অন্তত এই যে, অনেক সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক এই সময় বিভিন্ন বিভাগের কর্ণধার হিশেবে অধিষ্ঠিত থেকে নিজ নিজ বিভাগের মর্যাদাকে লোকশ্রুত পর্যায়ে তুলে নিতে পারতেন। বিভাগই পরিচিত হয়ে উঠত এইসব প্রোথিতযশা অধ্যাপকদের নামে। ইতিহাসের বি.ডি. হাবীবুল্লাহ, সমাজতত্ত্বের নাজমুল করীম, দর্শনের জি. সি. দেব বা ইংরেজির সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন ছিলেন এই অধ্যাপকদের

www.amrajaraboipori.wordpress.com

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

Scan & Upload by Tusin ahmed

www.amrajaraboipori.wordpress.com

দলে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও ছিলেন বাংলা বিভাগের এমনি এক অধ্যাপক।

বিভাগ ছেড়ে গেলেও বাংলা বিভাগের সঙ্গে ড. শহীদুল্লাহর পুরোপুরি যোগাযোগ তখনও শেষ হয় নি। বিভাগের বিভিন্ন সেমিনার, অনার্স বা এম.এ.-র মৌখিক পরীক্ষা—এসবকে কেন্দ্র করে আমাদের বিভাগে তাঁর যাতায়াত ছিল। আমার এম.এ. পরীক্ষার সময়ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণকারীদের দলে ছিলেন তিনি। একবার তাঁর সম্মানে আমাদের বিভাগ থেকে একটা সংবর্ধনা-সভার আয়োজন হয়েছিল। সংবর্ধনার জবাবে উনি সেদিন এমন একটা মূল্যবান কথা বলেছিলেন যা আজও আমার কানে বাজে । তিনি বলেছিলেন : 'আমরা যে প্রতিদিন ছ-ঘণ্টা ঘুমাই, জীবনের প্রেক্ষাপটে কথাটার মানে কী? মানে, প্রতিটা দিনের চার ভাগের একভাগ আমাদের জীবন থেকে বাদ পড়ে গেল। অর্থাৎ আমরা যদি গড়ে ষাট বছরও বাঁচি তাহলেও আসলে আমরা বাঁচলাম তার চারভাগের একভাগ কম। অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ বছর। অলস স্বপ্নে কর্মহীনতায় অবহেলায় আমরা যদি দিনের আরও ছ-ঘণ্টা নষ্ট করি তাহলে আমরা আসলে বাঁচলাম মাত্র তিরিশ বছর। যদি উচ্ছৃঙ্খলতা, অপচয়, আড্ডা বা বেহিসাবে আরও ছ-ঘণ্টা নষ্ট করে দিই তবে আমরা বাঁচলাম আরো কম, মাত্র পনের বছর। অর্থাৎ পৃথিবীতে পুরো ষাট বছর আয়ু পেয়েও আমাদের আয়ু হল মাত্র পনের বছরের। আমি মনে করি জীবনের এইসব অপব্যবহার একধরনের আত্মহত্যা। আজ জীবনের শেষে আমি তৃপ্ত এই ভেবে যে, এ-ধরনের আত্মহত্যা আমি খুব কমই করেছি।' কথাটা শুনে শিউরে উঠেছিলাম। কী অপার্থিব-ব্যবহৃত, আনন্দ-উজ্জ্বল একটা জীবন! পরিতৃপ্তিতে প্রশান্তিতে কী চরিতার্থ! এ থেকেই বোঝা যায়, যে-মানুষ জীবনকে যত সুপ্রচুর ও সুযোগ্যভাবে ব্যবহার করতে পারে, মৃত্যুর দুঃখ সেই পরিমাণে তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। না হলে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ কী করে এমন প্রশান্তি আর পরিতৃপ্তির সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন :

সমুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।

কেন তিনি পেরেছিলেন, আমরা পারি না? কেন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আমরা অনুশোচনা করি। অনুতাপ ব্যর্থতা আর অচরিতার্থতায় কাঁদি? আরও দুদণ্ড জীবনের জন্যে করুণ ভিক্ষা চাই? এর কারণ : জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের সর্বোত্তম মূল্য চুকিয়ে, প্রতিটা সময়-খণ্ডের পূর্ণতম ব্যবহার করে দায়দায়িত্বমুক্ত যে-জ্যোতির্ময় আনন্দলোকের আস্বাদ তিনি পেয়েছিলেন আমরা তা পাই নি। অব্যবহারে অপচয়ে জীবনের দুর্লভ সময়-পরিসরকে আমরা কেবল মূঢ়ের মতো অবসিতই করি। জীবনের কাছ থেকে সম্পন্ন প্রাপ্তি তখনো তাই আমাদের শেষ হয় না। অনেক বাসনা-পিপাসা অচরিতার্থ-অনাস্বাদিত থেকে যায়; অনেক শক্তি

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

থাকে অব্যবহৃত, অস্ফুটিত । তাই মৃত্যু আমাদের সামনে হত্যাকারীর ভয়াবহ মুখাবয়ব নিয়ে দেখা দেয়, তাকে মনে হয় জীবনের ন্যায্য পাওনা ছিনিয়ে নেওয়া এক নির্দয় জল্লাদের মতো। তাই মৃত্যুর সামনে দাঁড়ালে আমরা ডুকরে কেঁদে উঠি , দুর্ভাবনায় আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠি। শান্তি বা সম্পূর্ণতার পরিবর্তে মৃত্যু আমাদের জন্যে হয়ে ওঠে শাস্তি, দুঃস্বপ্ন।

ড. শহীদুল্লাহর চরিতার্থ জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের জন্যে করুণা হয় । হতাশায় বিমর্ষতায় ভেঙে পড়ি। আজও তাই হয়। মূল্যবান এই জীবনকে কত তাচ্ছিল্য করেছি, কত উর্বর অগুনতি সময়-খণ্ডের দাবিকে অবিমৃষ্যকারিতার সঙ্গে জুতোর তলায় পিষে পিষে আত্মহত্যা করেছি । আজ সারাজীবনের পর্বত-প্রমাণ অপচয়ের কথা মনে হয়ে সেই হতাশা আরও গভীরতর রক্ত ঝরিয়ে যায়। আজ টের পাই জীবনের অপব্যবহারের কত প্রতিকারহীন বেদনা থেকে এই গভীর খেদোক্তি :

মনরে কৃষি-কাজ জানো না,
এমন মানবজমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

হ্যাঁ ফলত, আবাদ করলে হয়ত একদিন ফলতে পারত, কিন্তু সে আর হবার নয়। হবে কী করে? পতিত থেকে থেকে এখন জমি-যে শক্ত আর নীরক্ত হয়ে এসেছে।

তাঁকে দু-একবারের দেখায় সুযোগে তাঁর মধ্যে ব্যক্তিত্বের অনেকগুলো বড় দিক দেখেছিলাম। ১৯৬৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ভোরবেলা। স্বাধিকার-স্বাধীনতার উদ্দীপনায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে শুরু করেছে সারা দেশ। চারিদিকে তার ক্রুদ্ধ শব্দিত পায়ের আওয়াজ। শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সামনে বাঁক ঘুরে বাংলা একাডেমি-কার্জন হলের সামনে দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছে অগণিত উদ্দীপ্ত মানুষের এক টগবগে দীর্ঘ মিছিল। একুশে ফেব্রুয়ারির সকালে এতবড় মিছিল এর আগে আর কখনও দেখি নি। মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে একসময় বাংলা একাডেমি ছাড়িয়ে আমরা এসে পৌছোলাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায়—শেরে বাংলা-সোহরাওয়ার্দী-নাজিমুদ্দিনের সমাধি-সৌধের লাগোয়া রাস্তায়, পুরোনো ঢাকা গেটের কাছাকাছি।

মিছিলের পুরোভাগ এখান থেকে কত দূরে বা কোথায় কিছুই ঠাহর করার উপায় নেই। এতই অন্তহীন সেই সুবিপুল উদ্দীপনা, গর্জিত মানুষের সেই দীর্ঘায়ত প্রবাহ। হঠাৎ আটটা বাজার মিনিট দশেক আগে দেখা গেল আমাদের ডান ধারে রাস্তার উল্টোদিকের ফুটপাথ ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। পাজামা শেরোয়ানি পরনে, মাথায় টুপি, হাতে চামড়ার

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পুরোনো পরিচিত ব্যাগ। বোঝা গেল, বাংলা একাডেমিতে যাচ্ছেন তিনি। ওখানে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনার যে-দায়িত্ব পালন করছেন, সেই কাজে। সে-সময় একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় ছুটির দিন ছিল না। বাংলা একাডেমিও আর সব অফিসের মতো সকাল আটটায় বসত। সময়মতো কাজে যেতেন ড. শহীদুল্লাহ, প্রায় ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। আজও সময় ধরে এসে গেছেন তিনি; এই গতিতে হাঁটলে মিনিট চারেকের মধ্যেই একাডেমিতে গিয়ে পৌঁছোবার কথা। অফিস শুরু হতে তখনও মিনিট কয়েক থাকবে হাতে।

বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের আগে এবং পরে এই ভাষার সপক্ষের অন্যতম বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ড. শহীদুল্লাহ সেকালে আমাদের চোখে ছিলেন বাঙালিত্বের চেতনার অন্যতম প্রতীক। তাঁকে দেখামাত্রই মিছিল ভেঙে দেড়-দুশো মানুষের একটা দল তাঁর দিকে ছুটে গিয়ে তাঁকে মিছিলে আসার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল। তিনি রাজি হলে জনতা স্লোগান দিতে দিতে তাঁকে মিছিলে নিয়ে এল।

ড. শহীদুল্লাহ আমাদের দলে যোগ দেওয়ায় আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। স্লোগানে আরও সরগরম হয়ে উঠল জায়গাটা। ড. শহীদুল্লাহ মিনিট দু-তিন হাঁটলেন আমাদের সঙ্গে, তারপর হঠাৎ করেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় চাইলেন। আমরা দমে গেলাম। বাঙালি চেতনার শীর্ষ মানুষটিই যদি মিছিল ছেড়ে চলে যায় তো আমাদের মিছিল করা না-করার কী অর্থ থাকে? সবাই মিছিলে থাকার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানাতে লাগল। তিনি হাতসুদ্ধ ঘড়ি বাড়িয়ে সেটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে পরিচিত ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন—'ডিউটি, আঁ ডিউটি।' কথার ভেতর সবসময় 'বুঝেছ' বা 'বুঝেছেন তো' কথাটার অনুভূতি বোঝাতে 'আঁ' বলতেন তিনি। হ্যাঁ, তাঁর কর্তব্যের সময় হয়ে গেছে, এখন তাঁর কোনো ব্যত্যয় চলবে না। তোমরা আন্দোলন কর, মিছিল কর, উদ্দাম ধাক্কায় উপড়ে ফেল অত্যাচারীর উদ্ধত চোয়াল, প্রাণ দাও, প্রাণ নাও। সবার যুদ্ধের ক্ষেত্র এক নয়। আমার কাজ ক্ষমাহীন সাধনার জগতে। জ্ঞানতাপসের সর্বোচ্চ যুদ্ধ তার ঘরের নিভৃত কোণে। সেখানে শৈথিল্য বা অবহেলা অসঙ্গত, অন্যায়। সেই সঙ্গহীন নির্মম তপস্যায় আমাদের সময়ে জাগ্রত প্রদীপের মতো দীপিত ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ড. শহীদুল্লাহ ছিলেন আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তার মেধা ক্ষুরধার বা অসাধারণ ছিল না। সাধনা ও শ্রমে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সতেরটি ভাষা জানতেন তিনি। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সবচেয়ে আনন্দদায়ক ব্যাপার ছিল যে গড়পড়তা তিন-চার মিনিট পরপরই এমন একেকটা অসাধারণ ও বিস্ময়কর তথ্য তিনি আমাদের শোনাতেন যা আমাদের অবাক করত, নিজেদের চেয়ে আমাদের বড় করে তুলত। কথাগুলো হয়ত তাঁর নিজের নয়, নানান পঠিত বই থেকে সংগৃহীত, নয়ত উদ্ধৃতি। কিন্তু একজনের পাণ্ডিত্য চারপাশের অন্য সবার জন্য

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কতখানি যে আনন্দ আর উপভোগের ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে তা তাঁর সান্নিধ্যে বসলে সবাই টের পেতাম। ড. শহীদুল্লাহ তাঁর জানার জগতের সেরা জিনিশগুলো স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে বলে যেতে ভালোবাসতেন। সামনে বসে তাঁর কথা শোনা যে-কোনো ভালো বই পড়ে যাবার মতোই আনন্দের ব্যাপার ছিল। নিজের অন্তঃপ্রকৃতির কারণে আমি নিজে জ্ঞান-জগতের মানুষ হয়ে উঠতে পারি নি, কিন্তু তাঁর এই জ্ঞানতাপসসুলভ চেহারা ও ব্যক্তিত্ব আমার সে-সময়কার তরুণ মনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল।

ড. শহীদুল্লাহর উচ্চতা ছিল গড়পড়তা বাঙালির তুলনায় কম। সভায় সভাপতির চেয়ারে বসলে তার পা মাটি পর্যন্ত পৌঁছোতে পারত না। উপরেই ক্রমাগত সামনে-পেছনে দোল খেতে থাকত। বিপুল পড়াশোনা দিয়ে তিনি সেই শারীরিক অনটনের ক্ষতিপূরণ করেছিলেন।

ড. শহীদুল্লাহ খুব খেতে ভালোবাসতেন। সুখাদ্যের ক্ষীণতম সম্ভাবনা তাঁকে উৎগ্রীব করে তুলত। সেকালে খানেঅলা আর মজলিশি মানুষ বলে একধরনের দিলদরিয়া মানুষের দেখা পাওয়া যেত। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ—এঁরা ছিলেন ঐ দলের। আমার আব্বার মধ্যেও আমি ঐ প্রবণতা দেখতাম। ড. শহীদুল্লাহ ছিলেন এমনি একজন খানেঅলা মজলিশি মানুষ। ঢাকার প্রায় প্রতিটি বিয়ের আসরে অনুষ্ঠানের শোভা হিশেবে নিয়মিতভাবে আমন্ত্রিত হতেন তিনি। আমাদের মতো উপহার হাতে বিয়েতে যেতে হত না তাঁকে। এটা যেমন তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তেমনি তাঁর কাছে এটা কেউ প্রত্যাশাও করত না। তিনি নিজেই ছিলেন বিবাহ অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় উপহার। বর-কনের বাবারা তাঁকে বিয়ের অনুষ্ঠানে পেলে এবং পরিতৃপ্তভাবে খাওয়াতে পারলে কৃতার্থ বোধ করত। বর-কনেরাও বিয়েতে ড. শহীদুল্লাহর উপস্থিতির কথা সারাজীবন গর্বের সঙ্গে অন্যদের কাছে বলতে ভালোবাসত। ভোজনরসিক ড. শহীদুল্লাহ এইসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার ব্যাপারে ভুল করেও স্মৃতিহীনতার পরিচয় দিতেন না। আমরা উপহার-ব্যয়ভারহীনভাবে তাঁর ঐ দুর্লভ সান্ধ্যকালীন সৌভাগ্যকে ঈর্ষার সঙ্গে দেখতাম। রসনার সজীবতার সঙ্গে প্রাণশক্তির যে-সম্পর্কের কথা বার্ট্রান্ড রাসেলের বইয়ে পড়েছি, তাঁকে দেখলে তার প্রমাণ মিলত।

সেকালের পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত মহলে ড. শহীদুল্লাহর পাণ্ডিত্য ছিল কিংবদন্তির মতো। এই কিংবদন্তি কতখানি আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছিল, একটা গল্প বলে তা বোঝানোর চেষ্টা করব। গল্পটা শুনেছিলাম নিউমার্কেটের প্রিমিয়ার বুকস-এর স্বত্বাধিকারী গোলাম রহমান-এর কাছ থেকে। প্রসঙ্গত গোলাম রহমানের সামান্য একটু পরিচয় দিয়ে পরে গল্পটা বলছি। গোলাম রহমান মানুষটি যেমন ছিলেন সুলেখক তেমনি সুরসিক। নিউমার্কেটের বিকেলগুলোয়

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তাঁর অফুরন্ত রসিকতার আমরা ছিলাম নিয়মিত ভোক্তা। সেকালের লেখকদের প্রধান মিলনকেন্দ্র নিউমার্কেটের বইপাড়ায় তাঁর দোকানটা ছিল আমাদের তরুণ লেখকদের প্রাণের নিজস্ব জায়গা। নিজের ব্যবসার লাভালাভ নিয়ে তাঁর আদৌ কোনো উৎসাহ ছিল বলে মনে হত না। আমরা তাঁর দোকানের অবস্থাকে দিনের পর দিন হৃতদরিদ্র হয়ে যেতেই কেবল দেখেছি। অথচ এমন একজন মানুষকে কী অসম্ভব বেদনাদায়কভাবে না প্রাণ হারাতে হয়েছিল। স্বাধীনতার পর দুর্বৃত্তদের চাঁদা দিতে অস্বীকার করাতে খুন হন তিনি। পাড়ার মাস্তানরা তাঁকে মাটিতে চেপে ধরে পশুর মতো জবাই করে হত্যা করে।

পুরোনো ঢাকায় তখন বিখ্যাত জিনিশ ছিল দুটো : নবাবদের আহসান মঞ্জিল আর বেগম বাজারের ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। গোলাম রহমান গল্পটা বলেছিলেন অনেকটা এভাবে :

পুরোনো ঢাকার একজন প্রায়-অশিক্ষিত লোক আরেকজন সমান অশিক্ষিত লোককে বোঝাচ্ছে ড. শহীদুল্লাহ্ কে এবং তিনি কত পণ্ডিত মানুষ। এটা বোঝানো কঠিন হওয়ারই কথা। শিক্ষাদীক্ষার ঐ পর্যায়ের একজন মানুষের পক্ষে আরেকজন সমপর্যায়ের মানুষকে ড. শহীদুল্লাহ্‌র বিদ্যা বা জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া সোজা নয়। কিন্তু তাও সম্ভব হয়ে গেল পুরোনো ঢাকার সেই সুবিখ্যাত রসিকতার জোরে। তো, প্রথম লোকটা দ্বিতীয় লোকটাকে বলছে এভাবে : 'ড. শহীদুল্লাহ্ ডাকতর ; মগর বিমারের ডাকতর না।' ঠিকই তো, এটা পরিষ্কার করে না নিলে কী করে হয়। নামের সামনে ড. অথচ রোগের চিকিৎসা করতে পারেন না, এরকম ডাক্তার তো তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে কোথায় । কাজেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে নেওয়া জরুরি।

কিন্তু উনি বিমারের ডাক্তার নন, জানা গেল কী করে? না, খুব বেগ পেতে হয় নি এতে। পাড়ার ফ্যাতনার মার ডেলিভারি পেইন উঠেছিল মাস কয়েক আগে। অবস্থা বেগতিক দেখে ফ্যাতনার খালু শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বাড়ির নেমপ্লেটে 'ড.' শব্দটা দেখে বাড়িতে ঢুকে কেঁদে পড়েছিল মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচাবার অনুনয় নিয়ে। শুনে ড. শহীদুল্লাহ্ অপ্রতিভভাবে মাথা নেড়ে বলেছিলেন— 'আঁ, বুঝলে, আঁ, আমি ঐ ডাক্তার নই, বুঝলে, আঁ ... '

'বিমারের ডাকতর না তয় কিয়ের ডাকতর'—প্রথমজনের অদ্ভুত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয়জনের জিজ্ঞাসা।

'লফ্‌জের ডাকতর, লফ্‌জের। মানে ভাসার ডকতর। ঐ যে 'রাষ্ট্রভাসা বাংলা চাই' ঐ ভাসার ডাকতর, বুঝছস?'

'ভাসা তো বুঝলাম, মগর ভাসার ডাকতর ব্যাপারডা কী জিনিশ?'

এবার প্রথমজনের সেই বিস্ময়কর বক্তব্য : 'হেন তয়। ফ্যাতনাগো যে মাস্টার আছে না?'

Scan & Upload by Tusin ahmed

www.amrajaraboipori.wordpress.com

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

'আছে।'
'তার যে মাস্টর?'
'হ!'
'তার যে মাস্টর?'
'হ!'
'তার যে মাস্টর?'
'হ!'

এইবার এমনি কইরা পঞ্চাস তালায় উইঠা যা। যারে পাইবি, হেই অইল ডাকতর সহীদুল্লাহ।'

বিমূর্তকে দৃশ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেবার কী সহজ প্রতিভা। সাধারণ মানুষ থেকে সারস্বত সমাজ সবার কাছে ড. শহীদুল্লাহ ছিলেন আমাদের যুগের এমনি অনন্যসাধারণ এক জ্ঞান– তাপসের নাম। তাঁর মৃত্যুর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা হলের নাম তাঁর নামে রেখে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে।

ড. শহীদুল্লাহ ছোটখাটো মানুষ হলেও পরিণত বয়সে যখন তাঁকে আমরা দেখেছি তখন শুভ্র চুলে শুভ্র দাড়িতে, ব্যক্তিত্বে, পরিণতির সৌন্দর্যে তাঁর মুখাবয়বে একটা জ্যোতির্ময় আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। ছবিতে তাঁকে দেখতে হুবহু পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথের মতো লাগত।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আহমদ শরীফ

বাংলা বিভাগের একজন অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমার তরুণ–চেতনাকে প্রায় পুরোপুরি অধিকার করে নিয়েছিলেন, তিনি অধ্যাপক আহমদ শরীফ। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে আশির দশকের শেষপর্যন্ত যাঁদেরকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে অতি–প্রগতিশীলতা ও বামপন্থী চিন্তাচেতনা দানা বেঁধেছিল, তিনি তাঁদের একজন। একপেশে, তীব্র, আপোষহীন ও রক্ষণশীলতা–বিরোধী অনমনীয় অবস্থান ও চমক–জাগানো কথাবার্তার জন্যে গত তিন দশক ধরে সবসময়ই আলোচনা ও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছেন। শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিমান অধ্যাপক শরীফ শেষপর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে কোনো ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পেরেছেন বলে আমি মনে করি না, তবে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে প্রায় সবসময়েই তপ্ত ও উত্তেজিত করে রাখার মতো রসদ জুগিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন সবসময়েই।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের ওপরে তাঁর পড়াশুনো ছিল বিশদ। আমাদের সময়ে এখনকার মেডিক্যাল কলেজের দক্ষিণ ধার জুড়ে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কলা অনুষদ। তারই সর্বশেষ দালানের পশ্চিম প্রান্তের শেষে খুপরির মতো একটা ছোট্ট পাণ্ডুলিপি–আকীর্ণ ঘরে তিনি বসতেন।

১৯৬১ সালে বাংলা বিভাগের পিকনিক পুনর্মিলনীতে একবার আমার নিজেরই গাওয়া একটা জারি গানে ঐ ঘরে তাঁর নিঃসঙ্গ সময়–যাপনের ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম আমি :

কোণের ঘরে বসে জ্ঞানী আহমদ শরীফ।
বাংলা ভাষার মধ্যযুগ করতেছেন জরিপ।

বলিষ্ঠ ও অদমিত ব্যক্তিত্বের মানুষ অধ্যাপক শরীফ। প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এমন জোরালো এবং প্রচণ্ডভাবে তিনি বক্তব্য রাখতেন যে সেগুলোকে নিয়তির মতো অকাট্য মনে হত। কিন্তু একটি ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনটন কবলিত। মানুষের শ্রেয় ও বৈভবময় দিকগুলোর ব্যাপারে তিনি ছিলেন অবিশ্বাসী ও মোহহীন। জীবন পৃথিবী প্রেম সমাজ সবকিছু সম্বন্ধে ক্লাসে এমন নির্মোহ কঠিন ও নেতিবাচক কথা বলতেন যা আমাকে আকৃষ্ট ও আতঙ্কিত করে তুলত। সেই ভয় থেকে বাঁচার জন্যে তাঁকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরতে চাইতাম। আমি নিয়মিতভাবে তাঁর বাসায় যেতাম এবং ভেতরকার উৎকণ্ঠার হাত থেকে বাঁচার জন্যে তাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করে চলতাম। আমি বুঝতে পারতাম তাঁর কথাগুলো কেবল নিষ্ঠুর নয়—অর্ধসত্য ও উপরতলসর্বস্ব। কিন্তু তা অপ্রমাণ করার শক্তি আমার ছিল না। তাঁর এইসব আপতউজ্জ্বল কিন্তু নির্দয় ও জীবনবিদ্বেষী কথাগুলো একসময় আমার ওপর নারকীয় অত্যাচার শুরু করে দিয়েছিল। আমার তরুণ বয়সের স্বপ্ন আর বিশ্বাসভরা হৃদয়টাকে নিষ্ঠুর হাতে চিরে কুটি কুটি করে যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর কথা শুনে মনে হত আজীবনের কোনো ব্যক্তিগত অপ্রাপ্তির প্রতিশোধ নিতে তিনি যেন পৃথিবীর সব বৈভব ও সৌন্দর্যকে বাঁটাল দিয়ে উপড়ে ফেলতে চান। তাঁর জোরালো ও প্রত্যয়দৃপ্ত বক্তব্যের সামনে অপরিণত বয়সের অসহায়তা নিয়ে আমি কিছুই করে উঠতে পারতাম না অথচ তরুণ হৃদয়ের রক্তিম বিশ্বাসগুলোকে তাঁর ক্ষমাহীন পায়ের নিচে দলিত ও নিষ্পেষিত হতে দেখে আমি রক্তক্ষরণের যন্ত্রণা অনুভব করতাম।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তাঁর প্রভাব আমার ওপর বেশিদিন কার্যকর হয়নি। তাঁর পরিণত মন–মানসিকতার শক্তিমান আগ্রাসন এড়িয়ে আমার ক্ষতিগ্রস্ত বিশ্বাসগুলোকে আমি আবার সজীব করে তুলতে পেরেছিলাম। আমি জানি প্রাণকৃষ্ণ স্যার কিংবা মৌলভি স্যারের কাছ থেকে ছেলেবেলায় আমি যে-শারীরিক নির্যাতন পেয়েছিলাম তা অমানবিক হলেও অনপনেয় ছিল না। এটা জীবনের বাইরের ব্যাপার, ত্বকের ক্ষত শুকোনোর সঙ্গে সঙ্গেই শুকিয়ে যায়। কিন্তু জীবনের শ্রেয়বোধগুলোকে ছিন্নভিন্ন হতে দেখে একজন তরুণের হৃদয় যে-

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তমসার ভেতর নিমজ্জিত হয় তার ক্ষত সুদূরপ্রসারী। ছাত্রের বিশ্বাসের জগৎকে তা ধ্বংস করে দেয়। আমার আশঙ্কা তাঁর থেকে আমারও এ-রকম কিছু ঘটে ছিল। কথার চমৎকারিত্বে তিনি সবাইকে আকৃষ্ট করতে পারতেন। ফলে কেবল আমার নয়, অনেক ছাত্রই তাঁর এই নেতিবাচক চিন্তাচেতনার শিকার হয়েছিল। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে থেকে আমাদের একালের সাহিত্যজগতের অন্তত দুজন প্রতিষ্ঠিত অবিশ্বাসী তাঁর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তবে যে-ব্যাপারটা আমাকে সবসময় স্বস্তি দিয়ে এসেছে তা হল : গভীরতাসম্পন্ন কোনো মানুষকে আমি শেষপর্যন্ত তাঁর অনুসারী থাকতে দেখিনি। আজীবন সর্বোচ্চ যা তিনি করতে পেরেছেন তা হল সবসময়কার কিছুসংখ্যক অপরিণত তরুণকে স্বল্পকালীন মেয়াদে তীব্র ফেনিল ও একপেশে উত্তেজনার মধ্যে তপ্ত রাখতে।

আমার এম.এ. পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পরের দিন স্যারের ব্যক্তিত্বের এই ক্ষতিকর দিকটি তাঁর সামনে তুলে ধরেছিলাম। স্যারের ছোট্ট ঘরের দরজা বন্ধ করে তাঁর সামনেই উন্মত্ত বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করে বলেছিলাম : 'এভাবে নিষ্ঠুর আর নির্মোহ কথা শুনিয়ে ছাত্রদের হৃদয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করার অধিকার আপনার নেই। তরুণ ছেলেমেয়েরা সরল হৃদয়ের স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। এখানে এসে বড় জীবনের সম্ভাবনাকে সামনে দেখতে চায়, বিশ্বাস করতে চায়। এইসব আঘাতে তাদের হৃদয়কে ভেঙে তছনছ করে দেবেন না।'

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমার মনে হচ্ছিল আমার কথাগুলো ঘরটার দেয়ালে দেয়ালে বৃথাই মাথা কুটে কেঁদে বেড়াচ্ছে। আমার এই হঠাৎ আচরণে শরীফ স্যার কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। আমার কথা থামলে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থেকে সুস্থির আন্তরিক বিমর্ষ গলায় বলেছিলেন : 'কী করব? আমি যে এটুকুই পারি। এ-ই পারি।'

ড. আহমদ শরীফের ভেতর নেতিবাচকতার শক্তির পাশাপাশি স্বপ্নের শক্তিও ছিল। কিন্তু তাঁর নেতির স্বপ্নগুলো সবাইকে যেভাবে প্রাণিত করতে পেরেছে তাঁর স্বপ্নের শক্তিগুলো সে-রকম কিছু করতে পারেনি। আমার ধারণা তার নেতির শক্তির তুলনায় তাঁর স্বপ্নের শক্তি দুর্বল ছিল বলেই এটা হয়েছিল। তাঁর নেতির নখর ছিল অসম্ভব ধারালো। তা মুহূর্তে চোখের সামনে নিজের অকাট্য ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারত এবং শ্রোতাকে তাতে বিশ্বাসী করে তুলতে পারত। কিন্তু তাঁর স্বপ্নগুলো ছিল ব্যাখ্যাহীন অস্ফুট ও অপরিণত। স্পষ্ট, লক্ষ্যভেদী ও বিশদ কোনো ভবিষ্যতকে তা চিহ্নিত করতে ও সেই পথে কাউকে ডাক দিতে পারেনি। এইজন্যে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে রক্ষকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকার অতিরিক্ত কোনো অর্থপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে।

শরীফ স্যারের স্বপ্নের কাছে না হলেও তার নেতিবাচকতার কাছে আমি ঋণী। গতানুগতিক চোখ নিয়ে জীবনকে না-দেখে নির্মোহ ও নেতিবাচক এমনকি উটকো জায়গা থেকে—তা যত একপেশে বা সংকীর্ণই হোক—জীবনকে-যে

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

দেখা যেতে পারে, তার ভেতর- যে কিছু-না-কিছু সত্যও থাকতে পারে এই চেতনা তিনি আমার ভেতর বুনে দিতে পেরেছিলেন। তাঁর নেতিবাচকতার মধ্যেও-যে কোনো সত্য থাকত না তা-ও নয়। তাঁর মধ্যেও তা ছিল যে-কোনো বিষয়ের দিকে ক্ষমাহীন নির্মোহ দৃষ্টিতে তাকাবার এবং তার অন্তর্সত্যকে দুঃসাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করার শক্তি আমি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। ভালো হোক, ক্ষতিকর হোক আমার জীবনে এ একটা নতুন মাত্রা যোগ করে দিয়েছিল। এটা আগে আমার মধ্যে ছিল না। আমি ছিলাম প্রশ্নহীন বিশ্বাসী। তাঁর সপ্রশ্ন অবিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি আত্মসাৎ করতে পারায় সারাজীবন তা আমাকে একটা মাঝামাঝি অবস্থানে থাকতে সাহায্য করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার তিন-চার বছরের মধ্যে আমি 'দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ' নামের যে একপেশে ও নির্মোহ প্রবন্ধটি লিখতে পেরেছিলাম তা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া ঐ নেতিবাচক মনোভঙ্গির প্রভাবেই।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমাদের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান ছিলেন ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন। ছাত্র অবস্থায় তাঁর মতো একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ, নাক-উঁচু মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ও হৃদ্যতার ব্যাপারটা আমার বন্ধুমহলকে খানিকটা হতচকিত করে দিয়েছিল। ড. হোসেন ছিলেন পুরোপুরি বন্ধুহীন, অনমনীয় ও জীবনছুট মানুষ। মানসিকভাবে তিনি ছিলেন পুরোপুরি 'ব্রিটিশ সাহেব।' কেবল ব্রিটিশ নয়, ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের কট্টর রক্ষণশীল ব্রিটিশ। ইংরেজ আমলের শুরু থেকে এদেশের যেসব সামন্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারের ভাগ্যবান সন্তান ব্রিটিশ-প্রভুদের সান্নিধ্য পেয়ে বা পড়াশুনো উপলক্ষে বিলেতে কাটানোর সৌভাগ্য পেয়ে নিজেদেরকে এদেশের মানুষের চেয়ে ওপরের ভেবে আত্মতুষ্টি পেতেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। আমাদের দেশ, মানুষ, শিক্ষা-সংস্কৃতি সবকিছুকেই বিলেতের তুলনায় তাঁর কাছে ছোট মনে হত। কোনোদিন যে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে তা তিনি মনে করতেন বলেও মনে হত না। সুদর্শন চেহারা এবং পরিশীলিত রুচির অধিকারী ড. সাজ্জাদ হোসেন সবসময় পরতেন হালকা মার্জিত রঙের স্যুট, খেতেন কাঁটা চামচে এবং বিলেতি বৃষ্টির বে-নোটিশ আশঙ্কাতেই বুঝিবা, হাতে রাখতেন সুদৃশ্য ছিমছাম একখান ছাতা—একেবারে পুরো কেতাদুরস্ত সাহেব। যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে জলবহুল মেঘের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট্ট একটুকরো ইংল্যান্ড।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় খানিকটা অভাবিতভাবেই। সবে সম্মান বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছি। হঠাৎ শুনলাম ইংরেজি বিভাগে একটা সেমিনার হচ্ছে, সভাপতিত্ব করছেন ড. হোসেন। সেমিনারের বিষয় : ইংরেজি কবিতার বিখ্যাত কাব্য-সংকলনগুলোর সাহিত্যিক মূল্যায়ন। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটা বিভাগে বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্রদলের সাংস্কৃতিক শাখাগুলোর উদ্যোগে প্রায় নিয়মিতভাবেই নানান রকমের সেমিনার বা সাহিত্যসভার আয়োজন হত। এর উদ্যোক্তাদের অনেকেই আজ জাতির রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জগতের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ন্ত বিকেলগুলোর হৃদয় এইসব সমাবেশের হাত ধরে জ্ঞানের পিপাসায়, সাহিত্যের উৎসাহে, সপ্রতিভ কথার উজ্জ্বল সুন্দর সুরভিতে যেন সুস্মিত হয়ে উঠত। বছরখানেকের মধ্যে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের নির্দয় বুটের নিচে এইসব সভা-সমাবেশের মুখর জগৎ পুরোপুরি নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

অন্যান্য অনুষ্ঠানের মতো ঐদিনের অনুষ্ঠানেও পেছনের দিকের একটা বেঞ্চিতে উৎসুক হয়ে বসে ছিলাম। আমার মফস্বলি হৃদয় চিরদিনই কমবেশি শ্রদ্ধাশীল স্বভাবের । সেদিনও শ্রদ্ধাবনত হয়ে সবার কথা শুনে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সেমিনারের এক পর্যায়ে ড. সাজ্জাদ হোসেনের একটা মন্তব্যে নড়েচড়ে বসতে হল। 'অক্সফোর্ড বুক অব মডার্ন ভার্সে' শ্রেষ্ঠ ইংরেজি কবিতার সংকলন করতে গিয়ে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই অন্তর্ভুক্তিকে সাহিত্যিকভাবে অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করে ড. সাজ্জাদ হোসেন বললেন, এই ব্যাপারটা ঘটতে পেরেছে নিতান্তই ইয়েটসের ব্যক্তিগত ইডিওসিংক্র্যাসির কারণে, না হলে এই মানের (অনুবাদ) কবিতা অক্সফোর্ড বুক অফ মডার্ন ভার্স-এর মতো শ্রেষ্ঠ ইংরেজি কবিতা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমি জানিনা শ্রেষ্ঠ ইংরেজি কবিদের দলে এদেশীয় একজন নেটিভের উপস্থিতি, বিশেষ করে বাংলার মতো একটা অপাঙ্‌ক্তেয় ভাষার কবির কবিতা স্থান পাওয়া ড. সাজ্জাদ হোসেনের বিলেতি আভিজাত্যকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিল কিনা!

রবীন্দ্রনাথকে বড় ভাবি বলে নয়, চোখের সামনে একজন বাঙালির এ-ধরনের করুণ অবস্থা দেখে কথাটার প্রতিবাদ করার জন্য উশখুশ করতে লাগলাম। সেমিনারের শেষপর্যায়ে পরিচালকের মুখ থেকে 'উপস্থিত সুধীবৃন্দের মধ্যে থেকে আর কেউ কিছু বলতে চান কিনা' আহ্বান শোনার সঙ্গে সঙ্গে উঠে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার লম্বা পাঞ্জাবি-পাজামা দেখে ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। পাছে ইংরেজি বিভাগের এই অভিজাত-সভায় বাংলায় বক্তৃতা শুরু করে এর পরিবেশ দূষণ করে বসি এটাই

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তাঁর আতঙ্কের কারণ। মঞ্চের কাছে আসতেই সবাইকে শুনিয়ে আমাকে জানালেন 'ইংরেজিতে বলতে হবে কিন্তু।' কথাটা সত্যি সত্যি অপমানজনক এবং সহনীয়তার বাইরে। কী করে সহজাতভাবে যেন উনি টের পেয়েছিলেন আমি বাংলার ছাত্র, কাজেই ইংরেজিতে কথা বলা আমার সাধ্যের বাইরে।

তাঁর কথার উত্তরে 'জানি' বলে ড. হোসেনের বক্তব্যের ওপর আমার মন্তব্য শুরু করলাম। আমি বলতে চেষ্টা করলাম, যে-কোনো সৃজনশীল কাব্যের মতো একটা ভালো কবিতা সংকলনও জন্ম নেয় মানুষের ইডিওসিংক্র্যাসি থেকেই। এই ইডিওসিংক্র্যাসি আছে বলেই একজন প্রতিভাবান মানুষের কাব্যবিচার হয় অন্যদের থেকে আলাদা, উৎকৃষ্ট কবিতার নির্বাচন হয় স্বতন্ত্র স্বাদের ; তাঁর কাব্য-সংকলন হয়ে দাঁড়ায় অন্য স্বভাবী। আর এর ফলেই আর দশটা সংকলন থেকে আলাদা আর উজ্জ্বল একটা কাব্য-সংকলন উপহার দিতে পারেন তিনি।

কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই ইংরেজি কাব্যচর্চার ভেতর একটানা দুটো বছর আকণ্ঠ বুঁদ হয়ে থাকা ছাত্র আমি—প্যালগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারি থেকে সেকালের প্রায় প্রতিটা ভালো কাব্য-সংকলন ছিল আমার অনুক্ষণের সহচর। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রতিটা সংকলন থেকে প্রমাণ তুলে দেখাতে চেষ্টা করলাম কী করে একজন সংকলকের ইডিওসিংক্রেসি এবং ব্যক্তিত্বের তীব্র অসম্পূর্ণতা ইংরেজি-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ও ভিন্ন চরিত্রের মৌলিক সংকলন উপহার দিয়েছে। ব্যাখ্যার সমাপ্তিতে বললাম, যে-কারণে ইয়েটস কবি হিশেবে বড় সেই কারণেই তাঁর সংকলনও বড়। যে-কারণে তিনি ঐ সংকলনের কবিতাগুলোর ভেতর দিয়ে ইংরেজি কবিতার একটা নতুন সংজ্ঞা, একটা অনাবিষ্কৃত পরিচয় তুলে ধরতে পেরেছেন, সে-কারণেই রবীন্দ্রনাথকে তিনি ঐ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছেন, যার রহস্য ইংরেজি-সাহিত্যের গ্রন্থসর্বস্ব নির্বীজ অধ্যাপকদের পক্ষে কোনোদিনই বোঝবার কথা নয়।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমার আগাগোড়া বক্তৃতাটা শ্রোতাদের বেশ সরগরম করে রেখেছিল। শেষ বাক্যটার সঙ্গে সঙ্গে জমজমাট করতালিতে তারা যেন ভেঙে পড়ল। বক্তৃতা ছাড়াও খুশিতে ফেটে পড়ার আর একটা কারণ ছিল তাদের। ড. সাজ্জাদ হোসেনের কঠোর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে ইংরেজি বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষোভ ছিল প্রচণ্ড কিন্তু তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপ ও কঠোর ব্যক্তিত্বের নিচে কারো টু শব্দ করার সাহস ছিল না। আমার কথায় তারা হয়ত তাদের রুদ্ধ আবেগের স্বরই শুনতে পেয়েছিল। হয়ত তাই ঐ অভিনন্দন।

সভা শেষ হবার পর সামনের দরজা দিয়ে বেরোতে যাচ্ছি, হঠাৎ ড. হোসেন মঞ্চের চেয়ারে বসেই হাতের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন। এগিয়ে যেতেই বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন, 'কাজ না থাকলে মিনিট দশেক পর একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।' তাঁর কণ্ঠস্বর সৌহার্দ্যস্নিগ্ধ ও মার্জিত। বুঝলাম,

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সৌজন্যবোধ দেখালেও ভেতরে ঘা খেয়েছেন তিনি। তাঁর কর্তৃত্বপরায়ণ ভাবমূর্তির ওপর আঘাত লেগেছে। তবে যা আমাকে সবচেয়ে হতবাক করল তা হচ্ছে তাঁর মুখের সুন্দর বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ। ড. সাজ্জাদ বাংলা জানেন তাহলে? আমাদের মতোই ভাত-মাছের বাঙালি? বাংলাতে কথা বলেন ?

কেন যেন আমার মনে এই অদ্ভুত ধারণাটা অনেকদিন থেকে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে ড. হোসেন বাংলা জানেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বটেই, হয়তো বাসায়ও ছেলে মেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলেন। হয়তো খাবার-টেবিলেও ইংরেজিতে ফরমাশ দেন। তাঁর সম্বন্ধে এ ধারণা জন্মানোর কারণ তিনি নিজেই। ব্রিটিশ-পরিত্যাজ্য এই দেশে ব্রিটিশ-গৌরবের নিশানবরদারের দায়িত্ব—এদেশে ব্রিটিশ কেতা আর ঐতিহ্যকে বিশুদ্ধভাবে টিকিয়ে রাখার বেতনহীন চাকরি—তিনি প্রায় গায়ে পড়েই নিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল বাংলাদেশে। ফলে ইংরেজি উচ্চারণের নির্ভেজাল ব্রিটিশ-তরিকা রপ্ত করার অবকাশ তাঁর হয় নি। কিন্তু তাঁর উচ্চারণ ছিল ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে নিখুঁত। অসম্ভব কষ্ট করে তা শিখতে হয়েছিল তাঁকে। উচ্চারণের সেই বিশুদ্ধ মানদণ্ডকে তিনি তাঁর প্রভাব-বলয়ের মধ্যে নির্মমভাবে প্রচলিত রাখার চেষ্টা করতেন। শুনেছি তাঁর উচ্চারণগত বিশুদ্ধতার অত্যাচারেই নাকি মুনির চৌধুরী ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপনা ছেড়ে বাংলা বিভাগে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। গল্পটা এ-রকম : ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকদের সভায় মুনীর স্যার নাকি একবার বাহাইন্ডকে বিহাইন্ড উচ্চারণ করে ফেলেছিলেন। করাটা বিচিত্র নয়। মোটামুটি এভাবেই শব্দটা গড়পড়তা বঙ্গসন্তান উচ্চারণ করে থাকে। কিন্তু চোখের সামনে রাজভাষার এতবড় অমর্যাদা দেখে ড. হোসেন স্থির থাকতে পারেননি। মুনীর স্যারের কথাটা যেন ভালো করে শুনতে পাননি, এভাবে ভ্রু-কুঁচকে প্রশ্নবোধক সুরে বলে উঠেছিলেন, হোয়াট ? তাঁকে ভালো করে শোনানোর জন্যে সরলমন মুনীর স্যার আরও উচ্চকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন, 'বিহাইন্ড'। শুনে ড. হোসেন, যেন শব্দটাকে এবারে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছেন, এভাবে, মৃদু কৌতুকপূর্ণ হেসে বলেছিলেন, 'ও, বাহাইন্ড'। মুনীর স্যার সেদিনই নাকি ঠিক করেন এই বিভাগে নয় আর, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে।

সাজ্জাদ হোসেন সাহেবের ঘরে যেতে-না-যেতেই বাংলাসাহিত্যের নানান দিক নিয়ে উত্তেজিত বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। উত্তেজিত, সৎ, ক্রুদ্ধ এবং তুলকালাম। এক সেন্টিমিটার অবস্থান ছেড়ে দিতেও রাজি নই কেউ আমরা। তর্ক ক্রমে তুঙ্গে পৌঁছোতে লাগল। দেখতে দেখতে কেটে গেল ঘণ্টা চারেক। এর মধ্যে ড. হোসেনের বাসা থেকে পরোটা-মাংস এসেছে। উনি কাঁটা-চামচে, আমি হাত দিয়ে তা শেষ করেছি। কিন্তু তর্ক থামেনি। আস্তে আস্তে বিকেলের

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে সন্ধ্যার ভেতর মিলিয়ে গেলে আমরা ক্ষান্তি দিয়ে একসময় যে-যার ঘরের দিকে রওনা হয়েছি।

ইংরেজি বিভাগের ছাত্রদের কাছ থেকে ড. সাজ্জাদ হোসেন সম্পর্কে নানা ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর কথা শোনা যেত। এসব থেকে তাঁর একটা ভীতিকর চেহারা মনের পটে এঁকে রেখেছিলাম। শুনতাম পরীক্ষায় নম্বরের ব্যাপারে অসম্ভব কঠোর তিনি, পরীক্ষায় খারাপ- করা ছাত্রদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য নিষ্ঠুর, বিদ্রূপপরায়ণ ও মমতাহীন । তাঁর সঙ্গে কথা বলে সে-ধারণা কিছুটা পাল্টে গেল। বুঝতে পারলাম, তিনি বিরক্তিকর রকমে নিঃসঙ্গ এবং আত্মাভিমানী; ব্রিটিশ গৌরব এবং মুসলমানি আভিজাত্যের পক্ষের ক্ষমাহীন নির্মম যোদ্ধা, কিন্তু মানবিক অনুভূতির জায়গায় তিনি একেবারে অপেলব নন। ইংরেজি সাহিত্যে বিশদ পণ্ডিত তিনি। শিল্প-সাহিত্যের তলদেশ শিউরে তোলা গভীর রহস্যকে শিল্প-স্রষ্টাদের মতো টের না-পেলেও সাহিত্যের একটা উঁচু ও অনমনীয় মানদণ্ড রয়েছে তাঁর যা তিনি তাঁর শিল্পপ্রবণ হৃদয় ও গভীর পড়াশোনা দিয়ে নির্মাণ করেছেন।

তাঁর দেশ, সমাজ ও সাহিত্য মানদণ্ড সবকিছুই ছিল অপরিবর্তনীয় ও অনড়। কেবল শিল্প-সাহিত্যের বিষয়ে নয়, কোনোকিছু একবার বোধের ভেতর গৃহীত হয়ে গেলে তিনি আর তাকে পাল্টাতে পারতেন না। একজন মর্যাদাসম্পন্ন সামন্তের মতো আদর্শ ও বিশ্বাসের ব্যাপারে তিনি ছিলেন কঠোর এবং অবিচল। সেখানে তাঁর মন ছিল যুক্তির অতীত। বিশেষ করে যৌবনে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর ব্যাপারে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ইংরেজি সাহিত্যের মতো না হলেও বাংলাসাহিত্যও বেশ ভালো করেই পড়েছিলেন তিনি, সম্ভবত আমাদের বাংলা বিভাগের অধিকাংশ অধ্যাপকের চেয়ে ভালো করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পঠন-পাঠনের ভেতর দিয়ে সাহিত্যের যে-চিরায়ত মানদণ্ডটি তিনি তৈরি করেছিলেন তার প্রেক্ষিতেই বাংলাসাহিত্যের লেখা ও লেখকদের তিনি মূল্যায়ন করতেন, তাতে ঐ লেখকেরা নিম্নতম স্তরে নিক্ষিপ্ত হলেও তাঁর করণীয় কিছু ছিল না। ইংরেজি বিভাগের পরীক্ষার এবং ফলাফলের ব্যাপারে তার অবস্থান ছিল খুবই রক্ষণশীল। ইংরেজি সাহিত্যে ভালো ফল করাকে তিনি খুবই কঠিন করে রেখেছিলেন। সাহিত্য বিচার যে সবখানে কাল-নিরপেক্ষ নয়, তা তিনি মানতেন না। শিল্পের বিচারে ব্যক্তিগত প্রেম বা ভালোবাসাকে সাহিত্যবোধের ওপর এবং করুণা বা সহানুভূতিকে যোগ্যতার ওপর স্থান দেওয়ার মতো ভাবালুতা তাঁর ভেতর ছিল না। সম্পন্ন অর্থেই তিনি ছিলেন অধ্যাপকীয়।

যে তর্ক-বিতর্ক দিয়ে আমাদের সম্পর্কের শুরু হয়েছিল, দেখতে দেখতে তা দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আগের দিনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হয় আমি

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

নিজেই তাঁর ঘরে গিয়ে হাজির হতাম, নয়তো তিনি পিয়ন পাঠিয়ে আমাকে ডেকে নিতেন। প্রায় প্রত্যেক দুপুরেই স্যারের কক্ষ উষ্ণ উত্তপ্ত তর্কের একটা সরগরম এলাকা হয়ে উঠল। সুদীর্ঘ চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে আমার মতো একজন অর্বাচীনের সঙ্গে ড. সাজ্জাদ হোসেনের মতো একজন হামবড়া, দাম্ভিক এবং বিরসহৃদয় মানুষের কী কথা হতে পারে তা আমার ইংরেজি বিভাগের সহপাঠীদের অনেকেই ভেবে পেত না। আমাদের এই তর্কের একটা সুস্পষ্ট দ্বান্দ্বিক অবস্থান ছিল। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনে আমার অবস্থান ছিল হৃদয়-সংবেদ্য আকুতির, তাঁর ছিল যান্ত্রিক পাণ্ডিত্যের। এই দুইয়ের সহাবস্থান একই মানুষের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু আলাদা মানুষকে তা বিরুদ্ধশক্তির দ্বন্দ্বে যুদ্ধমান না করে পারে না। প্রায় প্রতি বিকেলেই তর্কের পাশাপাশি আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম তাঁর নাজিমুদ্দিন রোডের বাসায়, পরোটা আর মাংসের উষ্ণতা আর সুঘ্রাণের সঙ্গে বিতর্ক জমজমাট আর অন্তহীন হতে থাকত। একসময় টের পেলাম, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক ছাড়িয়ে আমরা বন্ধু হয়ে উঠেছি। তিনি আমাকে সন্তানের স্নেহে গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। প্রতিদিন বিদায় দেবার সময় আমাকে হাত ধরে শুভেচ্ছা জানাতেন ড. হোসেন। বলতেন, 'ভালো থেকো। খোদা তোমাকে ভালো রাখুন।'

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পড়াশোনার গভীর নেশা ছিল ড. হোসেনের মধ্যে। অধ্যাপক খুদা নওয়াজের মতোই এ- জগতের ভেতরেই ছিল তাঁর আগাপাশতলা বসবাস। রক্তমাংসময় মানুষের সজীব পৃথিবী তাঁর অপরিচিত ছিল। তাঁর ভেতর যুক্তি ছিল, কিন্তু তা ছিল যান্ত্রিকতার ছকে সাঁটা। কাজেই মানবিকতার অসহায়তা ও তার মাধুর্যগুলোকে তিনি বুঝতে পারতেন না। এর শক্তিকেও টের পেতেন না। তাঁর সাহিত্যগুরু শেক্সপিয়ার যে-বেদনাময় মানবীয় অসহায়তার গান গেয়ে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ লেখক হয়েছেন তা তিনি তাঁর নাটক পড়ার সময় বুঝতে পারতেন, কিন্তু বাস্তবে টের পেতেন না। আমরা কথা বলতাম তাঁর বাসার ড্রয়িংরুমে বসে। ঘরটা ছিল বাসার সামনের দিকে, মূল বাসা থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন জায়গায়। কথায় কথায় একদিন ড. হোসেনের কাছে শুনলাম, একসময় কাজী আবদুল ওদুদও থাকতেন এই বাসাতেই। এই ঘরটা ছিল তাঁরও ড্রয়িংরুম। এই ঘরে বসেই তিনি পড়াশোনা করতেন। জানালার পাশেই ছিল একটা বেতের ইজিচেয়ার। ঐ চেয়ারে আধ-শোয়া অবস্থায় দুহাতে চোখের সামনে বই ধরে সারাক্ষণ পড়াশোনা করতেন তিনি। তখন ড. হোসেন কিশোর, স্কুলের ছাত্র। থাকতেন পাশের হাসিনা মঞ্জিলে, মাঝে মাঝেই এই বাসায় আসা হত। ড্রয়িংরুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় ব্যতিক্রমহীনভাবে তিনি দেখতেন জানালার ওপাশে কাজী আবদুল ওদুদ একমনে হাতে-ধরা বই পড়ে চলেছেন। জানালার বাইরে থেকে ইজিচেয়ার বা ঐ চেয়ারে আধশোয়া কাজী আবদুল

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ওদুদকে দেখা যেত না, দেখা যেত শুধু নিচ থেকে দুটো হাত ওপরের দিকে তোলা, সেই দুহাতে ধরা একটা বই।

স্যারের সঙ্গে আমার এই সম্পর্ক খুব বেশিদিন টেকেনি। আস্তে আস্তে আমার মনে হতে লাগল স্যারের হৃদয়বর্জিত বিরস অনুভূতির জগৎ আমাকে ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে আনছে। সেই নিষ্পত্র ঊষর মৃত্যু আমার অস্তিত্বকে স্পর্শ করতে শুরু করছে। আমি আমার ভেতর একটা জরাগ্রস্ত শুকনো পাতার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসা টের পেতে লাগলাম । আত্মরক্ষার আবেগ আমাকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল। তাঁকে আমার কাছে ভয়ংকর প্রতিপক্ষ এবং অস্তিত্বঘাতী বলে মনে হতে লাগল, ঠিক যা এক-সময় মনে হয়েছিল অধ্যাপক আহমদ শরীফকে। আশাভঙ্গে ক্ষোভে হতাশায় তাঁর প্রতি আমি মরিয়া এবং বিদ্রূপপরায়ণ হয়ে উঠলাম। এই সময় তাঁকে নিয়ে লেখা আমার একটা কবিতায় তাঁর প্রতি আমার এই অন্তর্জ্বালা প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই লোকটা

www.amrajaraboipori.wordpress.com

[Praise him ladies ; he is a scholer from Nottingham]

তার কাহিনী শোনো : সে
র‍্যাবো কিটস রবীন্দ্রনাথ
পড়েছিল এবং গ্যেটে
শেক্সপিয়ার সাহিত্যের
কথিত প্রগাঢ়দের কীর্তিমান
পদাবলী ঘেঁটে লোকশ্রুত
প্রজ্ঞার নিষ্ঠায় যে
অবিশ্বাস্য কীর্তির প্রাসাদ
তুলেছিল—
নির্বোধ উদ্ভট প্যাঁচা
তাকে
ব্যঙ্গ
করে
চলে
গেছে।

কবিতাটা ড. হোসেনের চোখে পড়েছিল। ড. হোসেন ডক্টরেট করেছিলেন নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এতটা স্পষ্ট বিদ্রূপ সহ্য করা যে-কোনো মানুষের

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

পক্ষেই কঠিন—ড. হোসেনের মতো আত্মভিমানী মানুষের পক্ষে তো বটেই। এই লেখার পর তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের অবসান ঘটে।

ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন অভিজাত সামন্ত পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। আগেই বলেছি নিজেও ছিলেন একজন অনমনীয় সামন্ত। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ঐ চেতনার সর্বশেষ প্রতিনিধিদের তিনি ছিলেন একজন। এই গণতান্ত্রিক যুগ-যে Placing-এর যুগ, Preaching-এর নয়—এই প্রতীতিকে তিনি কখনোই খুব একটা বুঝে উঠতে পারেননি।

আগেই বলেছি, যে-বিশ্বাসে তিনি একবার স্থিত হতেন তা থেকে খুব একটা পাল্টাতে পারতেন না। ব্রিটিশভক্তিতে তাঁর অবিচলতা ছিল কিংবদন্তির মতো, সেখান থেকে কেউ তাঁকে এক ইঞ্চিও টলাতে পারেনি। একবার আমার একটা লেখা পড়ে যে-কারণে তিনি প্রশংসা করেছিলেন তা হল লেখাটা একালের ইংল্যান্ডের তরুণ-লেখকদের লেখার সমমানের। অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেন নি যে ইংল্যান্ডের ঐ লেখকদের কেউ লিখলে লেখাটির দৈর্ঘ্য অন্তত তিনভাগের একভাগ কম হত। নিজে ছিলেন তিনি গভীরভাবে ধর্মে বিশ্বাসী। তাঁর পারিবারিক জীবনে সেই ধর্মীয় উত্তরাধিকারের ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। এতদিন তাঁর বাসায় গিয়েছি, তাঁর স্ত্রীর সুস্বাদু রান্নার আস্বাদে রসনা আপ্লুত করেছি কিন্তু কখনো তাঁকে সামনাসামনি দেখতে পাইনি। মনে হয় পর্দাপ্রথার কড়াকড়িও ছিল তাঁর পরিবারে। হয়তো নিজেও তিনি এতে বিশ্বাসী ছিলেন। ইংল্যান্ডের উদার মানবতাবাদী শিক্ষাও তাঁর ঐতিহ্যগত এই ধর্মীয় সংস্কারকে খুব একটা টলাতে পারেনি। ব্রিটিশদের ভারত পরিত্যাগের মতো ঘটনা যেমন তাঁর ব্রিটিশভক্তিতে বিন্দুমাত্র চির ধরাতে পারেনি, তেমনি একাত্তুরের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও তাঁর ভেতর পাকিস্তানের যৌক্তিকতাকে এতটুকু দুর্বল করতে পারে নি। সন্দেহ নেই মুসলমানদের মুক্তি ও অস্তিত্ব রক্ষার দরকারে পাকিস্তানের উদ্ভব একসময় জরুরি হয়ে উঠেছিল। সবার মতো তিনি নিজেও সে-আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক ও সংগ্রামী ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যুক্তিতে তিনি সেই-যে স্থিত হয়ে গেলেন, সেখান থেকে কিছুতেই আর সরতে পারলেন না। এরপর চারপাশের বাস্তবতার জগতে বিরাট বিরাট পরিবর্তন ঘটল, একসময় বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে দেশবাসীর অস্তিত্বের স্বার্থে, তাঁর যৌবনের পাকিস্তানেরই মতোই, জরুরি করে তুলল। কিন্তু অটল দেহরক্ষীর মতো তিনি স্বজাতি-পরিত্যক্ত সেই পাকিস্তানের পক্ষেই দাঁড়িয়ে রইলেন। দেশের জনগণ একজোট হয়ে যে-পক্ষে রায় দিয়েছে সেই দিকের সবচেয়ে অকাট্য যুক্তিগুলোকে তিনি চোখে দেখেও উপেক্ষা করে গেলেন। হয়ে রইলেন পাকিস্তানি আনুগত্যের ব্যাপারে দ্বিধাহীন এবং অবিচল। অপরিবর্তনীয়তাকে তিনি যৌক্তিক নয় কেবল, মর্যাদার ব্যাপার বলে মনে

www.amrajaraboipori.wordpress.com
Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

করতেন। এর স্বাভাবিক ফল হিশেবে পরবর্তী পর্যায়ে একাত্তুরের স্বাধীনতাযুদ্ধে সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষে যোগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী অবস্থান নিলেন তিনি। চিন্তাজগতে তিনি ছিলেন একধরনের মানসিক প্রতিবন্ধী, হয়ত এজন্যেই এটা ছাড়া কিছু করা তাঁর শক্তির বাইরে ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ার এই সিদ্ধান্ত তাঁকে প্রায় পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে দেয়। শুভানুধ্যায়ীদের দ্বারা তিনি পুরোপুরি পরিত্যক্ত হন।

উনিশশো একাত্তুরে পাকিস্তানবাহিনীর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের পর দেশদ্রোহিতার শাস্তি দিতে ক্ষিপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে আসে। কিন্তু শিক্ষক হিশেবে শ্রদ্ধা দেখিয়েই হয়ত তাঁকে শেষপর্যন্ত গুলি করে হত্যা করেনি। বেয়নেট দিয়ে সামান্য খুঁচিয়ে গুলিস্তানের সামনের কামানের পাশে ফেলে রেখে যায়। (এই সৌজন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় সবসময়েই রাজাকারদের প্রতি দেখিয়ে গেছে। এতটাই দেখিয়েছে যে, জাতির সঙ্গে শত্রুতা করে যারা জনগণের অসীম দুঃখ-দুর্দশা ঘটিয়েছে তাদের বিচারটুকু করতেও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু রাজাকাররা একটি ঘটনাতেও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এই সৌজন্য দেখায় নি।) আঘাত মারাত্মক না হওয়ায় তিনি বেঁচে যান। মুক্তিযোদ্ধাদের বেয়নেটের মতো বিচারের বেয়নেটের হাত থেকে বেঁচে যাবার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন ভাগ্যবান। স্বাধীনতার পর সাধারণ ক্ষমার আওতায় অসংখ্য দেশদ্রোহীর সঙ্গে তিনিও মুক্তি পেয়ে যান। ১৯৭৫-পরবর্তী দশ বছর সৌদি আরবের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ধর্মীয় পরিতৃপ্তি ও শান্তির জগতে অতিবাহিত করেছেন তিনি। তার মৃত্যু হয় ১৯৯৭ সালে। একাত্তুর সালে বাংলাদেশের জেলে নিশ্চিত শাস্তির সামনে দিন কাটানোর সময় তিনি একটি বই লেখেন। বইটির নাম 'দি ওয়েস্টেস অফ টাইম'। কেন তিনি পাকিস্তানে বিশ্বাস করেছেন এবং বাংলাদেশে সংগ্রামকে কেন তিনি অযৌক্তিক ও দেশদ্রোহিতা বলে মনে করেছেন এসব তিনি আপোষহীন ভাষায় তুলে ধরেছেন বইটিতে। বইটির শব্দগুলো তাঁর আজীবনের ভাষার মতো পাণ্ডিত্যসর্বস্ব ও বিরস নয়, ব্যক্তিগত আবেগে জ্বলন্ত ও সজীব। তবে এই বইতেও দেশ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা তাঁর শিল্পচিন্তার মতোই যৌক্তিক ও যান্ত্রিক। বাস্তবের পরিবর্তনের সঙ্গে চেতনাজগতের পরিবর্তনের অনিবার্যতা তাঁর বোধের বাইরেই।

ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব

রাখ-ঢাকহীন স্বভাবের খোলামেলা এবং কৌতুকদীপ্র যে-অধ্যাপকটির কথা উঠলে আমরা সকলেই একসঙ্গে খুশিতে ঝলমল করে উঠতাম, তিনি ড. গোবিন্দ

Scan & Upload by Tusin ahmed

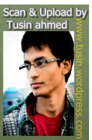

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

চন্দ দেব, সংক্ষেপে জি.সি. দেব। দর্শন বিভাগের প্রধান, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ, অকৃতদার ড. জি.সি. দেবের দার্শনিক চিন্তা এবং একাত্তুরের পঁচিশে মার্চের রাত্রে তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা অন্য প্রসঙ্গে লিখেছি।

রসালো হাস্যকৌতুকে তিনি সবসময় উপচে থাকতেন। তাঁর সেই রসিকতাগুলো ছিল আমাদের সময়কার বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বিখ্যাত রগরগে। বিশুদ্ধ সিলেটি উচ্চারণের সাথে তাঁর প্রতিটা কথা আনন্দময় চাপা হাসিতে সবাইকে হাসিয়ে মারত। তাঁর হাঁটু পর্যন্ত তোলা ধুতি, শাদা আটপৌরে পাঞ্জাবি, কালো দোহারা চেহারা, দার্শনিকসলুভ বড়সড় গোলগাল মুখ, নিরপরাধ ভোঁতা নাক, চুলের সযত্নচর্চিত মাথাভর্তি চুলের এলোমেলো উদাসীনতা গ্রিক দার্শনিকদের বিশেষ করে প্রস্তরমূর্তিতে সক্রেটিসের চেহারা মনে করাত। তাঁর সরল শাদাসিধা চেহারার সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিশ ছিল তার দুষ্টুমি-ভরা দুটি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ যা সহজেই বুঝিয়ে দিত আপাত উদাসীনতার আড়ালে একজন প্রখর আর সুরসিক মানুষ বাস করেন তাঁর ভেতরে। একজন সহৃদয় ও ভালো শিক্ষকের উপমা ছিলেন তিনি, প্রতিটা ভালো কাজে আমরা তাঁকে সঙ্গে পেয়েছি। যেসব শিক্ষকের শিক্ষকতার ভাবমূর্তি সে-সময়কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মর্যাদা দিয়েছিল, তিনি তাঁদের একজন। বুদ্ধিদীপ্ত ও দার্শনিক দৃষ্টিসম্পন্ন এই সহৃদয় ভালোমানুষটি ছিলেন আমার ছাত্রজীবনের অন্যতম প্রেরণা। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে তাঁর দর্শনের চাইতে অনেক বেশি খ্যাতিমান ছিল তাঁর নির্দোষ রসরসিকতা, তাঁর চেহারা ও স্ব-স্বভাবী ও ব্যতিক্রমী জীবনযাপন। প্রথমে তাঁর রসিকতার একটি ছোট্ট নমুনা দিয়ে তাঁর কথা শুরু করছি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

একবার দর্শন বিভাগে এক সেমিনার হচ্ছে। অনেকের সঙ্গে আমিও ছিলাম শ্রোতার সারিতে। সভাপতির ভাষণ শুরু করলেন তিনি এভাবে :

'সেবার ফ্যেরিসের ইন্টারন্যাশনাল ফিলসফিখেল খংগ্রেসে যোগ দিতে যাচ্ছি। প্লেনে উঠতেই দুই তরুণী এয়ারহোস্টেস আমাকে নানাভঙ্গিতে খাতির-যত্ন শুরু করে দিল। কিন্তু আমার যা বয়স তাতে তাদের সব চেষ্টা মাঠে মারা গেল।'

তাঁর বাড়ি ছিল সিলেটে, উচ্চারণের সিলেটি ভঙ্গি ছিল পুরো দরজা-জানালাহীন। তাঁর রাখঢাক-ছাড়া নির্বিকার কথাবার্তার সঙ্গে মিশে সে ভঙ্গি হয়ে উঠত আরও হৃদয়গ্রাহী। ছোট্ট চটুল কথাবার্তার ভেতর দিয়ে গভীর বিষয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে চলে যেতেন ড. দেব। তাঁর অনেক মজার উক্তিই সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে সবার মুখে-মুখে ঘুরে বেড়াত। সে-সবের মধ্যে যে রসিকতাটি সবাইকে প্রথমে হতবিহ্বল করে পরে তুমুল হাসিয়েছিল সে গল্পটা তাঁর নিজের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো একটি মহিলা হলের বর্ষীয়সী প্রাধ্যক্ষ প্রসঙ্গে।

মুখে মুখে চাউর হয়ে যাওয়া সেই গল্পটা ছোট্ট। হঠাৎ দেখা গেল সেই প্রাধ্যক্ষের সঙ্গে ড. দেবের বেশ জমজমাট ঘনিষ্ঠতা। সবার চোখ গোল হয়ে

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

কপালে গিয়ে উঠল। ব্যাপার কী? শেষে কি এই বুড়ো বয়সে ... ? দুষ্ট লোকদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। দুজনার মধ্যে মিল অনেক। দুজনেই দর্শনের অধ্যাপক। দুজনেই প্রাধ্যক্ষ। হল দুটোও পাশাপাশি। দুজনেই বৃদ্ধ। একজন অকৃতদার, একজন বিধবা। গর্ভনর হাউসের (এখনকার বঙ্গভবনের) নিমন্ত্রণে হুড-খোলা রিকশায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে একই সঙ্গে যাত্রা করেন তাঁরা, বঙ্গভবনের কাছে গিয়ে একই সঙ্গে নামেন। এর পরে এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকেই বা কী? ব্যাপারটা নিয়ে ছাত্রমহলে কানাঘুষা যখন বেশ তুঙ্গে, সেই সময় রটে গেল একদিন চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়ানো একদল ভক্ত ছাত্রের সামনে নিজেই তিনি গল্পটার আসল তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন।

'তোমোরা যে আমার সম্বন্ধে খী সব খতা বোল। মিসেস ...-এর সঙ্গে আমার নাকি খীসব সম্পর্খ আছে।' বলে ছাত্রদের সলজ্জভাবে হাসতে দেখে খুলেই বললেন তিনি আসল সম্পর্কটা।

'সম্পর্খ আছে বৈকি, খিন্তু তা দুধ খাওয়ার সম্পর্খ।' লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। এ কী ভয়াবহ কথা বলছেন অধ্যাপক দেব। কিন্তু না, ভয় নেই। এই বিপন্ন অবস্থা থেকে ছাত্রদের উদ্ধার করলেন তিনি নিজেই। ব্যাপারটা শুনতে যত ভয়াবহ আসলে ততটা নয়। পরের বাক্যে নিজেই ভেঙে বলে দিলেন ঐ সম্পর্কের আসল কারণ।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

'প্রত্যেখ দিন শোখাল বেলায় মিসেস ... আমাকে কিছু দুধ পাঠিয়ে দেন।'

হাফ ছেড়ে বাঁচে সবাই। না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মতো কিছু নেই। কথাটা মিথ্যাও নয়। একেবারেই নিষ্পাপ নিরপরাধ ব্যাপার। মিসেস ... এর বাসায় গোটাকয় দুধেল গরু আছে, প্রত্যেকদিন সকালবেলায় সেই অপর্যাপ্ত দুধের সামান্য অংশ শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ড. দেবের বাসায় পাঠিয়ে দেন তিনি। কী থাকতে পারে এই নিরীহ ব্যাপারটার মধ্যে। কিন্তু এর পরেই তাঁর বক্তব্যের শেষ যে-বাক্যটি সবাইকে আপাদমস্তক হাসিয়ে মারে তা আরও আতঙ্ককর: 'সম্পর্খ আছে বৈকি খিন্তু সে সম্পর্খ ফিজিখ্যেল সম্পর্খ নয়, সে সম্পর্খ মেট্রা-ফিজিখ্যেল সম্পর্খ। হে হে হে হে।' কথার শেষ করেই সামনে দাঁড়ানো ছাত্রের ভুঁড়িতে জোরে খোঁচা দিয়ে সকলের সাথে যোগ দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন ড. দেব।

আর একটা গল্প মনে পড়ছে। একবার স্যার অল পাকিস্তান ফিলসফিক্যাল কংগ্রেসে সভাপতি হিশেবে যোগ দিতে যাচ্ছেন রাজশাহীতে। উঠেছেন ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে। হাঁটু অব্দি তোলা ধুতি, মোটাসোটা কালো দোহারা গেঁয়ো ধাঁচের লোকটাকে দেখে চেকারের সন্দেহ হয়েছে আসলে তিনি ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী কি না! দূর থেকে আড়চোখে বারকয় তাঁর দিকে তাকিয়ে কাছে এসে হাতের ইশারায় টিকিট দেখতে চাইল সে।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

চেকারের সন্দেহের ব্যাপারটা গোবিন্দ দেব বেশ কিছুক্ষণ ধরেই উপভোগ করছিলেন। টিকিট চাইতেই তিনি শাদামাঠা মুখটাকে নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত করে টিকিট এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'হেঁ, হেঁ, হেঁ, দো আই লুক লাইক এ থার্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জার ইয়েট আই হ্যাভ এ ফার্স্ট ক্লাস টিকিট।' বলেই দুচোখে কৌতুকপূর্ণ হাসি ফুটিয়ে চেয়ে রইলেন চেকারের দিকে। অপ্রস্তুত চেকার ধাক্কা সামলে নেবার আগেই আবার বললেন, 'আই হ্যাভ এ ফার্স্ট ক্লাস টিকিট বিখজ—আই এম দ্যা হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলসফি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফর দ্য লাস্ট সেভেন ইয়ার্স, হেঁ হেঁ হেঁ। আই হ্যাভ এ ফার্স্ট ক্লাস টিকিট বিখজ—আই অ্যাম গেয়িং টু রাজশাহী টু এ্যাটেন্ড দি অল ফাখিস্তান ফিলসফিখ্যেল খংগ্রেস এ্যাজ দি চেয়ারম্যান অফ দি ওপেনিং সেশন, হেঁ, হেঁ, হেঁ।' এভাবে চেকারকে তাঁর সব তথ্য একের পর এক এমনভাবে পরিবেশন করতে লাগলেন যে চেকারের অবস্থা হয়ে দাঁড়াল করুণ। একদিকে দার্শনিক চেতনা অন্যদিকে শিশুসুলভ অবৈষয়িক ও আপনভোলা হৃদয়ের মানুষ হিশেবে তিনি ছিলেন একেবারেই আলাদা। তাঁর সঙ্গে কারো কোনোভাবে মিল হবার উপায় ছিল না।

উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ রাত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের নারকীয় হত্যা-লীলার সময় তিনি দুশো ছাত্র-শিক্ষকের সঙ্গে শহীদ হন। গভীর রাত্রে চারপাশের তাণ্ডবলীলার মধ্যে একদল পাকিস্তানি সৈন্য উন্মত্তভাবে তাঁর বাসায় ঢুকে দরজায় বুট দিয়ে লাথি মারতে মারতে তাঁকে বাইরে আসার হুকুম করতে থাকে। দরজা খুলে তিনি সৈন্যদের সামনে এসে দাঁড়ান। সৈন্যদের সুবেদার তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'কেয়া তুম হিন্দু ইয়া মুসলমান হো?'

উনি স্বভাবত সত্যবাদিতার সঙ্গে নিজের সঠিক পরিচয়ের কথা বলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একরাশ বুলেট তার শরীর ঝাঁঝরা করে বেরিয়ে যায়। যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানেই হাঁটু মুড়ে পড়ে যান ড. দেব।

তিনি হিন্দু না মুসলমান এ-কথাই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল পাকিস্তানি সৈন্যদল, কিন্তু তিনি মানুষ ছিলেন কিনা, থাকলে কতখানি মানুষ এ-কথা কেউ তাকে জিজ্ঞেস করেনি। অথচ আমাদের সামনে মনুষ্যত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা ও উদারতার উদাহরণ ছিলেন তিনি। প্রখর, মেধাবী, সরল, সুরসিক ও দেবতুল্য এই মানুষটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে ছিলেন দর্শনের মূর্তিমান প্রতীক। সম্ভবত শৈশবেই দার্শনিক হবার আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছিল তাঁর মধ্যে। সারাজীবন শরীরে মনে দৃশ্যমানভাবে সেই দার্শনিক মানুষটি হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। চুলের ছাঁদ থেকে পোশাক-আশাক চলন-বলন সবকিছু গড়ে তুলেছিলেন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের ছাঁদে। দার্শনিক দৃষ্টির দিক থেকে খুব একটা নতুন কিছু তাঁর মধ্যে ছিল বলে মনে হয় না। এদিক থেকে তিনি ছিলেন রাধাকৃষ্ণণেরই একজন মেধাবী উত্তর-সাধক। রাধাকৃষ্ণণের মতোই চিন্তাজগতে

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য দর্শনের সমন্বয় ঘটানোর কথা ভাবতেন। তাঁর চেহারায় ব্যক্তিত্বে এবং জীবনযাপনেও এই সমন্বয় মূর্ত ছিল। সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুনীর চৌধুরী, ড. শহীদুল্লাহ, আবদুর রাজ্জাকের মতো তিনিও চোখে পড়তেন জ্বলজ্বলে আলাদা মানুষ হিশেবে। এমন একটা ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর মধ্যে যা ছাত্রদেরকে তাঁর মতো হয়ে উঠতে প্রেরণা জোগাত।

ড. হাসান জামান

বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহের 'নির্ধারিত বক্তৃতা'-পর্বে অংশ নিচ্ছিলাম শহীদুল্লাহ হলে (তখনকার ঢাকা হলে)। সময় ১৯৬০ সাল। অনার্স তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছি। বক্তৃতাটা বোধহয় একটু বেশিরকমই ভালো হয়ে গিয়েছিল। প্রমাণ পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গেই। প্রথম পুরস্কারটা টসটসে আপেলের মতো এসে গেল হাতের মুঠোয় আর পরিচয় হওয়ার সুযোগ হল শিক্ষা-সংস্কৃতি অঙ্গনের সে-সময়কার দুজন উঠতি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। ব্যক্তিত্ব দুজন হলেন কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সংগঠক হাসান হাফিজুর রহমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. হাসান জামান। নির্ধারিত বক্তৃতার বিচারক হয়ে এসেছিলেন এঁরা। দুজনেই মৃদুভাষী। সভা ভাঙতেই হাসান হাফিজুর রহমান আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমি লিখি কিনা।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বললাম, না।

হাসান ভাই স্বভাবগত সুস্মিত কণ্ঠে বললেন, এত ভালো বলেন, লেখেন না কেন?

সে-সময় উদীয়মান যে-দুজন কবির নাম মুখে মুখে উচ্চারিত হতে শুরু করেছে, তাঁরা হচ্ছেন শামসুর রাহমান ও হাসান হাফিজুর রহমান। একুশে ফেব্রুয়ারির ওপর একটি অসামান্য কবিতা লিখে তখন তিনি শামসুর রাহমান থেকে এগিয়ে রয়েছেন। হাসান ভাই সম্বন্ধে প্রসঙ্গান্তরে লেখার ইচ্ছা আছে। তাই এ-যাত্রায় আত্মসংবরণ করছি।

ড. হাসান জামানের সঙ্গে পরিচয় হল হাসান ভাই-এর কথা শেষ হওয়ার পরপরই। পরিচয়-পর্বটা নাটকীয়। হাসান জামান আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রথমে করমর্দন করলেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'আগামী শনিবার বিকেলে আমার বাসায় চা খেতে এলে খুব খুশি হব।' ছেলেবেলায় মা মারা যাবার পর থেকে একটা উপেক্ষার পৃথিবীতেই বড় হয়েছি। কেউ কোনোদিন আমাকে আলাদা করে নিমন্ত্রণ করতে পারে এ ছিল ভাবনারও অতীত। পরিপূর্ণ মানুষের সম্মানসহ আমন্ত্রণ পেয়ে খুশিতে উথলে উঠলাম । শিক্ষক হিশেবে ড. হাসান

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

জামানের খ্যাতি তখন বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতো একজন মানুষ এতটা সৌজন্যের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করছেন কথাটা ভাবতেই নিজেকে কেউকেটা মনে হতে লাগল।

সত্যি বলতে কি, শনিবার বিকেলের জন্যে ভেতরে ভেতরে অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঢাকা হলের হাউস টিউটার তখন তিনি, থাকতেন হলের গেটের লাগোয়া বাসায়। আমি যেতেই ড. জামান ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন, হাতে একটা মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটা দেখিয়ে বললেন, আপনার লেখা আছে দেখে কিনে এনেছি।

যে-পত্রিকাটি তিনি দেখালেন, তার নাম 'উত্তরণ'; বের করতেন আমাদের এনাম ভাই, এনামুল হক (ড. এনামুল হক, পরবর্তীতে ঢাকা জাতীয় যাদুঘরের মহাপরিচালক, যাঁর উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে বর্তমান জাতীয় যাদুঘর ভবনটি নির্মিত হয়েছে)। পত্রিকাটায় প্রকাশিত লেখাটার নাম ছিল 'আধুনিক কবিতায় ইঙ্গিত।' লেখাটা আমার কাছে এজন্যে স্মরণীয় যে ঐ প্রবন্ধটি ছিল আমার প্রকাশিত লেখার মধ্যে দ্বিতীয় এবং প্রথম প্রকাশিত গদ্য লেখা। পত্রিকার প্রথম প্রবন্ধ হিশেবে প্রকাশিত হয়েছিল লেখাটি।

ড. জামানের হাতে পত্রিকাটি দেখে দ্বিতীয় দফা খুশি এবং কৃতার্থ হলাম। চায়ের সঙ্গে আনুষঙ্গিক আর যা এল তাও স্বাদে ও দৃশ্যে রুচি এবং রসনার অনুকূল। নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষের মর্যাদায় অনুভব করলাম। তাঁর সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথা হল। একসঙ্গে কিছু ভালো কাজ করার চিন্তাভাবনাও চলল অনেকক্ষণ, যদিও শেষপর্যন্ত ওসবের কিছুই হয়ে ওঠেনি। ড. জামান নিজেই একসময় আর সে-সবে উৎসাহ দেখাননি। আমিও না। সম্ভবত প্রথম আলাপেই তিনি টের পেয়ে গিয়েছিলেন যে, আদর্শিক জায়গায় তিনি ও আমি পুরোপুরি ভিন্ন জগতের মানুষ, আমাদের মধ্যে মিল হবার এক চিলতে সম্ভাবনাও নেই। কিন্তু এ পার্থক্যের জন্যে তাঁকে সে-সময় আমার খারাপ লাগেনি। তিনি ছিলেন গভীরভাবে পাকিস্তান ও ইসলাম-বিশ্বাসী মানুষ । কিন্তু এটা তো সেকালে কোনো ধিক্কারযোগ্য কথা ছিল না। সেটা পাকিস্তানি যুগ, মাত্র বারো-তের বছর আগে সারা জাতি মরণপণ লড়াই করে পাকিস্তান এনেছে। গুটিকয় হাতে-গোনা মানুষ ছাড়া দেশের সবাই তখন পাকিস্তানের পক্ষে । দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে শোষিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্যে মুসলমানেরা পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে তারা তখন মনে করেছে এদেশের মুসলমান ও ইসলামকে বাঁচানোর একমাত্র উপায়। এই অবস্থায় কেবল পাকিস্তান-বিশ্বাসী বলে কাউকে পরিত্যাজ্য মনে করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তাছাড়া গুণ তাঁর অনেক। তিনি পড়াশোনা করতেন বিস্তর। আমাদের অনেক প্রগতিশীল অধ্যাপকদের চেয়ে অনেক বেশি। ড. হাসান জামানের ব্যক্তিগত বইএর সংখ্যাও

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ছিল প্রচুর। কথাও বলতেন চমৎকার। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সেমিনার হয়েছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোনো একটা বিষয়ের ওপর। প্রবন্ধকার ছিলেন ড. হাসান জামান। আমি যখন সেই আলোচনা-সভায় পৌঁছোই, তখন সভার শেষপর্ব চলছে। এক এক করে শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন তিনি। স্মিত হেসে ছোট ছোট মিষ্টি কথায় এমন নিটোল আর অনবদ্যভাবে তিনি প্রতিটা উত্তরের ইতি টানছিলেন যে প্রশ্নকারীরা পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে খুশি হয়ে উঠছিল। সেদিনের সেই অনবদ্য দৃশ্যটা আজও আমার চোখের সামনে দেখতে পাই।

ড. হাসান জামানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কখনও গভীর হয় নি, যদিও আমাদের ভেতর একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধার অনুভূতি অনেকদিন পর্যন্ত বজায় ছিল। ১৯৬৬-এর মার্চ বা এপ্রিল হবে। সবে আমার সম্পাদনায় 'কণ্ঠস্বর' বের হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডের মুখে একদিন হঠাৎ ড. জামানের সঙ্গে দেখা। উনি রিকশায় করে আসছিলেন রাস্তার বিপরীত দিক থেকে। আমাকে দেখে রিকশা থেকে মাথা বাড়িয়ে উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন : কণ্ঠস্বরটা সুন্দর তো, তাই পত্রিকার নাম কণ্ঠস্বর। তাঁর মুখে সেই প্রসন্ন মিষ্টি হাসি।

এর পরে তাঁর সঙ্গে বার-কয়েক দেখা হয়েছে টেলিভিশন অফিসে। পাকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশন তখন সবে শুরু হয়েছে আজকের রাজউক ভবনের নিচের তলায়। একটা ছোট্ট স্টুডিও, নামমাত্র কন্ট্রোলরুম আর গোটাকয় ঘর আর চেয়ার-টেবিলের অস্থায়ী অফিস নিয়ে তার তখন চালচুলোহীন যাত্রা। ড. হাসান জামান তখন টেলিভিশনে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করছেন। সময়টা সম্ভবত ১৯৬৭-৬৮-র দিকে হবে। ছোট্ট ছোট্ট কথায় ইসলামের মানবিক দিকগুলোকে মিষ্টি হেসে এমন সহৃদয় আর অনবদ্য করে তুলে ধরছেন যে শ্রোতারা মুগ্ধ না হয়ে পারছে না। শুধু মুখের কথা দিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেও যে কতটা প্রিয় ও প্রসাদগুণসম্পন্ন করে তোলা যায় তিনি ছিলেন তার প্রমাণ। শুধুমাত্র কথা-নির্ভর এ-রকম একক-ব্যক্তি উপস্থাপিত অনুষ্ঠান একালে প্রায় উঠেই গেছে, হয়তো তেমন কথা বলার মতো মানুষ সমাজ থেকে শেষ হয়ে গেছে বলেই। তাঁর সমসময়ে শামসুল হুদা চৌধুরী (পরবর্তীতে সংসদ স্পিকার) বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান 'হে নিরুপমা'তে ও এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী (দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, পরবর্তীতে মন্ত্রী ও সংসদের ডেপুটি নেতা) তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত অনিন্দ্যসুন্দর অনুষ্ঠান 'আপনার ডাক্তার'-এ তাঁর সমপর্যায়ের অনুষ্ঠান উপহার দিতে পেরেছেন।

এরই মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে গণবিদ্বেষক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবের ছয় দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তা তীব্র হয়ে উঠছে। পাকিস্তানের অস্তিত্ব মোটামুটি বিপদের সামনে।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এই পরিস্থিতি মোকাবেলার অন্যতম উপায় হিশেবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ঢাকায় জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো (ব্যুরো অফ ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কার্জন হলের দিক থেকে আবদুল গনি রোডে ঢোকার মুখে ডানদিকের লাল দোতলা বাড়িটায় স্থাপিত হয় প্রতিষ্ঠানটা। 'জাতীয় পুনর্গঠন' কথাটার মধ্যেই জাতির ধ্বস্ত বিপর্যস্ত অবস্থার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। অর্থাৎ জাতি একসময় সুগঠিত ছিল, এখন ভেঙে পড়েছে—যা পুনর্গঠন করার জন্যেই এই প্রতিষ্ঠান।

খ্যাতিমান উর্দু লেখক ও পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় আমলা ও রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের বিশ্বস্ত সহযোগী আলতাফ গওহরের উদ্যোগে এই ব্যুরোর প্রতিষ্ঠা। বিপুল অঙ্কের তহবিল দিয়ে গঠিত হয় এই ব্যুরো। বাইরের দিক থেকে এই ব্যুরোর ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। উদ্দেশ্য হল পূর্ব পাকিস্তানের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নতুন বই লেখাকে উৎসাহিত করা এবং সেই 'মূল্যবান'(?) বইগুলো প্রকাশ করে জাতীয় সংস্কৃতিভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা। এসব লেখার জন্যে জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে অবিশ্বাস্য উঁচু হারে সম্মানী দেওয়া হত। উদ্দেশ্য : দেশের বঞ্চিত বুদ্ধিজীবীরা যাতে তাঁদের শ্রমের যথোচিত মূল্য পেয়ে সচ্ছল জীবনযাপন করে শিল্প-সংস্কৃতির সেবায় আরও পরিপূর্ণভাবে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে পারেন তা নিশ্চিত করা। বাইরের এই মহৎ উদ্দেশ্যের আড়ালে কিন্তু এই ব্যুরোর আসল মতলব ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তখন যে পাকিস্তানবিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠছিল, বিপুল উৎকোচের অবারিত সলিলে সেই বিক্ষোভকে শান্তি-স্নানে প্রসন্ন করে তোলা। এককথায় অর্থের মুখে এখানকার বুদ্ধিজীবীদেরকে পাকিস্তানবিরোধী তৎপরতা থেকে বিরত করে রাখা। জনা-দুই সরকারি আমলার পর জনসাধারণের কাছে প্রিয়, পণ্ডিত, সুবক্তা ও পাকিস্তানি আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী ড. হাসান জামান এই ব্যুরোর প্রধান হিশেবে নিযুক্ত হলেন। টেলিভিশনে তাঁর জনপ্রিয়তা ঐ পদের জন্য তাঁর যোগ্যতাকে নিশ্চিত করে তুলেছিল। ও দিয়েই তিনি রাষ্ট্রের কর্ণধারদের চোখে পড়েছিলেন। ততদিনে পাকিস্তানি আদর্শে তাঁর বিশ্বাস আগের চেয়ে অনেক কঠিন ও অনমনীয় হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানকে তিনি মনে করতে শুরু করেছেন এই উপমহাদেশে ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হিশেবে। ইসলামের বিপন্নতার আতঙ্কই সম্ভবত তাঁকে অমন আপোষহীন পাকিস্তান-বিশ্বাসী করে তুলেছিল। পাকিস্তানকে বাঁচানোর এই চ্যালেঞ্জ হাসান জামান সত্যিকার মোমিনের নিষ্ঠার সঙ্গেই হাতে তুলে নিলেন।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

আমাদের আত্মবিক্রীত বুদ্ধিজীবীদের জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর লোভনীয় টোপ গেলাতে ড. হাসান জামানের খুব বেশি বেগ পেতে হয় নি। তাঁর পরিচিত মিষ্টি হাসি এবং ব্যুরোর স্ফীত অঙ্কের অপর্যাপ্ত প্রলোভন দিয়ে তিনি

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

অনায়াসেই তা সমাধা করলেন। প্রতিটি বই লেখার জন্য তখন ব্যুরো থেকে পাওয়া যেত সে-সময়কার পাঁচ হাজার টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা যা আজকের (১৯৯৬ সালের) হিশেবে পঁচাত্তর হাজার টাকা থেকে সাড়ে সাত লাখ টাকার কম নয়। এমন অপ্রত্যাশিত দুর্লভ প্রাপ্তি হাতছাড়া করতে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা আদৌ উৎসাহী ছিলেন না। বুদ্ধিজীবীদের প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা এবং জমা-দেওয়া পাণ্ডুলিপির স্তূপ পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠতে লাগল। বই লেখার পারিশ্রমিক বই প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না। পাণ্ডুলিপি জমা দিলেই দাম চুকিয়ে দেওয়া হত। আলতাফ গওহরের জাতীয় সংস্কৃতির তথাকথিত 'সম্পন্ন গ্রন্থ ভাণ্ডার' ফুলেফেঁপে উপচে পড়তে লাগল। বিপুল টাকার প্রবাহে পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণের কথা আমাদের বুদ্ধিজীবীদের প্রায় ভুলিয়েই দিলেন তিনি। বুদ্ধিজীবীরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বইয়ের পর বই জমা দিয়ে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা হাতিয়ে নিতে লাগলেন। কেউ কেউ রাতারাতি নামমাত্র কিছু একটা জমা দিয়েও বাগিয়ে নিতে লাগলেন বিস্তর অর্থ। ড. হাসান জামানের মিশন ষোলকলায় সফল হয়ে উঠল।

এদিকে আপামর জনসাধারণের স্বাধীনতার স্পৃহা সারা দেশ জুড়ে সংক্ষুব্ধ এবং উত্তাল হয়ে উঠছে টের পেয়ে ঐসব লোভ-প্রমত্ত বুদ্ধিজীবীরা, জাতির প্রতি তাঁদের উদাসীনতার সম্ভাব্য শাস্তি আঁচ করে, হঠাৎ করে সম্বিত ফিরে পেলেন এবং উনিশশো একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার সামান্য আগে রাতারাতি বিপ্লবী হয়ে উঠলেন। নিজেদের পাপকে চাপা দেবার জন্যে, অধ্যাপক আহমদ শরীফের সৈনাপত্যে তাঁরা হঠাৎ করেই শহীদ মিনারে জড়ো হয়ে, 'স্বাধীনতার সঙ্গে আর বিশ্বাসঘাতকতা করব না' বলে শপথবাক্য পাঠ করে গগনবিদারী চিৎকারে হাসান জামানের হত্যার দাবিতে আকাশ কাঁপিয়ে তুলতে শুরু করলেন। ভাবটা এমন যেন হাসান জামানই ঐ মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার একমাত্র প্রতিবন্ধক। হাসান জামানের খণ্ডিত শির বর্শাগ্রে বিদ্ধ করতে পারলেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা স্বর্গের ফলের মতো টুপ করে খসে পড়বে হাতের ভেতর।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এই ক্রুদ্ধ আক্রোশের জবাবে সুচতুর হাসান জামান কোনো প্রতিবাদ করলেন না, কেবল পরের দিন দেশের প্রতিটি জাতীয় পত্রিকায় বিনীতভাবে একটি অর্ধপৃষ্ঠাব্যাপী বিরাট আকারের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলেন। বিজ্ঞাপনের শিরোনাম লেখা হল বড় বড় অক্ষরে। শিরোনাম এ-রকম : 'যাদের মহান রচনায় জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর গ্রন্থসম্ভার সমৃদ্ধ তাঁদের নাম ও প্রকাশিত বইয়ের তালিকা।' বিজ্ঞাপনে গ্রন্থসংখ্যার ক্রম অনুসারে প্রত্যেক লেখক ও বুদ্ধিজীবীর নাম এবং তাদের প্রকাশিত প্রতিটি বই-এর বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হল। বিজ্ঞাপন বেরোলে প্রকাশ পেল হাসান জামান হত্যার দাবিতে যাঁরা যত জঙ্গী ও সহিংস, হাসান জামানের কাছ থেকে গোপনে তাঁরাই অর্থ গ্রহণ করেছেন তত

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

বেশি। হাসান জামানের কূটবুদ্ধির সামনে ন্যাংটো-হয়ে-যাওয়া বুদ্ধিজীবীদের দেশব্যাপী ধিক্কার আর লজ্জার ভেতর হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কোনো উপায় রইল না। হাসান জামানের ক্রূর শীতল ব্যঙ্গ আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অবনত মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে জয়ী হয়ে রইল।

একাত্তুরের ২৫ ও ২৬ মার্চে এবং ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নির্বোধের মতো বুদ্ধিজীবী হত্যা করে যদি তখন আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করতে সাহায্য না করত তবে নির্লজ্জ সুবিধাবাদ ও স্বার্থলিপ্সার জন্যে তাঁরা দীর্ঘকালের জন্যে গণধিকৃত হয়ে যেতেন বলে আমার ধারণা।

একাত্তুরের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় হাসান জামান পাকিস্তানিদের অন্যতম প্রধান দোসর হয়ে যান। গোলাম আযমের মতো ধর্মভিত্তিক প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিতে যাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়েছিলেন, ঐতিহাসিক বিধিলিপির অলঙ্ঘনীয়তা তাঁদেরকে ঐ পক্ষ অবলম্বনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। (কিন্তু একই সঙ্গে আমরা যেন না ভুলি যে চীনপন্থী কমিউনিস্টদের অতি চরমপন্থী কিছু দলও সে-সময় পাকিস্তান চিনের বন্ধু ছিল বলে, চিনের বন্ধু 'পাকিস্তানের' সমর্থনে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়েছিলেন। মানবিক মূঢ়তা এতটাই ভ্রমাত্মক!) মন ও মননে বুদ্ধিদীপ্ত ও অনেকখানি আধুনিক হয়েও যে-সব ব্যক্তি পাকিস্তান রক্ষাকে ইসলাম রক্ষার একমাত্র উপায় মনে করে পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ড. হাসান জামান, হামিদুল হক চৌধুরী, মৌলভী ফরিদ আহমেদ, ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতাযুদ্ধে তাঁরাই ছিলেন এখানকার পাকিস্তানপন্থীদের মূল নায়ক। যুদ্ধে তাঁদের বিশ্বাস পরাজিত ও ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং যোগ্য শাস্তি তাঁরা পেয়েছেন। মৌলভী ফরিদ আহমেদ একাত্তুরের ষোলই ডিসেম্বরের দুয়েকদিনের মধ্যে ধরা পড়ে জনতার হাতে নিহত হয়েছেন। সংসদ-বক্তা হিশেবে এবং অন্যান্য অনেক গুণপণার দিক থেকে মৌলভী ফরিদ আহমদ ছিলেন খুবই অসাধারণ। পাকিস্তান পার্লামেন্টে তাঁর ইংরেজি বক্তৃতার অসাধারণ দৃশ্য আজও আমার জীবনের অন্যতম উজ্জ্বল স্মৃতি। ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন উদ্ধার পান আহত অবস্থায় গুলিস্তানের কামানের পাশ থেকে (এখন কামানটি আর সেখানে নেই)। ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের মতো ড. হাসান জামানও গ্রেফতার হন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। কিন্তু প্রথমজনের মতো তাঁকেও, সম্ভবত শিক্ষকতা এবং পাণ্ডিত্যের প্রতি সৌজন্য দেখিয়ে, গুলি করে হত্যা না করে প্রতীকী শাস্তি হিশেবে কেবল বেয়নেট দিয়ে সামান্য খুঁচিয়ে আহত অবস্থায় গুলিস্তানের কামানের কাছে ফেলে রেখে যায়। একাত্তুরের স্বাধীনতার পর দেশদ্রোহীদের জাতি সঠিক শাস্তি দিতে ব্যর্থ হওয়ায়

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

এঁদের অনেকেই বেঁচে যান ও দেশ ছেড়ে চলে যান।

এঁদের বিশ্বাস ছিল ভুল এবং সেই ভ্রান্তির প্রতিফল তাঁরা পেয়েছেন। তবু একটা কারণে শত্রু হলেও তাঁরা সম্মানের যোগ্য। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন বিশ্বাসের শহীদ, সে-বিশ্বাস আমাদের বিপরীত হতে পারে, কিন্তু সেই বিশ্বাসের একাগ্রতায় এঁদের খাদ ছিল না। ব্যক্তিগত লাভালাভের জন্যে এঁরা প্রায় কিছুই করেন নি। এক হামিদুল হক চৌধুরী ছাড়া বাকি সবাই বিত্তের দিক থেকে ছিলেন নেহাতই সাধারণ মানুষ। কিন্তু এঁদের একজন সহযাত্রী ছিলেন—আমাদের সংস্কৃতি অঙ্গনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব তিনি—সুবক্তা, কবি, গদ্য লেখক, শিল্পযোদ্ধা ও অধ্যাপক—তিনি সৈয়দ আলী আহসান। পাকিস্তানি আমলে সরাসরি বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচারণ করে তিনি পাকিস্তানি শাসকদের সুনজরে আসেন এবং তার পরিতোষিত হিশেবে একের পর এক পুরস্কৃত হন। পাকিস্তানি আদর্শের স্বার্থে প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকেও প্রত্যাখ্যান করতে হবে—এই চ্যালেঞ্জ দিয়ে পঞ্চাশের দশকে যাত্রা শুধু করেন তিনি। এরপর পায়ে পায়ে পাকিস্তানি কায়েমী স্বার্থের আনুকূল্য পেয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান, বাংলা একাডেমির কর্ণধার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ, আমেরিকার সি.আই.এ.–এর অর্থপুষ্ট 'কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমে'র প্রধান, আইয়ুব খানের আত্মজীবনী 'ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স'–এর অনুবাদক এবং সবশেষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ অলঙ্কৃত করেন। উনিশশো একাত্তুরে পাকিস্তান–বিরোধী আন্দোলন উত্তাল ও সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে ও নিজের ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের বিপদঘণ্টা বেজে উঠছে আঁচ করে স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরুর প্রথম সুযোগেই তিনি কলকাতায় গিয়ে উপস্থিত হন। যুদ্ধের সময়টা সেখানে কোনোমতে কাটিয়ে, মুক্তি- যুদ্ধের মহিমার আড়ালে অতীতের সব গ্লানি ধুয়ে, হাত পরিষ্কার করে, যুদ্ধের পরে বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধার বেশে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। এরপর দেশে মুসলিম–বাংলা–পন্থীদের পুনর্বাসনের সময় প্রথমে মন্ত্রী এবং পরে এরশাদ আমলে 'রাজকবির' (?) পদ অলঙ্কৃত করেন। এ–ধরনের মানুষের নিয়তি শেষপর্যন্ত যা হয় তাঁরও তাই হয়েছে। আজীবন গণবিরোধী ভূমিকার কারণে সর্বজনীন ধিক্কারের মুখে সহযাত্রীহীন নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের ভেতর নিক্ষিপ্ত হয়েছেন তিনি। ভবিষ্যতে তাঁর সম্ভাব্য পুনরুত্থান হয়ত বা ভাবাও যেতে পারে, কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপটের যে পালাবদল ঘটেছে তার ফলে সে সুদিন প্রত্যক্ষ করতে হলে তাঁকে বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকতে হবে বলেই মনে হয়।

উল্লেখিত যে চার ব্যক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের প্রধান দোসর হিশেবে দেখা দিয়েছিলেন, মতবাদের দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে আলী আহসানের পার্থক্য ছিল সামান্যই। বাঙালি সংস্কৃতির জন্যে তিনি চিরদিনই ছিলেন এঁদের চেয়ে ক্ষতিকর। চিরকালই তিনি ছিলেন জাতীয়

www.amrajaraboipori.wordpress.com

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

প্রগতিশীলতার বিপক্ষে। কিন্তু একটা জায়গায় তাঁরা ছিলেন আলী আহসানের থেকে মৌলিকভাবে আলাদা। তাঁদের মধ্যে অন্তত তিনজন (হামিদুল হক চৌধুরী বাদে) ছিলেন গভীরভাবে বিশ্বাসী-প্রকৃতির মানুষ। পাকিস্তান বিশ্বাসেও তাঁরা ছিলেন সৎ এবং অন্ধ। এর জন্য জীবনের সবকিছু নিয়ে বাজি ধরতেও তাঁদের কুণ্ঠা ছিল না। এঁরা মন্দের দলে ছিলেন, কিন্তু ঐ দলের নায়ক ছিলেন। কিন্তু চিরকাল আলী আহসানের ছিল খলনায়কের ভূমিকা। ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে চিরদিন তিনি জাগতিক ক্ষমতা এবং ঐহিক সুবিধার পায়ে নামমাত্র দামে বিক্রি করে গেছেন। তিনি আমাদের সময়কার সাংস্কৃতিক জগতের সবচেয়ে প্রতিভাবান অবিশ্বাসী। আজীবন গণবিরোধী ভূমিকার গণিমত হিশেবে নানান সময়ে প্রতিষ্ঠানিক সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরের বাসিন্দা হয়ে থাকলেও সর্বজনীন ধিক্কারের ভেতর পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ জীবনই হয়েছে তাঁর বিধিলিপি।

ড. হাসান জামানের প্রসঙ্গ আর-একবার তুলে আমি তাঁর প্রসঙ্গের ইতি টানব। আমার ধারণা ১৯৬০ সালের দিকে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় একটা সুদূর পরিকল্পনার অংশ হিশেবেই আমাকে তাঁর বাসায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি। হয়ত আমাকে তাঁর অনুসারীর দলে ভেড়ানো করা যায় কিনা, তা খতিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই চেষ্টা সফল হয়নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না। আগেই বলেছি বিশ্বাসের দিক থেকে তিনি আর আমি ছিলাম পুরোপুরি বিরুদ্ধ-শিবিরের মানুষ। তিনি ছিলেন গভীরভাবে ইসলামি চেতনায় প্রাণিত, আমি অজ্ঞেয়বাদিতার দর্শনে আস্থাবান। তাঁর বিশ্বাস ছিল পাকিস্তানি আদর্শে, আমার বাঙালিত্বের ধর্মনিরপেক্ষতায়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মতে মিল হয়নি বলে তিনি আমার উপর রূঢ় হয়ে ওঠেন নি। তাঁর ভেতর শক্তি ও আত্মবিশ্বাস ছিল সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি। তাই অযৌক্তিক দাবির সামান্য আবদার নিয়ে গাল ফোলানোর স্বভাব তাঁর ছিল না। তাঁর অনমনীয় পাকিস্তান-বিশ্বাস একাত্তুরে তাঁকে দেশের অন্যতম প্রধান জাতিদ্রোহীতে পরিণত করেছিল। কিন্তু সে তো আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের অনেক পরের ঘটনা। তাঁর সঙ্গে আমার যখন ঘনিষ্ঠতা ছিল—সেই উনিশশো ষাট-পঁয়ষট্টির পর্বে, তখন তাঁকে আমি দেখেছি খুবই অন্য চেহারায়। বিনীত, মৃদুভাষী, সুবক্তা, পণ্ডিত ও প্রতিভান্বিত মানুষ হিশেবে। তাঁর সান্নিধ্য মনকে সজীব ও প্রসন্ন করেছে। ছাত্রদের কাছ থেকে অম্লান ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি। আমি তাঁর ভেতরকার ঐ সুশিক্ষকের গুণগুলো নিজের ভেতর টেনে নিতে চেয়েছি, তাঁর মতো শিক্ষক হবার স্বপ্ন দেখেছি। আমার বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে যে-সব শিক্ষককে দেখে আমার ভেতর শিক্ষক হবার আন্তরিক প্রেরণা জেগেছিল ড. হাসান জামান ছিলেন তাঁদের একজন।

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখন এই শিক্ষায়তনে যে-সব প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ ও উদ্দীপ্ত শিক্ষককে দেখেছিলাম, ইংরেজি বিভাগের সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁদের একজন। ইংরেজি সাবসিডিয়ারি ক্লাসে তাঁর ছাত্র ছিলাম আমি। তিনি আমাদের বার্নাড শ'র 'ইউ নেভার ক্যান টেল' পড়িয়েছিলেন। উৎসাহী, চিন্তাপ্রবণ ও মেধাবী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ছিলেন সাহিত্যের অন্যতম আপোষহীন রক্ষক। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অল্পদিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। প্রায় বন্ধুই হয়ে উঠি আমরা। সাহিত্যের জন্যে উৎসাহ ও উৎকণ্ঠা একই সুতোয় আমাদের গেঁথে ফেলে। মজবুত স্বাস্থ্যের অধিকারী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রাণখোলা উদ্দাম হাসির গমক ও হৃদয়ের অমলিন আনন্দ চারপাশের সবার মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠত। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের পেছনদিকে একটা গাছপালা-ঢাকা একতলা বাড়িতে থাকতেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও বেশকিছু তরুণ অধ্যাপকদের সঙ্গে। অধ্যাপক সাদউদ্দীনও তখন সেই বাড়ির বাসিন্দা। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে সখ্যের সুবাদে শিক্ষকরা আমাকে 'ছাত্রবন্ধু' বলে ডেকে হাসাহাসি করতেন। তাঁর বিয়ের বরযাত্রাতেও আমি সহকারী হিশেবে গাড়িতে তাঁর পাশে বসে গিয়েছি এবং বিয়েবাড়ির যুদ্ধমান পরিস্থিতিতে বরের সহকারীর ভূমিকা যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছি।

www.amrajaraboipori.wordpress.com

ষাটের দশকের মাঝামাঝি বা তারও কিছু পরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন সে-সময়কার অনেক তরুণের মতো তাঁকেও উদ্দীপ্ত ও সংশপ্তক করে তুলতে থাকে। সাহিত্যের থেকে তিনি দূরে সরে যেতে থাকেন। দেশের মানুষের ভাগ্যের উত্তরণের উৎকণ্ঠার সামনে শিল্পকে তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হতে থাকে। বিপ্লবের ভেতর আমুণ্ডুপদনখ সেঁধিয়ে গেলেও সাহিত্যের সঙ্গে তিনি তাঁর আশৈশবের রক্ত-সম্পর্ক বজায় রাখতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি। সাহিত্যচিন্তায় তিনি হয়ে ওঠেন সমাজতান্ত্রিক চেতনার ক্ষমাহীন ও নিরাপোষ যোদ্ধা। সমাজ-বিপ্লবের নায়কদের মতো সাহিত্যের একটিমাত্র ভূমিকাই তাঁর কাছে তখন অর্থপূর্ণ; তা হল : বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা। শিল্পের সার্বভৌম সত্তাকে তাঁর কাছে মিথ্যা বলে মনে হতে শুরু করে। ফলে বিপ্লবের স্বার্থে নান্দনিকতাকে প্রায় পুরোপুরি পরিত্যাগ করে বসেন তিনি এবং সেই সঙ্গে আমাদেরকেও।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী একসময় তমদ্দুন মজলিশের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, পরে হয়েছিলেন কট্টর সমাজতন্ত্রী। যাঁদেরকে এভাবে আমি আবেগের তাড়নায় খোলনৈচা পাল্টে পুরোপুরি বিরুদ্ধ-শিবিরে নাম লেখতে দেখেছি, তাঁদের চরিত্রে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য সবসময়েই আমার চোখে পড়েছে। আমি দেখেছি সাধারণত এঁরা একধরনের তীব্র ও একমাত্রিক ব্যক্তিত্বের মানুষ হন। এই তীব্রতা তাঁদের ভেতর প্রায়শই সহিংস পর্যায়ে ক্রিয়াশীল থাকে। ফলে তাঁদের ভেতরকার অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

তাঁদের বিচার-বিশ্লেষণও মোটামুটিভাবে হয়ে ওঠে একরৈখিক ও অনুদার। যখন যে-বিশ্বাসের দ্বারা তাঁরা অধিকৃত হন সে-বিশ্বাস তাঁদেরকে আপাদমস্তক গ্রাস করে ফেলে। অন্ধের মতো, অসহায়ের মতো সেই বিশ্বাসকে সমস্ত তর্ক ও সন্দেহের অতীত করে তুলে এক আত্মসন্তুষ্ট অসংশয় পৃথিবীর পরিতৃপ্ত ও নিরুদ্বেগ বাসিন্দা হয়ে ওঠেন তাঁরা। সেই বিশ্বাসের হাতে পুরোপুরি জিম্মি হয়ে যান। ফলে নিজেদের চিন্তার অকাট্যতা সম্বন্ধে এঁরা যেমন হয়ে ওঠেন নিঃসংশয় তেমনি জীবনের উচ্চতর অন্বেষণের স্বার্থে নিজেদের চিন্তাগুলোকে প্রশ্ন করে বিরোধী অবস্থানের সত্যগুলোকে খতিয়ে দেখে, নিজস্ব অবস্থানকে উন্নত করার ব্যাপারে তাঁরা হয়ে পড়েন নিস্পৃহ। শত্রুর শক্তি এবং নিজের দুর্বলতাকে সতর্ক পর্যালোচনা এবং অনুসন্ধানের পরিবর্তে এঁরা নিজের শক্তি ও শত্রুর দুর্বলতা সম্বন্ধে ক্রমাগতভাবে নিঃসংশয় হতে থাকেন।

এঁদের কাছে পৃথিবী কালো এবং শাদার পৃথক ও দুই পরস্পরবিরোধী এলাকায় বিভক্ত; সত্যমিথ্যায় বিজড়িত সত্যের ধূসর গভীর জগৎ এঁদের কাছে স্পষ্ট নয়। মোট কথা, অনুপ্রাণিত ও উজ্জ্বল একধরনের নিরাপোষ ও অপরিণত ব্যক্তিত্ব এঁরা। সেইজন্যে প্রতিভা ও মেধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধতা ও অপরিণতির কারণে মাঝারিত্বের অভিশাপ অতিক্রম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

ব্যক্তিত্বের এই একরৈখিকতা এবং অপরিণতি দেখতাম সিরাজ স্যারের মধ্যে। কেবল সিরাজ স্যার নয়; বদরুদ্দীন উমর, আহমদ শরীফের মতো আমাদের সময়কার বেশকিছু উজ্জ্বল ও প্রখর মানুষের মধ্যেও ব্যক্তিত্বের এই একমাত্রিকতা ও সীমাবদ্ধতা বেদনাদায়কভাবে লক্ষ করেছি আমি। চিন্তাজগতে এঁরা তাই কখনো ঋষির ভূমিকা নিতে পারেন নি, নিয়েছেন ক্ষত্রিয়ের ভূমিকা; তলোয়ার-প্রধান, নিরাপোষ ও আগ্রাসনপ্রবণ। এই একমাত্রিকতার কারণে বিপুল জন্মগত ক্ষমতা নিয়েও শেষপর্যন্ত গৎ-বাঁধা ছক-কাটা চিন্তার বাইরে গিয়ে বড় মাপের অবদান রাখা সম্ভব হয় নি তাঁদের কারোর পক্ষেই।

সিরাজ স্যারের প্রবন্ধ ও রচনা প্রসাদগুণসম্পন্ন ও স্বাদু। কিন্তু একটা বড় দুর্বলতা আছে তাঁর লেখার। তাঁর লেখার রমণীয়তা ও লালিত্য সবসময়ই তাঁর বিষয়ের শক্তিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে। তাঁর প্রতিটা রচনা পড়ার সময় তা রমণীয়ভাবে মনের ভেতর গৃহীত হয়ে যায়, কিন্তু পড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা স্মৃতি থেকে হারিয়ে বসে। হয়ত নতুন প্রবল ও বলীয়ান চিন্তার অভিঘাতে তা চেতনাকে রক্তাপ্লুত করতে পারে না বলেও এ-রকমটা হয়। তিরিশ-চল্লিশ দশকী আদি মার্কসীয় তত্ত্বের যান্ত্রিক ও মনোরম ভাষ্যকার হিশেবে সিরাজ স্যার আমাদের সাহিত্যে মার্কসীয় দর্শনভিত্তিক মাধুর্য বিস্তার করেছেন অনেক, কিন্তু চিন্তাজগতে নতুন বা অপরিচিত মাত্রা যোগ করতে না-পারায় তা মনোরম ও অর্থপূর্ণ তথ্যের চেয়ে বেশি কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না।

সিরাজ স্যারের গদ্যশক্তি ঈর্ষণীয়। কিন্তু তা ঈপ্সিত সাহিত্য-সাফল্য পায়নি। এর কারণ ভাবতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে একটা রমণীয় ও মিষ্টি গদ্যভাষা আয়ত্ত

Scan & Upload by Tusin ahmed

join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori

www.amrajaraboipori.wordpress.com

করলেও তাঁর বলিষ্ঠ ও শক্তিমন্ত সামাজিক বক্তব্য প্রকাশের জন্যে যে-পেশিবহুল ও বলিষ্ঠ ভাষা প্রয়োজন ছিল তা তিনি তৈরি করতে পারেন নি, যা পেরেছেন বদরুদ্দীন উমর। তাঁর ভাষার অতি-সাহিত্যপনা ও এলিয়ে-পড়া কমনীয় ভঙ্গি তাঁর প্রতিপাদ্যের লক্ষ্যভেদী হওয়ার শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে।

বদরুদ্দীন উমর বা আহমদ শরীফের মতো সময়ের পরিবর্তনের দ্বারা অস্পর্শিত রয়ে গেছেন তিনি প্রায় আজীবন। তাঁদের মতোই তাঁর চিন্তাজগৎ প্রধানত বেদনাজাগ্রত নয়, ক্রোধ-দীপিত। তাই তাঁর পৃথিবী শত্রুমিত্রের শিবিরে এমন সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত। তমদ্দুন মজলিশ থেকে রক্ত-যুগান্তরের বিপ্লবী-মঞ্চ, সাহিত্য থেকে সমাজবীক্ষণ—এমনি নানান বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী ক্ষেত্রে কামরাবদ্ধ হয়ে পড়ায় তাঁর চিন্তাজগৎ অনেক সময়েই উপরতল-সর্বস্ব ও অগভীর হয়ে পড়েছে। মুনীর চৌধুরীর মতো তাঁর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার জগৎও ছিল সাধারণ, আর দশটা ভেদাভেদহীন মানুষের মতো। প্রাতিষ্ঠানিক সম্ভাবনার এমন সিঁড়ি নেই যা ডিঙিয়ে তিনি ওপরে উঠতে চেষ্টা করেন নি। আকাঙ্ক্ষার এই গতানুগতিকতা তাঁর প্রতিভার চারপাশে সাধারণত্বের বেদনাদায়ক দেয়াল টেনে দিয়েছে। তিনি বিপ্লবে বিশ্বাস করেছেন কিন্তু দুর্জয় সমুদ্রে অনিশ্চিত ভেলা ভাসানোর দুঃসাহস বা অসামান্যের পিপাসায় আত্মঘাতী ঝুঁকি নেবার ঘটনা তাঁর জীবনে নেই বললেই চলে—যা দেখা যায় বদরুদ্দীন উমর-এর ভেতরে। প্রায় শুয়ে শুয়ে তিনি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছেন। এইজন্যে তা হয়ে পড়েছে আরাম কেদারাসর্বস্ব ও মেরুমজ্জাহীন এবং যে-পরিমাণে শক্তিহীন সেই পরিমাণে সোচ্চার।

তাঁর কাছে ব্যক্তিগত কারণে অনেক বেশি প্রত্যাশা করেছিলাম বলে এই খেদের কথাগুলো এত করে বললাম। তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনের যে-সব অধ্যাপক আমাদের কালে চিন্তাজগতে আজীবন আমুণ্ডুপদনখ ক্রিয়াশীল থেকেছেন, তরুণ সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের সামনে সম্ভাবনার স্বপ্নকে সাধ্যমতো উঁচু করে রেখেছেন, দেশবাসীর অর্থনৈতিক অসঙ্গতির অশ্রুময় ব্যবধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ক্ষান্তিহীন থেকেছেন—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ছিলেন এঁদের সামনের সারিতে। প্রসাদগুণসম্পন্ন রচনার ভেতর দিয়ে সমাজতন্ত্রের মূল প্রতিপাদ্যটিকে একালের অগোচর মানুষের কাছে প্রিয় ও পরিচিত রেখেছেন তিনি, সাহিত্য-অঙ্গনে উপহার দিয়েছেন অনেক অনিন্দ্য ও সুস্মিত রচনা। সবচেয়ে বড় কথা, যে-উদগ্রীব আকুতি নিয়ে সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের পথে দেশের আপামর মানুষের মুক্তির প্রতীক্ষায় তিনি প্রজ্বলিত ছিলেন, আমাদের এই আত্মাহীন যুগে সেই সংশপ্তক প্রতীক্ষা খুব একটা সুলভ জিনিশ নয়।

Scan & Upload by Tusin ahmed
join us : www.facebook.com/groups/amrajaraboipori